

বঙ্গ মতাব্দা

বর্ষ ৮ □ সংখ্যা ১-২ □ জানুয়ারি-জুন ২০০৩

শতবর্ষে জসীমউদ্দিন
মেয়ের চোখে তারশঙ্কর
ইরাকযুদ্ধ আমেরিকা ও আমরা
দুটি ছোটগল্প □ কুড়িটি কবিতা
স্মরণের আবরণে
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত □ সুনীল দত্ত □ কৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
বইপত্র □ আমাদের কথা

Power to the people

WBPDC'S ACHIEVEMENT

Completed Projects -

- Kolaghat Thermal Power Station (1260 MW)
-a major power generating station in Eastern Region.
- Bakreswar Thermal Power Project, Phase-I (630 MW)
-completed ahead of schedule.
- Bandel Thermal Power Station (4 x 82.5 + 1 x 210 MW).
- Santaldih Thermal Power Station (4 x 120 MW).

Projects upon the anvil -

- Bakreswar Thermal Power Project-Phase-II (420 MW).
- Sagardighi (Murshidabad) Thermal Power Project-Phase-I (2 x 250 MW),
- Santaldih Thermal Power Project - Phase-II (1 x 250 MW)

**The West Bengal Power Development Corporation Limited
New Secretariat Building, B-Block, (6th Floor)
1, K. S. Roy Road, Kolkata-700 001**

E-mail : Wbpdc2 @giasc101.vsnl.net.in

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ-৮ □ সংখ্যা ১-২ □ ২০০৩

(জানুয়ারি—জুন)

সম্পাদক □ সাগর বিশ্বাস

সহযোগী □ মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, সুমিত্রা দত্তচৌধুরী

এন-২১, নবদল্লি

কলকাতা-৭০০০৫১

দূরভাষ □ ২৫১৩-২০৬৪

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৩০ টাকা, ডাকযোগে ৫০ টাকা। নতুন লেখকদের ভালো লেখা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হয়।

কলকাতায় একুশ শতাব্দী পাওয়া যায়

পাতিরাম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রিট □ বুক মার্কেট, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট □ ছাড়পত্র, তমসুক, বি. বা. দী. বাগ (টেলিফোন ভবনের বিপরীতে) □ প্রোগ্রেসিভ বুক স্টল, রাসবিহারী এভিনিউ

আনন্দবাজার, আজকাল, গণশক্তি, সাপ্তাহিক বর্তমান, তথ্যকেন্দ্র ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় উচ্চ-প্রশংসিত সাগর বিশ্বাসের কিশোর গল্প সংকলন

সাত আকাশের তারা

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

একুশ শতাব্দী

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন আইনের ৮ নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশের স্থান	:	এন ২১, নবাবদর্শ, কলকাতা-৫১
প্রকাশের কাল	:	ত্রৈমাসিক
ভাষা	:	বাঙলা
প্রকাশকের নাম	:	ডালিয়া রায়, ভারতীয়
মুদ্রকের নাম	:	ডালিয়া রায়, ভারতীয়
সম্পাদকের নাম	:	সাগর বিশ্বাস, ভারতীয়
সঞ্চালিকারীর নাম	:	ডালিয়া রায়, ভারতীয়

আমি ডালিয়া রায় ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

প্রেক্ষি: নং

(স্বাক্ষর) ডালিয়া রায়

আর.এন.আই/৬৮০৯৯/১৬

প্রকাশক ও মুদ্রক

একুশ শতাব্দী

(মাঘ ১৪০৯-আষাঢ় ১৪১০)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়-৫

প্রবন্ধ

পল্লি-বাউলার বাণীর দুলাল : জসীমউদ্দিন □ শেখ আজিবুল হক-৮

প্রত্যক্ষদর্শী তারশঙ্কর □ বাণী রায়-১৩

ইরাক-মুহু আমেরিকার মুখচ্ছবি ও আমরা □ নীতীশ বিশ্বাস-১৭

গল্প

ইন্দ্রানী □ ইভা বাসনবীশ-২৭

সম্পর্ক □ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-৩৭

কবিতা ৪০-৪৯

মঞ্জুর দাশগুপ্ত / শিশির সামন্ত / শঙ্করী ঘোষ / প্রভাত চৌধুরি /
যশোধরা রায়চৌধুরী / কৃষ্ণা বসু / অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় / মুণাল দত্ত
/ অরিজিত দত্ত / সমর্পণ মুখোপাধ্যায় / প্রবীর ভৌমিক / মানসী সরকার
/ মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু / দেবাশিষ শেঠ / ফেরদৌস নাহার / জয়ন্তী রায় /
কৃষ্ণসাধন নন্দী / তাপস রায় / মিলনেন্দু জানা / অলোক কুমার হালদার

স্মরণের আবরণে

মঞ্জুর দাশগুপ্ত □ তারাপদ আচার্য-৫০

সুনীল দত্ত □ সাগর বিশ্বাস-৫৪

কুপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য □ সাগর বিশ্বাস-৫৫

বইপত্র

মহাভারতের মহারণ্যে / প্রতিভা বসু □ অরবিন্দ পুরকাইত-৫৬

একালের আবেল তাবোল / মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু □ আদিত্যকুমার মুখোপাধ্যায়-৬২

Memoirs of an Indian Civil Servant / P. K. Rakshit □ আদিত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

আমাদের কথা ৬৪

প্রচ্ছদলিপি □ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য বিহার-এর কিছু বই

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত • রমেশ চন্দ্র দত্ত, রাজপুত্র জীবন-সন্ধ্যা • রমেশচন্দ্র দত্ত, কন্দরে কন্দরে • শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জনৈক শরতানের পত্রওচ্ছ • বিমল কব, বাইজী বেগম বিবি • বেদুইন, তিন মাথের কথা • ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রেমাবতার শ্রীমৌর্যাদ • নৌরগোপাল বিন্দ্যবিনোদ, আডভেঞ্চার অমনিবাস • ধীরেন্দ্রলাল ধর, নেটোর দল • নীলা মজুমদার, প্রেমেশ মিত্রের বাছাই গল্প, নাট্যদেউলের বিনোদিনী • শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্পসল্প • নীলা মজুমদার, একটি লাল লতা • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হরেকরকমুবা • কুমারেশ ঘোষ, ডাক্তারকুঠির রহস্য • অজয়েয় রায়, তত্ত্ব পরিচয় • পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাড়ালি • ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী, তারাপঙ্করের প্রেট কিশোর গল্প • তারাপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃষ্টির পথ • সূর্যেন্দ্রবিকাশ করমহাপাত্র, (১৯৯৯ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত), মহাবিশ্বের কথা • সূর্যেন্দ্রবিকাশ করমহাপাত্র, প্রগতি পরিক্ষে পরিণাম • সূর্যেন্দ্রবিকাশ করমহাপাত্র

শরৎ সাহিত্য : পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১৩.০০। বড়দিদি ৮.০০। পরিণীতা ৮.০০। চন্দ্রনাথ ৯.০০। পত্নী-সমাজ ১৩.০০। বিরাজ-বৌ ১২.০০। অরক্ষণীয়া ৮.০০। বামুনের মেয়ে ১০.০০। গৃহদাহ ১৮.০০। গল্প সংকলন ২০.০০। নিষ্কৃতি ৯.০০। স্বামী ৮.০০। পশ্চিমমাশ ১১.০০। নববিধান ৮.০০। বৈকুণ্ঠের উইল ৯.০০। দেনা-পাওনা ১৫.০০। রামের সুনতি ও কিন্দুর ছেলে ১০.০০। কালীনাথ ও মর্পচূর্ণ ৮.০০। মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮.০০। দস্তা ১৫.০০। চরিত্রহীন ১৮.০০। পথের দাবী ১৫.০০। কিশোর রচনা সংকলন ১৪.০০। প্রবন্ধ—নারীর মূল্য ৮.০০। নাটক—ষোড়শী ৭.০০। বিজয়া ৮.০০। রমা ৬.০০।

শরৎ সাহিত্য : শোডন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০.০০। পথের দাবী ২০.০০। চরিত্রহীন ২২.০০। দেনাপাওনা ১৮.০০। শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০.০০।

বঙ্কিম সাহিত্য : পেপারব্যাক সিরিজ

দুর্গেশনন্দিনী ১১.০০। আনন্দমঠ ১০.০০। কপালকুণ্ডলা ৭.০০। দেবী চৌধুরাণী ১১.০০। কৃষ্ণকান্তের উইল ১২.০০। বিষবৃক্ষ ১৪.০০। মৃণালিনী ১৪.০০। সীতারাম ১৭.০০। রাধারানী ও ইন্দিরা ১১.০০।

প্রাপ্তিস্থান :

সাহিত্যবিহার

ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাঃ লিঃ

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯

৫৬ সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯

With best wishes from :

A WELL WISHER

এ সম্পাদকীয়টুকু যখন লিখতে বসেছি তখন হাজার হাজার টমাহক মিসাইল, প্রেসিশান ক্রুইজ মিসাইল এবং অত্যাধুনিক নানান মারভাত্বের তীব্র আক্রমণে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার পীঠস্থান ইরাক বিধ্বস্ত। কত মানুষ মৃত, কত জীবমৃত, কত প্রভু-সম্পদ, কত ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন সে হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি, সঠিক হিসেব কোনও দিনই পাওয়া যাবে না। ১৯৯১ সালের আক্রমণে শুধু মানুষই মারা গিয়েছিল অন্তত পঁচালি হাজার। সেবারের আক্রমণে রাষ্ট্রসভ্যের সায় ছিল, কারণ ইরাকের কুয়েত অভিযান বিশ্বের চোখে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু এবার? এবার তো আমেরিকা-ইংল্যান্ড স্পেন ও অস্ট্রেলিয়ার জোটশক্তি রাষ্ট্রসভ্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল (১৯ মার্চ ২০০৩)। আন্তর্জাতিক আইন ও যুদ্ধরীতির এমন চরম অবমাননা সমকালীন বিশ্ব আর দেখেনি।

তথ্যটি এ যুদ্ধের মূল পাতা আমেরিকা জোর গলায় বলে বেড়াচ্ছে তারা যে-আইনী কিছু করেনি। স্বরণ করা যেতে পারে, ইরাক আক্রমণের এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশ্কার কুশ দূরদর্শনে দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন, রাষ্ট্রসভ্যের নিরাপত্তা পরিষদের রেজল্যুশান অনুযায়ী এ যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার আমেরিকার আছে। এটা আইন সম্মত। সেই রেকর্ড তারা আজও বাড়িয়ে চলেছে। অথচ নিরাপত্তা পরিষদের ইরাক-সংশ্লিষ্ট রেজল্যুশানগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে আমেরিকার এই দাবি কত ভিত্তিহীন। তিনটি রেজল্যুশানের কথা আমেরিকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখানোর চেষ্টা করেছে। সেগুলি হচ্ছে রেজল্যুশান নম্বর ৬৭৮, ৬৮৭ ও ১৪৪১। ইরাক সক্রান্ত আরও একটি রেজল্যুশান ছিল, সেটাই প্রাথমিক রেজল্যুশান। ৬৬০ নম্বর যুক্ত সেই রেজল্যুশানে কুয়েত থেকে অবিলম্বে ইরাককে সরে আসার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদাম হুসেইন তিকরিত সে দাবি বা নির্দেশের প্রতি বিশেষ কর্পাত না করায় ২৯ নভেম্বর (১৯৯০) নিরাপত্তা পরিষদ সেই গুরুত্বপূর্ণ ৬৭৮ নম্বর রেজল্যুশানটি অনুমোদন করে। এখানে বলা হল, ৬৬০ নম্বর রেজল্যুশানকে বাস্তবায়িত করা অর্থাৎ কুয়েত থেকে ইরাককে হঠানোর জন্য 'সদস্য রাষ্ট্রসমূহ' সমস্ত প্রয়োজনীয় পদ (all necessary means) গ্রহণ করতে পারে। আরও বলা হল উপসাগরীয় এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পরবর্তী প্রাসঙ্গিক রেজল্যুশানগুলিরও প্রয়োগাধিকার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের থাকবে। লক্ষণীয় যে, এই রেজল্যুশানে 'সমস্ত প্রয়োজনীয় পদ'র কথা থাকলেও সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার কথা বলা হল না। কিন্তু আমেরিকা ধরেই নিয়েছিল 'সমস্ত প্রয়োজনীয় পদ'র মধ্যে সামরিক অভিযানটাও পড়ে। 'প্রয়োজন' টাকে প্রতিষ্ঠা করাটাই আসল কথা। মার্কিন কূটনীতি সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল বলেই প্রথম

উপসাগরীয় যুদ্ধে তাকে কোনও বৃহৎ প্রতিবাদের সামনে পড়তে হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরাও সে যুদ্ধ সক্রিয়ভাবে মেনে নিয়েছিলেন। অতএব ইরাক ধ্বংসের প্রথম পর্ব বেশ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছিল। সে সময় যুদ্ধবিরতির শর্ত আরোপ করে গ্রহণ করা হয় নিরাপত্তা পরিষদের ৬৮৭ নম্বর সিদ্ধান্ত। বলা হল, অবিলম্বে ইরাককে তার যাবতীয় রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্র ধ্বংস করতে হবে এবং ভবিষ্যতে পরমাণু অস্ত্রসহ এ ধরনের মায়াবাদির কোনওরকম প্রয়োগ, পরীক্ষা, গবেষণা, উন্নয়ন কিংবা সংগ্রহ করা চলবে না। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোনওভাবেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা করা চলবে না। শর্তসমূহ প্রতিপালিত হলে কী না তা আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের সরেজমিনে পরীক্ষা করার সময় পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে, ইত্যাদি। সেই আপেক্ষিক ইরাক সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে এলাকায় যুদ্ধবিরতি সত্ত্ব্য করেছিল। কিন্তু পরবর্তী বারো বছরের ইতিহাস কেবল পারস্পরিক দোষারোপ ও চাপান-উতোরের ইতিহাস। চূড়ান্ত নিরস্ত্রীকরণ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবরোধ (Sanction) বলবৎ থাকায় এই বারো বছরে, আড়াইকোটি মানুষের ছোট্ট দেশ ইরাকের সমরশক্তি ও অর্থনীতিই কেবল পঙ্গু হয়নি তার হতদরিদ্র জনসাধারণ জীবনধারণের ন্যূনতম স্বাস্থ্যসুবিধাও ভোগ করতে পারেনি। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদক দেশটির তেল-রফতানির অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পৌঁছে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হল ১৪৪১ নম্বর রেজল্যুশন যেখানে ইরাককে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে চুক্তিভঙ্গের (breach) দায়ে অভিযুক্ত করা হল। অভিযোগের তর্জনী উঠল, কিন্তু বলপ্রয়োগের কথা হল না, বরং আর একবার 'সুযোগ' দেওয়ার জন্য হাস ব্রিস্সের নেতৃত্বে রাষ্ট্রসভ্যের অস্ত্র-পরীক্ষকের একটি দল পাঠানো হল ইরাকে। পরবর্তী ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের নব্বু খেচ্ছাচারিতার ঘটনা, একটি সভ্যতা নিশ্চিহ্নকরণের যোলকলা পূর্তির ঘটনা। খোদ নিরাপত্তা পরিষদে জার্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়ার আপত্তি, ব্রিস্সের আরও সময়ের দাবি, এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী মানব সমাবেশকে অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মূলত আমেরিকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ইরাকের মাটিতে। পনেরো সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদসহ রাষ্ট্রসভ্যের ১৯১ জন সাধারণ সভ্য বিক্ষোভিত হলে সে বিভৎস দৃশ্য দেখলেন, মহাসচিব কোফি আন্নন ধৃতরাষ্ট্রের মতো কেবল কণেশ্রিয় সজাগ রেবে গাছারীর মতো স্বীয় আনন আবৃত করলেন। আর ওদিকে বিশ্ববিরোধের মগজ যোলাইয়ের জন্য কুশ-ব্রোয়ার-রায়মসফেন্ড-পাওয়েল অ্যান্ড কোম্পানি তারহরে বলতে লাগল ১৪৪১ কে আলাদা করে দেখলে হবে না, তার সঙ্গে ৬৭৮ কে জুড়ে নিতে হবে।

কেন? ৬৭৮-এ তো কয়েত থেকে ইরাককে হঠানোর জন্য যুদ্ধের অনুমোদন (ভাও পরোক্ষভাবে) দেওয়া হয়েছিল। আর দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী প্রাসঙ্গিক রেজল্যুশনগুলির প্রায়োগিক অধিকার। পরবর্তী কেনও রেজল্যুশানেই কি যুদ্ধ কিংবা নিষেদপক্ষে বল প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে? এই প্রশ্নে আমেরিকার পায়ের তলায় মাটি ছিল না বলেই নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধের অনুমোদন চেয়ে তার নতুন প্রস্তাব পাশ করানোর ইচ্ছে ছিল যা রাশিয়া ও ফ্রান্সের ভোটের ভয়ে উপস্থাপন করা যায়নি। অবশ্য ভোটের প্রয়োজন হত না, কারণ যুদ্ধের

প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের এগারোটি দেশের সমর্থন ছিল না। আর তখন থেকেই আমেরিকা পৃথিবীকে বোঝাতে চেয়েছে ৬৭৮ নম্বর রেজল্যুশান বলেই ইরাকের বিরুদ্ধে সমরাভিযান আন্তর্জাতিক আইন ও যুদ্ধরীতি সম্মত। সারা বিশ্ব এ প্রশ্নের সদৃশ পেলনা যে ১৯৯০ সালের বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বারো বছর পরে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিকতা পাবে কোন সুবাদে? তাছাড়া সেই রেজল্যুশানে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত যে সদস্য রাষ্ট্রগুলি বা member states এর ওপর বর্ডেছিল, তারা কোথায়? সেখানে তো স্পষ্ট বিভাজন। তাহলে সমস্ত সদস্যের দায়ভাগ নিজের বা কতিপয়ের কাঁধে তুলে নেবার অধিকার কোথা থেকে আসে?

এই তো বর্তমান আমেরিকার গণতন্ত্র। এই তার আন্তর্জাতিক আইন ও যুদ্ধরীতির ‘শান্তিবাদী’ নমুনা। এ নমুনা আমেরিকার লক্ষ লক্ষ শান্তিকামী মানুষের মতো আব্রাহাম লিঙ্কনের ‘নাথিভুমিকেও বিচলিত করবে। কিন্তু এসব কথাই এখন বড় অবাস্তব মনে হয়। কারণ ৮০০০ বছরের প্রাচীন মানবসভ্যতার কফিনে শেষ পেরেকটি ইতিমধ্যেই পুঁতে দেওয়া হয়েছে। তার যাবতীয় ঐশ্বর্য, ঐতিহ্য আর ঐতিহাসিক নিদর্শন লাঞ্ছনা, লুণ্ঠন আর দানবীয় ধর্বনের রক্তাক্ত শিকার। বিশ্বের তাবৎ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই শিক্ষারোৎসবের মধ্যে কেবল আমেরিকার ‘আগ্রাসী’ ও ‘সাম্রাজ্যবাদী’ বদচরিত্রের সন্ধান পেলেন। বিশ্বমানব সভ্যতার অতিবৃদ্ধা ধাত্রী জননীর নৃশংসে হত্যাকাণ্ডে কারও চোখ অশ্রুসঞ্ছল হল না। তবুও অভিভাবদন জানাতে হয় হোয়াইট হাউস কালচারাল অ্যাডভাইসারি কমিটির চেয়ারম্যান মাইকেল সুলিভান ও তাঁর দুই সহকর্মী রিচার্ড ল্যানিয়ের এবং গ্যারি ভাইকানকে যারা এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচু আমেরিকার দেওয়া মহামূল্যবান প্রত্ন-উপসেটা পদ পরিত্যাগ করার সাহস দেখাতে পারেন। □

পল্লি-বাঙলার বাণীর দুলাল : জসীমউদ্দিন

শেখ আজিবুল হক

জীহনানন্দ দাস বলেছেন সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। অন্য ভাষায় বলা হয় poets are born - অর্থাৎ কবির কবি হয়েই জন্মান, একথা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য poets are made not born. অর্থাৎ স্বভাব কবিত্ব নিয়ে কবির জন্ম গ্রহণ করেন একথা যেমন সত্য, তেমনি পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ প্রকৃতির ধ্যান-তন্ময় রূপ-লাবণ্যের সোনার কাঠি রূপোর কাঠি হোঁয়াও কবির কাব্য কাননকে মগ্নরিত করে তোলে। পল্লি বাঙলার বাণীর দুলাল কবি জসীম উদ্দিন তাহলে কোন শ্রেণির কবি।

প্রকৃতির পূজারী কবি জসীমউদ্দিনের কাব্য প্রতিভার উৎস নির্ণয়ে সর্ব প্রথম মনে আসে রবীন্দ্র মধ্যাহ্ন কালে এবং নজরুলের সমকালে জসীমউদ্দিন আবির্ভূত হলেন কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায়। রবীন্দ্র-ব্রহ্ম-সামিধে এসে ঠাকুর বাড়ির সোনার আভিনায় পদচারণা করা সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেননি। দু-দুটো আকাশচুম্বী প্রতিভাকে এড়িয়ে আপনার পথ তৈরি করে এই এগিয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব হল?

এর কারণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে কবিত্ব শক্তি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। পিতা আনসার উদ্দিন আহমদ ছিলেন একাধারে শিক্ষক এবং কবি। সাহিত্যের গোবর্দ্ধতা তিনি তাই পিতৃসূত্রেই পেয়েছিলেন, যেনন পেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। এছাড়া বাল্যকালে কবি জসীম উদ্দিন নজরুলের ন্যায় লোককবিত্বের দলে কবিগানও করেছিলেন বলে জানা যায়। বসন্ত বার্নস, গার্বিকা, হাইনে, ম্যাকডিয়ার, ডিখনোভ, প্রমুখ বিশ্বের খ্যাতনামা লোককবিত্বের ন্যায় তাঁর সাহিত্য-ঐতিহ্যকেও বাঙলার লোকায়ত শিল্প সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে লোক সাহিত্যের একটি নিষ্ঠিতম শিল্পরূপ দান করেছেন কবি। পল্লিগ্রাম নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন কল্পনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, যতীন্দ্র মোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বন্দে আলি মিয়া এবং গোলাম মোস্তাফা। এদের মধ্যে একমাত্র কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ই পল্লির রূপচিত্র অঙ্কনে লালিত্যময়তার পরিচয় দিলেও সমগ্র গ্রামীণ সমাজের অস্তরাত্মার সার্বক রূপায়ন ঘটেছে কবি জসীমউদ্দিনের কবিতায়। এ প্রসঙ্গে লেখক পরিমল চক্রবর্তীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়— “পল্লি কবিতায় কুমুদরঞ্জন বৈষ্ণব ধর্ম লালিত আর জসীমউদ্দিনের কবিতায় পল্লি জীবন করুণ-মাধুর্যে মন্ডিত, কুমুদরঞ্জন পল্লি নিসর্গের প্রেক্ষাপটে ধর্ম-জীবনের কবি, কিন্তু জসীমউদ্দিন লোক-জীবনের। কুমুদরঞ্জনের শব্দ-ব্যবহার এবং ভাষা-রীতি সহজিয়া ও আটপোরে, জসীমউদ্দিনের লৌকিক ও গণমুখী। এবং সেই শোষণের কারণেই ‘পল্লিকবি’র অভিধাও জসীমউদ্দিনের প্রাণ্য, কুমুদরঞ্জনের নয়।”

পল্লিকবি জসীম উদ্দিন শুধু লোক কবি নয় লোক-সোচ্চনে তিনি জনগণের অন্তরাত্মাকেও ধরতে পেরেছিলেন বলে হতে পেরেছিলেন মাটির কাছাকাছি জ্বনের তথা জনগণের কবি। যেমনটি হতে পেরেছিলেন নজরুল এবং সুকান্তও। কবি কালিদাস রায় তাই বলেছেন, “কুমুদরঞ্জন pastrol song রচনা করেছেন, জসীমউদ্দিন pastrol poem রচনা করেছেন

রাখালিয়া সূরে যা বালো সাহিত্যের অভিনব সম্পদ। তিনি আরম্ভ বলেন— “যতীন্দ্রমোহন ও ফুয়ুদরঙ্গন বঙ্গের পক্ষী প্রকৃতির সেখিয়েছেন হিন্দুর চোখে, শ্রীমান জসীমউদ্দিন তাহাকে বাঙালীর চোখে দেখিয়েছেন।” তিনি যে বাঙলার ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা priest of nature ছিলেন তা তাঁর কাব্য-নির্মাণের ভাষা ও চিত্রকল্প থেকেই সহজে অনুমিত হয়—

ওঁ যে পূবে মাঠের পরে সবুজ-বেরা গাঁ

কলার পাতা দেলার চামর, শিশির খোয়ায় পা। (রাখাল ছেলে)

কিংবা

সেই ছেলেবেলা বস্ত্রের রত কত ব্রেহ-ভরা মুখ

এনে দাও শুধু বারেক দেখিয়া ডারে লই সারা বুক। (পুরান পুতুর)

অথবা

খেলনাশিলি ধূলার পড়ে হাত ডাঙা কার পা ডাঙা কার

কুম্ভুটি বেহাও হয়ে বাজছে হাতে বাহার তাহার! (পলাতক)

কখনও বা

এই কাঁধখনি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে

ভোরের শিশির কানিয়া কানিয়া এরই বুকে যাবে করে। (নরী কাঁধার মাঠ)

কখনও বা অস্ত্র-মুক্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি বর্ণমালা—

আঙে আঙে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে

দীন-দুনিয়ার ভেতর আমার ঘুমায় কিসের ছলে? (কবর)

মনে পড়িয়ে সেয় টমাস গ্রেবর বেদনা করুণ এলিঙ্গি-র কথা। স্মরণ করিয়ে সেয় শেলির বিখ্যাত উক্তি Our sweetest songs are those that tell of saddest thought এর কথা মানুষের দুঃখে, মানুষের বেদনায়, মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতায় যে অন্তর নিরন্তর কঁদেছে তাঁকে ভুলবার পথ থাকে না। মানুষের স্বৃতি-মন্দিরে তাঁর কাব্য-কৃতি অক্ষয় হয় সারস্বত কালের অপোলে। বস্তুত কবি জসীমউদ্দিনের কবিতায় কবির অন্তরায়্য ও সামিল হতে পেরেছে বলে প্রেম আর প্রকৃতি মানুষের আনন্দ আর বেদনাকৃতি শিল্প-সুন্দর বাণী-মূর্তি নিয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে। আর এই কারণেই গ্রাম ও শহর, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বেমে জেলে, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তাঁর সাহিত্য সকল মানুষের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। সবলের চোখের জল এসে তাঁর সাহিত্যে নিশেছে বলেই তা চিরন্তন কালের সাহিত্য-স্বীকৃতি পেয়েছে। অনুদিত হয়েছে দেশ-বিদেশের পরিভাষায়।

বুক ভরা মধু বঙ্গ-জননীর ললিত ব্রহ্মে লালিত পল্লি-প্রাণ কবি জসীমউদ্দিন যেমন লোকায়ত সাহিত্যের কবি তেমনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অধীনে মাসিক সত্তর টাকা বৃত্তিতে কাজ করতে এসে লোক-গাথা, লোক-গীতি প্রভৃতি সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি বাঙলার চিরন্তন প্রাণ-সম্পদের সন্ধান পান যা তাঁকে পরবর্তী ক্ষেত্রে মাটি-মাখা মায়ের রাখালিয়া সূরের খাঁটি বাঙালি কবির স্বতন্ত্র শিরোপা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁকে এ কারণে অভিনন্দন জানিয়েছেন— “জসীমউদ্দিনের কবিতার ভাব-ভাষা ও রস-গ্রন্থ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লেখবার শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।”

কবির জন্মস্থান ফরিদপুরের তাহুলখানা গ্রামের (মাতুলাল) খাল-বিল-নদী, মাঠ-ঘাট, শ্যামলিমা প্রান্তর, সর্বে ফুলের সোনা রং, প্রজাপতির সাত-রঙা পাখা, পাখির কলতান যেমন কবি মনকে আবিষ্ট করেছিল তেমনি বেদে-বেদেনীর খাঁশির সুর, সাজু ও রূপাইয়ের বিমোহন-বিধুর কলশ গাথা, পল্লিবধুর ডা'র আঁবি, কোনও কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। কবি মুসাফির সব কিছুর সৌন্দর্য নিয়েই ভিলে ভিলে তিলোত্তমা করে প্রেমের তালুমহল রচনা করেছেন কাব্যে। যেদিকে মানুষের দৃষ্টি সচরাচর পড়ে না, সভ্যতা গড়ার যে কারিগর বা ঘরামির কথা কেউ ভাবে না, সমাজে পড়ে থাকা অবহেলিত অন্ত্যজ, মূর্খ, নীরব সেই পর্ণকুটিরবাসী মানুষের হৃদয়ে আবহমানকাল ধরে যে কাব্য-কবিতা, গান-ছন্দ-সুর-প্রেম, আনন্দ-বেদনা লুকিয়ে আছে কবি জসীমউদ্দিন সেদিকেই আকর্ষণ করলেন আমাদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি তাঁর লোকায়ত শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁর 'সোজান বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৩), 'নক্সী কাঁধার মাঠ' (১৯২৯), 'বাল্মার' (১৯৩০) 'রঙিলা নায়ের মাকি' প্রকৃতি উদ্দেশ্যযোগ্য শব্দ ও গানের মতো অন্যতম। তদ্ব্যতী 'নক্সী কাঁধার মাঠ'কে কাব্যোপন্যাস যেমন বলা যায় তেমনি বেদনার মহাকাব্যও বলা যায়। মিসেস মিলফোর্ড The field of the embroidered quilt নামে ষইটির ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরেন।

নজরুলের 'বিশ্রোহী'র ন্যায় যে কবিতা নিয়ে কবি জসীমউদ্দিন রাতারাতি কবি খ্যাতি অর্জন করেন তা হচ্ছে 'কবর'। তখন সবে মাত্র বিয়ে ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন। বোনের বাড়ি হাবার পথে ফরিদপুরের রাজবাড়ি স্টেশানে বেদে বেদেনীর গান শুনে যেমন অভিভূত হন, তেমনি বোনের বাড়ি গিয়ে কলারায় লোক মরেছে সেখা বেদনা-বিধুর চিন্তে লেখেন 'কবর' শীর্ষক অনবদ্য শোকগাথার কবিতা, যা বাঙলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ হয়ে উঠেছে :

এইখানে তোর দাবীর কবর ডালিম গাছের তলে

তিরিশ বছর ভিঝায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।

বনের ঘুমুরা উই উই করি কেঁদে মরে রাত দিন

পাতায় পাতায় কেঁদে উঠে যেন তারি বেদনার বীন।

আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে সিলান গাড়ি

দাণু ধরো ধরো বুক ফেটে যায় আর বুকি নাহি পারি।

আন্তে আন্তে খুঁড়ে খেঁচ সেখি কঠিন হণ্টের তলে

দীন-দুনিয়ার ভেতর আমার ঘুমার কিসের ছলে।

মৃত্যু-দর্শনের এই করুণ-কোমল দৃষ্টির জন্যই তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই এটি ম্যাট্রিক পরীক্ষা তুরে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করে যা বাঙলার আর কোনও কবির ভাগ্যে জোটেনি। আর যটেছিল তাঁর শিক্ষক, কবি-সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেন মহশয়ের জনৈতে। অধ্যাপক সেন তাঁর forward প্রতিকায় ছাত্র-কবির যে পরিক্রিতি তুলে ধরেন তাতে আন্তর্জাতিক কবিত্যতি অতি সহজেই ছুটে যায়। কবি নজরুলকে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যেমন মোহিতলাল মজুমদার, তেমনি দীনেশচন্দ্র সেন মহশয় মুগ্ধ ও মুগ্ধ কণ্ঠে গাইলেন জসীম বন্দনা— "আমি গৌরবাহিত যে, আমি ময়মনসিংহ গীতিকার মত বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ আবিষ্কার করে পৃথিবীর রস-পিপাসূরের সামনে তুলে ধরেছি। আমি গৌরবাহিত

যে 'বসভাষা ও সাহিত্য'র ন্যায় পুস্তক রচনা করেছি। কিন্তু সব চাইতে আমার গৌরব যে আমি কবি জসীমউদ্দিনের শিক্ষক হতে পেরেছি। তাঁর কবিতা আমার কাছে শেলী, কীটস, ব্যারন এমন্স কি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার চেয়ে ভালো লাগে। কারণ তাঁর কবিতার আমি আমার বক্ষণে ছেড়ে আসা আম-কাঁঠালের ছায়ায় থেরা পল্লী মায়ের শীতল স্পর্শ পাই। যে মায়ের চেয়ে আপন বলতে আমি আর কাউকে জানিনে। তার পদ্ম-শালুক ফোটা খাল-বিল, ভাটিয়াঙ্গী গানে মুখর পদ্মা-যমুনা নদী, অতসী অপরাধিতা, টগর চামেলী ফুলের সুগন্ধভরা আভিনার কোল, মায়ের এই অপরূপ মূর্তি আমি পাই জসীমের কবিতায়।" আরও হৃদয়বেগে অধীর হয়ে বলেছেন "আমি হিন্দু, আমার নিকট বেদ পবিত্র, গীতা পবিত্র, কিন্তু 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', পুস্তক তাহার চাইতেও পবিত্র। কারণ ইহাতে আমার বাংলা দেশের মাটির মানুষগুলির কথা আছে। আমার গ্রানগুলির বর্ণনা আছে।"

সৈয়দ আলী আহসান এর মতে— "আধুনিক বাংলা কবিতার ভাব প্রকাশ ও আসিকে খাঁচা ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন তাঁর। মতো অন্যতম কবি জসীমউদ্দিন। তিনি শুধু গ্রামীণ কবি ছিলেন না। কাহিনী-কাব্য-ছন্দ ও গীতিময়তায় তিনি বাংলা কাব্যে নয়া দিগন্তের উন্মোচন করেন। তাঁকে বাদ দিয়ে আধুনিক কবিতার কথা চিন্তা করা যায় না।" কবি জসীমউদ্দিনের কাব্য রীতি সম্পর্কে সীমানা ধরিপ করতে গিয়ে সমালোচক আবুবকর সিদ্দিক বলেছেন— "আধুনিক জীবনের যে জটিল দৃশ্য মানসিকতা তার ধার কাছ দিয়েও তিনি যান না।... কিছুটা কথকের, কিছুটা চারণের ভঙ্গিমা তাঁর।"

তবু এই সহস্রসরল পল্লি-গীতিকা বা গাখাক্য কিংবা ode ধর্মীয় গিরিক কবিতা অন্যমতে "এমন সহজিয়া এমন মরমিয়া রাখালি বাঁশির সুর, আনমনা করা নট্যলজিয়া নির্ভর ভরদুপুরে বা অন্তঃগামী সূর্যের লাল রং, ধীরের কালো জলে কাঁপা কাঁপা, কোকিল-ডাকা সন্ধ্যার ছবি কোন বাঙালি পাঠক ভুলতে পেরেছেন?" (প্রবচ চট্টোপাধ্যায়)।

পল্লি-প্রাণ কবি জসীমউদ্দিন যেমন পল্লি প্রকৃতি আর গ্রাম-বাঙলার মানুষ ও গ্রামীণ শাখত সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন, গ্রামীণ লোকায়ত্ত সুরটিকে নিজের বীণায় বাঁধতে পেরেছিলেন, তেমনি গ্রাম্য অন্তর্ভুক্ত অস্বীকৃত অশিক্ষিত মানুষের জীবনের দুঃখ সুখ, মিলন-বিরহ-ব্যথা-বেদনার বৈচিত্র্যের কথাও অত্যন্ত দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমের দৃশ্য, আর্তি, শোক, দুঃখ ইত্যাদির বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রে নজরুল প্রেম-গীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নজরুলের মতো তিনিও বিদ্রোহ ও আত্মনিবেদন করেছেন। নজরুলের মতো তিনিও গানে লোক-প্রিয়তা অর্জন করেন। যেমন—

চাবিয়াছ মোরা গাঁয়ের রাখাল নাই কোন হাতিয়ার

যে লাঙল পারে মাটিকে ফাড়িতে ভাঙিতেও পারে ঘাড়।

(রঙিলা নায়ের মাঝি)

সুকান্ত, শেলী ও নজরুলের ফরিয়াদী কবিতার মতো জসীমউদ্দিনের কবিতাও স্মরণীয়—
সব দুনিয়ার আহাংর জোগাই/সেই না ফল হইতে

(আর) আমরা কেন বাইতে না পাই/পারোকে কেউ কইতে? (পদ্মাপারে)

'আমার খোদারে সেখিয়াছি আমি গরীবের কুঁড়ে ঘরে' কিংবা 'একটু খানি হওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে' কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় নজরুলের 'নুন নাই ঘরে উনুন জ্বলে না চালে ঘুণ ধরা বাত'। প্রেমের চিত্র অঙ্কনেও কবি কত নিপুন ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় 'হাসু' কাব্যে—

চাঁদ সুখে ভোর চাঁদের চুমো মাখিয়ে দেব সুখে
 তারা ফুলের মালা গাঁথি জড়িয়ে দেব বুকে।
 এ যেন 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী' গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া শ্রেনের
 কর্ণায়—

‘আমি কি তোমার কবি হব রানী তুমি কি কবিতা হবে
 তুমি কি আমার মনের বনের বঁশীটি হইয়া হবে!

এতে সজল হৃদয়ের গজল আর্তি অনুরণিত। মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা অকৃত্রিম
 দরদ ও অনন্ত সহানুভূতি নিয়েই কবি মানুষের মর্যাদাবোধও ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন অকণ্ঠ
 ভাবায়—

এদেশ কাহারো হবে না একার/যতখানি ভালবাসা
 যতখানি ভাগ্য যে দেবে পাবে ততখানি বন্দা!’ (বসন্ত ভ্যাগী)

ভয়াবহ সেই স্বাধীনতার দিন তুলিতে ‘গীতারা কোথায় গেল’ ছোট্ট গীতামণিদের জন্য
 কবির এই যে আক্ষেপ, এই যে বেদনাবোধ, এই যে অন্তর্বেদনা এ জন্যই কবি বেঁচে থাকবেন
 বাঙালির মনে ও প্রাণে, বাণী ও সুরের অঙ্গনে চিরকাল।

রবীন্দ্র নজরুল জীবনানন্দ সুকান্তের মতো কবি জসীমউদ্দিনও সমকালীন কবিদের
 দিকান্তব্যাপি অরণ-কিরণজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিজস্ব কাব্যবোধ, স্বতন্ত্র ভাষা,
 মানুষের প্রতি মমত্ব নিয়ে প্রকৃতির ধ্যেয়ানী দুলাল হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বকীয়
 বৈশিষ্ট্যে বলেই তিনি বাঙলার সারস্বত মন্ডপে শাস্ত্র আসন পেয়েছেন। সমালোচক তাই
 সঙ্গত উক্তিই করেছেন— “বিশ শতকের সময়সীমায় জন্ম ও জীবনাবসানের মধ্যে বিশশতকের
 দেশীয় ও আন্তর্জাতিক হাজারো রকমের ভয়ঙ্কর প্রতিকূল অবস্থার প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি
 দাঁড়িয়েও একেবারে সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে গ্রামীণ পল্লী প্রকৃতি ও পল্লী সমাজের
 মানুষের বিরহ-মিলন, রূপ-অরূপ ও সুন্দর-অসুন্দরের পালাকার কবি জসীমউদ্দিন নিজে
 একক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা কবিতায় বিরাজ করবেন।” □

প্রসঙ্গ সূত্র :

১। সূচয়নী — জসীমউদ্দিন

২। বঙ্গ-বসুন্ধরা (জসীমউদ্দিন সংখ্যা — ১৯৯৬)

৩। নবী কাথার মাঠ — জসীমউদ্দিন

With best wishes from :

A WELL WISHER

প্রত্যক্ষদর্শী তারাশঙ্কর

বাণী রায়

[লেখিকা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা, প্রয়াত ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের স্ত্রী]

তারাশঙ্কর তাঁর বাল্যকালে ও কৈশোরে দেখেছিলেন বহু কিছু। পরে সেই সূতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর মানসলোককে অভিনিস্ত করেছিল। শিল্পীর শিল্পী সত্তাকে বন্ধ করেছে সেইসব চরিত্র। তাদের আচার ব্যবহার সব কিছুই বৃষ্টিয়ে লক্ষ করেছেন। তাদের নিত্য দিনের আচার ব্যবহার পূজা উৎসব উপলক্ষে লাভপূরে আসত নানা ধরনের বেদে বেদেনীরা। বেদিয়া সাপুড়ে আসত বর্ষাকালে। মাঠে সাপ ধরত। গ্রামে সাপ খেলা দেখিয়ে ভিক্ষে করত, ঈদর নাচাত। ওরা যেত মেদিনীপুর পর্যন্ত। তাদের মুখে “খনছিলেন মেদিনীপুর অঞ্চলে কবিরাজ আছেন অনেক, তাঁরা কাল কেউটের বিষ কিনতেন এবং তা দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেন। কালো কণ্ঠ পাথরের মতো এদের গায়ের রঙ, তেমনি ছিল চুল। পুরুষদের দাঁড়ি গোঁফের প্রাচুর্য, মেয়েদের চুল রুদ্ধ ঘন কালো, বৈশাখের হাওয়ায় খুলতে থাকত দ্রুত ধাবমান কালো মেঘের মতো। তেমনি টিকলো ছিল নাক ও তীক্ষ্ণ চোখ। ওদের গানের দু’একটি মনে আছে—

“ও কালীনাগ ডংসেছে লখাকে বাসর ঘরেতে
বেউলা কাঁদে পতির শোকে পড়ে ধুলাতে।”

আরও একটা গান—

“কালীদহের ও লাগিনী, ফুসিস না এমন করে ফুসিসনা।

ও তারে দেখলে লাজের মাথা খাবি তাও কী মরণ বুঝিস না?

ও লাগিনী ফুসিস না।”

কালো কেউটে অত্যন্ত হিংসে। মানুষকে এরা তাড়া করে কামড়ায়। আমিও তাড়া খেয়েছি অন্য কেউটের দূতাবার। বেদের মেয়েরা কিন্তু আশ্চর্য। এরা তাড়া করে ধরে এই সব সাপ। বেদের মেয়ে তাড়া করে ধান ক্ষেতের ভেতরে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য হয়েছি, কী ব্যাপার। তারপরই দেখেছি প্রকাশ একটা কালকেউটের মুখ মুঠিতে ধরে অন্য হাতে লেজটা ধরে আক্কেল ভরে বলছে— ‘আমার হাত থেকে, যমের হাত থেকে তু পালাবি?’ মাত্র হাত দেড়েক লম্বা একটা ছড়ি হাতে সদ্য ধরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু দুলিয়ে নাচাতে দেখেছি গাইতে শুনেছি ‘ও লাগিনী আর ফুসিস না।’ বিজপদ পটুয়া রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে। এক একদিন বীদর নিয়ে নাচাতে আসত। গাইত— ‘ইরেমন নাচ দেখি লো। তেমনি তেমনি বাহ্যর করে নাচ দেখি লো। যেমন আমার খোকাবাবুর চান মুখ, তেমনি বিদায় পাখি লো।’ পরে জেনেছিলাম বিজপদ ও রাধিকা বেদেনী ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মা একবার একখানা শাড়িপুর্বে শাড়ি দিয়েছিলেন। আরও একজন মেছি যাবাবর বেদে আসত। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়।

আসত আর এক শ্রেণির বেদেনী। মেয়েরা কিন্তু অঙ্কুর বেশ ভূষায় আশ্চর্য শৌখিন, গারে গিন্জির গয়না, শৌখিন শাড়ি সেহের তাঁঙ্গে তাঁঙ্গে জড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয় ওরা

নৃত্য পসারিণী নটী। ভুরু টেনে নাকের নখ দু'লিখে হেলে দু'লে সুব করে কথা বলে গৃহস্থের দরজায় এসে দাঁড়ায়— 'ভিক্ষে পাই মা, সোনা কপালী চান্দবদনী, স্বামী সোহাগী, রাজার রানী', হাতে কনুই দিয়ে ধরে রাখে একটা খুড়ি, 'নাচন দেখাই মা' বলেই সেহ খানি নৃত্য মোলায় দু'লিখে গান ধরে— 'উরব্বু জাগ জাগ জাগির ঘিনা জাগ ঘিনি না উরুর...!' অদ্ভুত মিষ্টি ভাষা এদের আর তেমনই কী নাছোড় বান্দা। গৃহস্থ যদি বলে বাড়িতে অসুখ ভিক্ষে দিতে নেই, অমনি সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে বলে 'উকথা বলতে নাই মা, শত্রুর অসুখ হোক, বালাই বাট— বললে না হাত জোড়া আছে, হাতের কাকন নাড়া দিয়ে জোড়া হাত খুলে ফেল মা, রাজার মা, বাবু-সোহাগী।' এদের জাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা অদ্ভুত। এরা বলে অনেক কথা, টাকু মোড়ল বলে কে এক ওস্তাদ ছিল তার সোহাই দিয়ে জাদু দেখাত। আরও আসত সত্যিকারের বেদের দল। তাঁবু, গরুর গাড়ি, গরু, মহিষ, বোড়া, কুকুর নিয়ে দল। আরও আসত সত্য বেদের দল। তাঁবু গরু মোষ নিয়ে বিরাট দল। আজকাল অনেকেই এদের জ্ঞানেন না। এরা কেউ সাজত সন্ন্যাসী, কেউ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫- আমার কালের কথা।

এই সব বেদে বেদেনীর দলকে তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর সেইসব প্রত্যক্ষ জাত অভিজ্ঞতাই মানসলোকে জারিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে ছোট গল্পে কখনও উপন্যাসে। 'বাদুকরী' ও 'বাজীকর' তেমনই একটি দুটি ছোট গল্প এবং উপন্যাস 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'।

অবশ্য 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'য়ে বারো আনা কল্পনা একথা তারাশঙ্কর জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ থাকে বলেছিলেন বাঙলা সাহিত্যের রাতারাতি মহীকর সেই অবিদ্যায় পরমশ্রদ্ধায় প্রাজ্ঞ মানুষ রাজশেখর বসু বা পরওয়ারামের কাছে। রাজশেখর বসু বলেছিলেন, 'কল্পনা যখন সত্য হয়ে ওঠে তখন তাই-ই বাস্তব।' আমাদের শাস্ত্রে বলেছে বাস্তব যখন কবি কল্পনায় পরিনীলিত হয়ে ওঠে তখন তাই-ই হয় সত্য। কবি, হাস্যসুখী থাকে থেকে আরোগ্য নিকেতন তারাশঙ্করের শিল্প নূতন বাক নিয়েছে। তৃতীয় খণ্ড তারাশঙ্কর গল্পওচ্ছে একথা লিখেছেন তারাশঙ্কর সাহিত্যের ভাব্যকার শ্রদ্ধের স্বগদীশ ভট্টাচার্য।

হাস্যসুখী থাক ও নাগিনীকন্যার কাহিনী কাছাকাছি সময়ের রচনা। হিজল বিলের কথা তিনি তনেছেন মাত্র, চোখে দেখেননি। কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু ১৯৯৮ সালে 'বর্তমান' পত্রিকার রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রদ্ধায় সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আমাদের জানান যে ভাগীরথীর কূল বরাবর হিজল বিলের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল বা আছে। এটি লেখা তারাশঙ্কর শতবর্ষে। কাগজটি হারিয়ে যাওয়ায় তারিখটি সঠিক বলা যাচ্ছে না।

একদিন দুপুরে বেলা বারোটা নাগাদ সেই প্রাজ্ঞ হিতবী মানুষ রাজশেখর বসু এলেন টোলার বাড়িতে। তিনি খুটি পাঞ্জাবী পরেই এসেছিলেন, চোখে চিত্তরঞ্জনীর আমলের চশমা। আর তাঁকে ঘিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন, তিনি আমারই কলেজের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র রায়। বাড়িতে তখন অসুখবিসুখ চলছিল। আমার কাছে সংবাদ ছিল তিনি আসবেন। আমিও চলে এসেছিলাম কলেজ থেকে। ভালো সন্দেশ, কিছু নোনতা বিস্কুট আনিয়ে রেখেছিলাম অতিথির জন্য।

আগে চা বিস্কুট সন্দেশ ট্রেতে করে সাজিয়ে নিয়ে গেলাম। ট্রেটি নামিয়ে রেখে নতজানু

হয়ে প্রথমে রাজশেখর বসুকে পরে আর দুজনকেই প্রশ্রয় করেছিলাম। জ্ঞানতাম না তখন তিনি বেশল কেমিক্যালের কর্ণধার ছিলেন কী না। তিনি আমার মাধ্যম বলিষ্ঠ হাতখানি রেখে সেদিন আশীর্বাদও করেছিলেন। কে আমাকে আশীর্বাদ করলেন? চলন্তিকা, রামায়ণ, মহাভারতও গ্রন্থতা রাজশেখর বসু? না অসংখ্য রস রচনার রূপকর পরতরায়? আমি বেরিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম, ঘরে আলোচনা চলছিল মৃদুস্বরে। হয়ত নাগিনী কন্যা সম্পর্কে। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চলছিল। অনেকক্ষণ ছিলেন তিনি।

এর কিছুদিন পরই নাগিনীকন্যার চিত্রসমূহ বিক্রয় হয়। ছবির কাজও আরম্ভ হয়েছিল। এখানে বলে রাখা ভালো তারাশঙ্কর কখনও কোনও ছবির গুটিং দেখতে যাননি। কিন্তু গেছেন থিয়েটারের রিহার্সালে। কারণ জীবনের প্রথম থেকেই লাভপুরে তিনি নাটকে অংশ গ্রহণ করেছেন। 'চিরকুমার সভা' অভিনয় হয়েছে একথাও শুনেছি। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় নির্মলসিংহ বাবু 'পূর্ণিমা' বলে একটি কাগজ প্রকাশ করতেন। তাতে তারাশঙ্করের লেখাও প্রকাশিত হত।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র প্রতি দুর্বলতা ছিল বলেই তারাশঙ্কর একদিন গুটিং দেখতে গিয়েছিলেন। সেদিন সঙ্গে ছিলাম আমি ও তারাশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্র দাদা সনৎ। স্টুডিওতে যখন পৌঁছলাম তখন সবই ভেঁতা। শুধু ছবি বিশ্বাস একটি বাঘছাল পরে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছেন। ছবি বিশ্বাসের সবই রাজকীয়। যে কোনও অভিনয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। একী ছবিবাবু, আপনি হাঁফাচ্ছেন কেন? প্রশ্ন করেন তারাশঙ্কর। ও হাঁফানী সেয়ে যাবে, ওষুধ খেয়েছি। আপনি এভাবে গুটিং করবেন কীভাবে? বাড়ি যাচ্ছেন না কেন? আবার ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন রাখলেন তারাশঙ্কর। ছবি বিশ্বাস হাসলেন— তাই কী হয় তারাশঙ্কর বাবু? আমিই তো ওঁদের আজ ডেট দিয়েছি, বাড়ি গেলে বহু লোকসান হবে ওঁদের। ইনিই ছবি বিশ্বাস, যিনি নিজের কর্তব্যে সজাগ সচেতন সর্বদাই। 'সুই পুরুষ' নাটকে ইনি নুটু বিশ্বাসীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। ছবিবাবু তারাশঙ্করের পূর্ব পরিচিত।

আরও দুটি মেয়ে বসে ওই ফ্লোরেই কথা বলছেন ইংরেজীতে। অভিজাত উচ্চারণ ঠাসের, কনভেন্টে পড়া মেয়ে দুটি বোন এটুকু বোঝা গেল। তবে দুটি বোনের বেশবাস সম্পূর্ণ ভিন্নতর। একটি বোন তখনকার দিনের আধুনিকের বেশবাস বা পোশাক যেমন হত ঠিক তেমনি পোশাকে। আর একটি বোনের পরনে তাতের ডুরে শাড়ি সবুজ রঙের, তাও সাধারণভাবে পরা, হাটুর নিচে পর্যন্ত নেমেছে। ঘটি হাতা ব্লাউজ। বোঝা গেল হয়ত তিনি শবলার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। কিন্তু বাঘছাল পরা ছবি বিশ্বাসের ভূমিকাটি কীসের? কোনও শিববেসের? শিববেসের পরণে তো বাঘছাল থাকা নেই অন্তত নাগিনী কন্যার কাহিনীতে? আর ওই কনভেন্টে পড়া অভিজাত সুসেহী তরুণীটি কি বেদেনীর ভাবা রঙ করতে পারবেন? সংশয় জাগে। এদিকে ছবি বিশ্বাসের গায়ে স্মরণ, হাঁফাচ্ছেন। তার মধ্যেই তিনি বলছেন, বসুন আপনারা, আপনারা বসুন তারাশঙ্কর বাবু। চা-ও এল আমাদের জন্য।

এর বেশ কিছুক্ষণ পর এলেন ক্যামেরাম্যান পরিচালক তাঁর বিরাট ইউনিট নিয়ে। উপস্থিত গুটিং হজ্জিল শবলাকে নিয়ে। শবলার মাধ্যম একটি সাপের ঝাঁপি। সে বলবে কিছু সংলাপ 'জয় মা বিশ্বাসি, বেদেনী কন্যা আসছে গো তুমার দুয়ারে ভিখ মাঙতে'। বলতে বলতে একটি গৃহস্থের দরজায় এগিয়ে যাবে। কতবার যে রিহার্সাল দেখিয়েছেন পরিচালক।

ক্যামেরা চলছে। শবলার মুখের ওপর জোরাল আলো পড়েছে, চোখ ঝলসে যাওয়া

আলো। শবলা সাপের খাঁপি মাথায় করে ওই কথাগুলি বলতে বলতে চলছে— ‘কাট’, পরিচালক বলে উঠলেন— হলনা। বেদেনীর সেই মুখটি ঠিক আসছে না— আবার রিহার্সাল দিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে দেখিয়ে দিলেন। আবার শবলা ওই কথাগুলি বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে— পরিচালক চেঁচিয়ে বললেন ‘কাট’। আসছে না আসছে না, বেদের মেয়ের সেই সুরটি ঠিক আসছে না।

সেদিন এইভাবে দুঘণ্টায় ওই একটি মাত্র শট নেওয়া হয়েছিল। তারানন্দর তো বিরক্ত হয়ে উঠে চলে এসেছিলেন। তাঁর চিন্তা অসুস্থ ছবি বিশ্বাসের জন্য।

একটা ছবি করতে গিয়ে সমগ্র ইউনিটের যে কত পরিশ্রম থাকে তা তো আমরা চিন্তা করে দেখি না। ছবি দেখে তার সমালোচনায় মুখর হই। কিন্তু ছবি তৈরি করার অন্তরালে কত কত মানুষের পরিশ্রম থাকে তা ভেবে দেখি না কোনওদিন। সেইদিন সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

তারানন্দর লাভপুরে যেতেন ওটিং দেখার জন্য নয়। তাঁর দেশে অতিথি গেছেন শ্রদ্ধেয় তপন সিংহ। তাঁরা অতিথি হয়ে ছিলেন শ্রদ্ধেয় যাদবলাল ঝাবুর কনিষ্ঠা কন্যার বাড়িতে। বড় বাড়িতে। অসুবিধা হবার কথা নয়। পরে এঁরা কোলিয়ারী কিনেছিলেন এবং গ্রুচর বিস্তার মালিক হয়েছিলেন। তবে এঁরা বড় বড় কাজে বাড়িগুলি ব্যবহার করতে দিতেন সাধারণ মানুষকে। এইটাই এঁদের বড় গুণ ছিল। □

ছোট-বড় সকলের জন্য

সাগর বিশ্বাসের

ছড়ার বই

ছড়াছড়ি কলকাতা

(২য় সংস্করণ)

ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাঃ লিঃ

৫৬ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

দূরভাষ : ২৩৫০-৪৫৩৪

মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডুর লেখায় ও চন্ডী লাহিড়ীর

রেখায় একটি অভিনব ছড়ার বই

একশের অ্যাবোণ অ্যাবোণ

মূল্য-৩৫ টাকা

পরিবেশক : একুশ শতাব্দী

ইরাক-যুদ্ধ আমেরিকার মুখচ্ছবি ও আমরা

নীতীশ বিশ্বাস

[লেখক দলিত সমন্বয় সমিতি, সহনর্মী ও ঐক্যজন গবেষণা পত্রের সম্পাদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি প্রক্টর। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এ লেখার মানন ও ক্রম রিডিং তাঁর। লেখাটির শীর্ষ নাম দেওয়া ছাড়া সম্পাদকের আর কোনও দায় নেই।]

ইরাক যুদ্ধ নয় গণহত্যা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ২০০৩ সালের ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত মার্কিন সরকার বিভিন্ন দেশ কম করে ৭০ বার আক্রমণ করেছে। যার মধ্যে ৫৩টি বড় আক্রমণ। * শুধু তাই নয় তাদের নগ্ন আক্রমণের নগ্ন প্রকৃতির অঙ্ক হিসেবে ৫৯টি দেশে গায়ের ছোরে তারা ৩৯৫টি স. রক খাটিও তৈরি করেছে। তাদের আক্রমণের আসন্ন তালিকায় ইরান, সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়া। নিশ্চয়ই এ ভাবে চলতে থাকলে পরবর্তী আক্রমণ স্থল হবে ভারত। একশো দশ কোটি মানুষের দেশের বাজার দখল আর এশিয়ার এক বৃহত্তম জনশক্তির অধিকারী হতে পারবে এ বৃহৎ এক নায়ক শক্তি। এমনি এক ভয়ঙ্কর আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বব্রাস হিটলার সারা পৃথিবী গ্রাস করতে উদ্ভূত হয়েছিলো। তখন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, নবীন শক্তির সেই অশক্ত দুর্বলতা নিয়েই এক উন্নত দেশপ্রেম ও বিশ্বের শান্তি কামী মানুষের সমর্থনে মহান স্তালিন তাকে পর্যুষ্ট করেছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে সেই সুস্থ আদর্শবাদী শক্তি নেই। চীনও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্ব করতে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে না; তারা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সুলভ দূরত্ব বজায় রাখছে। সাম্রাজ্য বাসী দুনিয়ায়ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও তাদের কেউই আমেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলে বলির পাঁঠা হতে চাচ্ছে না। তবে মধ্য প্রাচ্যের তেলের দখলের লোভ তাদের মধ্যে একটু প্রতিযোগিতার মানসিকতাকে উসুকে দিতে চাইলেও সরাসরি প্রতিবাদে সানিল করতে পারে নি। অন্য দিকে ব্রিটেন, মার্কিনীদের তাবোদারী ক'রে ডেলের যে বরাহ, চেয়েছিলো ইরাক পতনের পর সে স্বপ্ন তাদের পূরণ হয়নি। সে কথা পরে কিন্তু আমরা দেখলাম প্রতিবাদী শক্তির অভাবে, সামরিক শক্তির তার সানোয়র অভাবে, ইরাকের মতো শক্তিশালী দেশের প্রবল দেশপ্রেমের প্রবাহও মার্কিন ভয়ানক আক্রমণে 'হারালো ধারা'। বিশ্বের মানবতাবাদের এ এক চরম পরাজয়। এ বড় দুঃখের সময়, বড় দুর্ভাগ্যের সময়!

অন্যান্য ছোট বড় ভাগ বিভাগ : সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া গত প্রায় এক শতাব্দী বিশ্বের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করেছিলো। তাও আজ অনুপস্থিত। আমেরিকা তাই ঠাড়া যুদ্ধের নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যুদ্ধ বাধিয়ে রাখছিল। তাদের গবেষকরা পৃথিবী বুঁজে ফিরছিলো মানুষে মানুষে অনৈক্য কোথায়, তার মূলই বা কোথায়, তা জেনে মার্কিনী গোয়েন্দা ও শরতান বুদ্ধিজীবীরা এই সব বিরোধ গুলোকে মূলধন করে যেমন সোভিয়েত দেশকে ভেতর থেকে ভেঙ্গে দিয়েছিলো, তেমনি যেখানে

* নিবন্ধ শেষে ডালিকা দেখুন।

তা পারেনি সেখানে নির্বিচার নরহত্যা, গণহত্যা, সভ্যতা ধ্বংস করে ছোর করে দখল নিয়েছে। যেমন ইরাক।

পৃথিবীতে ফিলেল ফাস্তো, বুশের নাকের ডগায় তার তেজ ও বীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ তার জন-কল্যাণী রাষ্ট্রব্যবস্থা আর সুশিক্ষা তাতে নানা ভাবে ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু যে দেশে দালাল বাহিনী। স্বত্বাসবাদী বিচ্ছিন্নতা বাদী শক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব সেখানে মার্কিনী চরু তা সুসম্পন্ন করেছে। ভারতের কেন্দ্রে খালিস্তানী কাশ্মীরী উগ্রবাদী উলফা, আলফা; আসামে, টি ইউ জে এস, (ত্রিপুরায়) মণিপুরে, মেঘলয়ে খ্রীষ্টান উগ্রবাদী যেমন আছে তেমন পাকিস্তানী আই এস আই এদেরই সৃষ্টি। সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে আফগানদের অন্যান্য সোভিয়েত সন্নিহিত অঞ্চলে যেমন ধর্মীয় গোষ্ঠী (খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রধানত) ওসিকে সাময়িক মদত দিয়েছে—পরে সেই তালীবানীদের আবার তারাই (আমেরিকাই) নিজে ধ্বংস করেছে।

অর্থাৎ সব স্বড়িয়ে একথা সংক্ষেপে বলা যায় যে অর্থনৈতিক ফাটকাবাত্তী, রাজনৈতিক চরিত্র হীনতা, সাংস্কৃতিক ব্যাভিচার আর ক্ষমতার দানবীয় দত্ত আমেরিকাকে মানবসভ্যতার সামনে এক ভয়ানক শয়তান হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তবে কোন শক্তি যখন ভয়ানক হয়ে ওঠে, স্বাধিকতার শর্তেই তার অভ্যন্তর থেকেই ভাঙন আসে। তা আপাত দৃষ্টি গোচর না হলেও ইতিহাসের তব্ধিষ্ট পাঠক জানেন যে, কাল স্রোতে দশবছর আগে আর কুড়ি বছর পরে হতে পারে কিন্তু এই অতি উচ্চতা একদিন ভাঙবেই। তা কত দ্রুত হবে তা নির্ভর করেছে সমাজের নানা ঘটনাকে ব্যবহার করে এর বিরোধী শক্তি কত দ্রুত আঘাত হানতে পারবে তার উপর।

প্রধান ভাগ বিভাগ কি? আপাত দৃষ্টিতে পৃথিবী বিভক্ত ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলীম শক্তি বনাম খ্রীষ্টান শক্তি। কিন্তু তাও সত্য নয়। কারণ দুদিন আগেই মুসলীম মৌলবাদ কে তাদের ধর্মাত্ম তালবানী মত ও পথকে এই বিজ্ঞানে উন্নত দেশ আমেরিকা সবচেয়ে বেশী মতদ যুগিয়েছিলেন। আজ তা একটু ঘুরে গেছে।

অন্যদিকে ইউরোপ নতুন অর্থব্যবস্থা চালু করে একটি সাম্রাজ্যবাদী মহাদেশীয় ঐক্যস্থাপন করেছে। তারা জি-৮ নামের আড়ালে আর এক ধরনের গুপ্ত ঐক্য হয়েছে। তা ছাড়াও বানিজ্য, অন্তর্বিক্রী, নানারকম কার্যকারণ সূত্রে পৃথিবীর ঘরের ভেতরে নানা ঘর। কোথায় যে কোন জট কি ভাবে পাকিয়ে উঠবে তার ঠিক নেই। ফলে বিশ্বের আশাবাদী শান্তিকামী মানুষের সামনে আজ আধার ছড়িয়ে থাকলেও, তাতে ফাটল ধরতে খুব বেশী সময় নাও লাগতে পারে।

ইরাক যুদ্ধ ও ভারতীয় চিত্রপট : ভারতের শাসক শ্রেণীর যত দোদুল্যমানতাই থাকুক বাজপেয়ী সরকারের আরো কোন, সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের দেওয়া সর্ব এমনভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেনি। কারণ এরা বাইরে আমেরিকার অঙ্গ ভাবেদারী করেছে, এই কথা ভেবে যে তার প্রতিক্রিয়া সেন্সর ভেতরে তেমন কিছু পড়বে না। কারণ এখানে গণতান্ত্রিক শক্তির দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বিকল্প কোন ভাবেই দানা বাঁধতে পারেনি। না হলে উত্তর ঝ্রংশে যেমন

মুলায়েন সিং মুখ্যমন্ত্রী হতেন তেমনি ভারতেও এতদিনে সোনিয়া প্রধান মন্ত্রী হতে পারতে। সাম্যবাদী বা বামপন্থী শক্তিও তাদের কংগ্রেস সংক্রান্ত মুলায়ান ও সিদ্ধান্তে একমুখী নয়। বামপন্থী বিভিন্ন দলে ছোট ছোট অস্ব বিরোধ বিসংবাদ তাদেরকে ভারতে দক্ষিণ পন্থাকে অন্তর্বিরোধ নাড়া দেবার শক্তি অর্জনে সামর্থ্য হতে দিচ্ছে না। আর বিজেপি, আর. এস. এস. কিং হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা তার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মৌলবাদী তৎপরতা এত দ্রুত ও সংগঠিত ভাবে করে যাচ্ছে যে সাম্যবাদীরা তার তুলনায় কোন অগ্রগমনই ঘটতে পারেনি, পারছে না। ফলে ভয়ানক এক ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ আমাদের সামনে হান্ডড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে প্রগতি প্রতীকী দ্রুত সচেতন ও সক্রিয় না হলে তারা, থাকা মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বলে। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের হিন্দুত্বের নীতি, ধর্মীয় নরম লাইন যেমন বিজেপির ধর্মীয় সংস্কৃতিকে এগোতে সাহায্য করছে, তেমনি ভারতীয় রাজনীতিতে দলিত শক্তিকে গ্রহণের জন্য যে মানসিক উদারতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রয়োজন ছিলো, বাম পন্থীদের তা নেই বলে; দলিত শক্তির একটা বড় অংশকে ব্যবহার করছে বিজেপি।

দলিত নামে শক্তির বিশ্বাস ঘাতকতা : বাম পন্থীরা যেমন দলিত শক্তিকে তাদের নিজস্ব আন্দোলনের নেতৃত্বে স্থাপন করে নিজেদের দিকে টানতে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি মনুবাদের বিরোধিতা, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করার নাম করে মায়াবতী মনুবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তি এন. ডি. এ কে নিশাও সমর্থন দিয়ে উত্তর হ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীত্ব কিনেছেন। এ তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা। এসব কিছুই সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনী আনুগত্য প্রসারের ক্ষেত্রে বিজেপি নামক দক্ষিণপন্থী শক্তির প্রভাব ও প্রাধান্য কাজে লাড়ানোর পরোক্ষ সহায়তা দান।

কংগ্রেসের বিদেশ নীতির দেউলেপনা : কংগ্রেসও বিদেশ নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে গ্যাট সহ নানা যুক্তি সম্পাদন করে যেভাবে আমাদের সার্বভৌমত্ব বিক্রী করার পথে পা দিয়েছিলো; বিজেপি তাকে দ্রুত নিম্ন মুখী করে জনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সমস্ত কিছুই তারা ১০% ভারত বাসীর স্বার্থে সম্পন্ন করেছে। ইরাক যুদ্ধের মুখে পড়িয়ে ভারতের বামপন্থীদের আঙ্গ দেশীয় জাতীয়তাবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে গভীর সখা স্থাপন করতে হবে। যা একদিকে বিজেপি, আর. এস. এস. এর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ঠেকাবে ভেতরে তেমনি দলিত মুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে সংরক্ষণ থেকে নানা ক্ষেত্রে দলিতদের কাছে টানতে হবে। যাতে অভ্যন্তরীণ বিশাল এক শক্তি প্রবাহ সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ন্যূনতম শর্তে।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা : ভারতীয় রাজনীতির মূর্ত চিত্রা আঙ্গ তিনটি বিষয় চরিত্র বিচারে বুদ্ধিজীবীদের ভালোকারে মানুষকে বোকাতে হবে।

(১) ধর্ম নিরপেক্ষতা : যা হিন্দু মুসলমান অনৈক্য কমাবে। কান্দীর সহ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের উত্তেজনা কমাবে। এক্ষেত্রে বামপন্থী-মুসালেমপন্থী ও কংগ্রেসকে একত্রে দাঁড়াতে হবে।

(২) বিদেশনীতি : এক্ষেত্রেও উক্ত দ্বিতীয় বিকল্পকে শক্তি শালী হতে হবে। কংগ্রেসের বিদেশ নীতি ও সাম্রাজ্য বাদী তোষণ নীতি কমাতে হবে। বামপন্থীদেরকে কংগ্রেসের সঙ্গে

দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব করতে হবে। যাতে তাদের নীতি নির্ধারণে বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রভাব পড়ে, এবং কংগ্রেসের হিন্দু ও মুসলমান পরিচয় বড় হয়ে না ওঠে।

(৩) দলিত জাগরণে : দলিত শক্তিকে সংরক্ষণ সহ সাংবিধানিক বা অধিকার আছে তার জন্য আন্দোলনে এগিয়ে আনতে হবে। বিজেপিও বি-এস-পির হাত থেকে দলিতদের মুক্ত করতে বামপন্থীদেরই সবচেয়ে দ্রুত ও ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী নিতে হবে। আবেদনকর, যোগেন মন্ডল সহ ভারতীয় দলিত নেতৃবৃন্দের প্রতি ষাণ্মাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন সহ অন্যান্য পদক্ষেপও তাদের সূচিভিত্তি ভাবে দিতে হবে।

উপসংহার : একটি কবিতার দুটি লাইন উদ্ধৃত করে ইরাক যুদ্ধ প্রেক্ষিতে ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে আমার এ আলোচনা প্রথমাংশ শেষ করবো।

“বিচ্ছিন্ন ইরাক,

আমাদের ফিরাক

দেশ প্রেমের দিকে।”

কবির এই আহবানের পেছনে রক্তাক্ত ঐক্যবদ্ধ ইরাকি জাতির প্রতি; তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বীকৃতির প্রতি সন্ত্রস্ত অভিনন্দন আছে। যা শহীদদের প্রাণ্য।

আমাদের দেশেও আজ সাম্রাজ্যবাদী পন্থা বর্জনের ডাক এসেছে। যাত্রিক ভাবে সর্বত্র না পারলেও ভিয়েতনাম যেমন পেরেছে কোকাকোলা সংস্কৃতি ধ্বংস করতে, তা নিশ্চয় আমরা পারি। আমরা পারি বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ভারতের বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন বুদ্ধিজীবী শিষীদের সঠিক গান গাওয়া। তারাই তো প্রভাত পাবীর মতো মানুষকে জাগাবে। সঠিক পথ চিনতে, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সজাগ করবে। আজ তাই বিজেপি ও তার মদত দাতাদের সম্পূর্ণ বর্জন করে ধর্ম নিরপেক্ষ সমস্ত শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ আমাদের করতে হবে।

পরে চলার পথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের ছেড়ে এগোতে হবে। যুক্ত ফ্রন্টের খিনিস ভো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমকালের ডাক। আসুন ইরাক যুদ্ধের শিক্ষা নিয়ে দানব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের অনুগামী সামন্ত মৌলবাদী শক্তি বিজেপির বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য গড়তে আমরা কলম ধরি; প্রয়োজন হলে বিপ্লবীরা একদিকে বিদেশী বর্জন করবেন এবং অস্ত্রও ধারণ করবেন। কিন্তু আজ এই গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ সামাজিক ন্যায়ের যুদ্ধকে এগিয়ে নেওয়াই ভারত ভূমির মূল্য কল্যাণকামী কাজ। সেদিকে সহিষ্ণু ও সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করি রথী মহারথী থেকে পদাভিক সেনাবাহিনী। বিশেষ করে দেশ প্রেমিক মানুষের।

যুদ্ধ তালিকা

দেশ ও সাল	আক্রমণের ধরন ও উদ্দেশ্য
১। চীন ১৯৪৫-৪৯	জাপানের পরাজয়ের পর চীনে প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং-কাই-শেকের রাজত্ব স্থাপনের জন্য কমিউনিস্ট বাহিনীকে আক্রমণ

দেশ ও সাল	আক্রমণের ধরন ও উদ্দেশ্য
২। গ্রীস ১৯৪৭-৪৯	যুদ্ধে হিটলারের সহযোগী ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতায় বসাবার জন্য গ্রীসের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি কমিউনিস্ট ও বামপন্থী বাহিনীকে আক্রমণ।
৩। ফিলিপাইন ১৯৪৫-৫৩	ফিলিপাইনে জাপানি দখলকারী সৈন্যদের সঙ্গে তখনও যুদ্ধেরত বামপন্থী 'হুক' গেরিলাদের আক্রমণ।
৪। পুয়ের্তোরিকো ১৯৫০	দেশের জনবিরোধী অভ্যুত্থারী সরকারের বিরুদ্ধে গণবিপ্লোহ দমনের জন্য আক্রমণ।
৫। উঃ কোরিয়া ১৯৫১-৫৩	মার্কিন অনুচর দঃ কোরিয়া সরকারের সাহায্যে বিপুল বাহিনী নিয়ে হুগে, জগে, আকাশে আক্রমণ।
৬। ইরান ১৯৫৩	নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে গণবিপ্লোহে বিভাডিত মার্কিন ঠাবেদার শাহকে এনে আবার গদীতে বসানোর জন্য ব্যাপক আক্রমণ।
৭। ভিয়েতনাম ১৯৫৪	মুক্তি বাহিনীর হাতে দখলবন্দরী ফ্রান্সি সেনাদের পরাজয় ঠেকাবার জন্য ফ্রান্সি বাহিনীর হাতে এ্যাটম বোমা তুলে দেবার প্রস্তাব। বিশ্বজোড়া প্রতিবাদের ফলে শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রস্তাব পরিত্যক্ত।
৮। ওয়েডামালা ১৯৫৪	দেশের মার্কিন কোম্পানিগুলি, বিশেষ করে কুখ্যাত ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি জাতীয়করণ করার অপরাধে হুগে, জগে, আকাশে আক্রমণ করে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত এবং একটি পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসানো। এই সরকার দঃ আমেরিকার অন্যতম নিষ্ঠুর খুনী সরকার বলে 'খ্যাতি' অর্জন করেছিল।
৯। কাম্বোডিয়া ১৯৫৫-৭৩	সিহানুক সরকারের উচ্ছেদের জন্য বোমবর্ষণ শুরু। ১৯৭০ সালে কু সংগঠিত করে সিহানুকের অপসারণ।
১০। লেবানন ১৯৫৫	জাতীয় অভ্যুত্থান দমনের জন্য হুগে, জগে, আকাশে আক্রমণ।
১১। মিশর ১৯৫৬	সুয়েজ খালে দখল রাখার জন্য যুদ্ধে এ্যাটম বোমার ব্যবহারের চেষ্টা। সোভিয়েত ইউনিয়নের হুমকিতে পশ্চাতে অপসারণ।
১২। পানামা ১৯৫৮	মার্কিন সরকার কর্তৃক পানামা খাল দখলে রাখার প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ দমনের জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ।

১৩। ডিয়েতনাম ১৯৬০-৭৩	মুক্তি বাহিনীর কাছে দখলনারী ফরাসি বাহিনী পরাজিত হবার পর মার্কিন সরকার ডিয়েতনাম আক্রমণ করে। ১৩ বছর যুদ্ধের পর পরাজিত মার্কিন বাহিনী ডিয়েতনাম ত্যাগ করে। মার্কিন বাহিনীর বিধ্বংসী আক্রমণে ১০ লক্ষাধিক ডিয়েতনামী নিহত হয়; বিধ্বস্ত গ্যাস ও রাসায়নিক ব্যবস্থারে ডিয়েতনামের বনসম্পদ ধ্বংস হয়, মাটি ও জল বিধ্বস্ত হয়।
১৪। কঙ্গো/জাইরে ১৯৬০	মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের নির্দেশে সদা স্বাধীন কঙ্গোর প্রথম রাষ্ট্রপতি প্যাট্রিস লুমুম্বো নিহত। সি আই এ-র অনুচর মকুটোকে গণীতে বসানো হল। মকুটোর শাসনে কঙ্গো/জাইরে আফ্রিকার অন্যতম নিকট অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রে পরিণত হল।
১৫। লাওস ১৯৬১	জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দমনের জন্য ফুল ও আকাশ থেকে আক্রমণ।
১৬। কিউবা ১৯৬১-৬২	মার্কিন সহায়তায় দেশভাগী পক্ষম বাহিনী-কিউবানদের সশস্ত্র আক্রমণ।
১৭। পানামা ১৯৬৪	পানামা খালে দখল রাখার জন্য দ্বিতীয় বার আক্রমণ।
১৮। ব্রাজিল ১৯৬৪	কয়েকটা মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানির জাতীয়করণ এবং কয়েকটোর মুনাকা পাচার সীমাবদ্ধ করার অপরাধে এক সামরিক কু সঙ্গঠিত করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি গাউলার্টকে গদিচ্যুত করে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা।
১৯। গুয়ানা ১৯৬৪	মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডির নির্দেশে গুয়ানার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হেন্দী জগনকে ক্ষমতাচ্যুত করে এক পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা।
২০। ডামিনিকান ১৯৬৪	দেশের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জুয়ান বচ (Juan Bosch) ভূমি সংস্কার ও জাতীয়করণ প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করায় মার্কিন সরকারের সংগঠিত এক সামরিক কুতে পদচ্যুত। দুবছর পরে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশে বিদ্রোহ হলে তা দমন করার জন্য ২৩০০০ মার্কিন সৈন্যের এক বাহিনী আক্রমণ চালায়।
২১। ইন্দোনেশিয়া ১৯৬৫	জোটনিরপেক্ষ শক্তিদের অন্যতম নায়ক ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকার্নো সি আই এ সংগঠিত এক সামরিক কুতে পদচ্যুত।

	জনপ্রিয়তার জন্য তাকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট সমর্থক সম্মেহে ১০ লক্ষ ইন্দোনেশীয়কে হত্যা করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫ লক্ষের নামের তালিকা সি আই এ ক্যার সামরিক নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। এই গণহত্যা সম্পর্কে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা লিখেছে 'সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যাগুলির অন্যতম।'
২২। গ্রীস ১৯৬৭	আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে উদারপন্থী নেতা জর্জ পাপানড্রুর দলের নিশ্চিত জয় আটকাবার জন্য সি আই এ সংগঠিত সামরিক ক্যু। ক্যু-র পরে দেশে মার্শাল ল জারি ক'রে সহস্র সহস্র গণতন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামরিক শাসনের প্রথম মাসেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে কম করে ২০০০ বন্দী নিহত হয়েছেন।
২৩। গুয়েতেমালা ১৯৬৬-৬৭	আমেরিকার হাডের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ।
২৪। কম্বোডিয়া ১৯৬৯-৭৫	মার্কিন তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ দমনের জন্য বোমা বর্ষণ।
২৫। লাওস ১৯৭১-৭৩	বামপন্থী সরকারকে হটবার জন্য ব্যাপক বোমাবর্ষণ।
২৬। চিলি ১৯৭৩	নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্ডের সরকার উৎখাতের জন্য সি আই এ সংগঠিত সামরিক ক্যু। আলেন্দে নিহত।
২৭। অ্যান্ডোলা ১৯৭৬-৯২	সদ্য স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য প্রত্যক্ষ মার্কিন সহায়তার জাতি বিদ্রোহী দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সামরিক অভিযান।
২৮। ইস্ট টাইমর ১৯৭৫	ইন্দোনেশিয়ার সামরিক জুঁটা মার্কিন প্ররোচনায় ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই স্বাধীনতা দ্বীপটি দখল করে। অ্যামনেস্টি ইন্টার-ন্যাশনালের হিসাব মতে ইন্দোনেশিয়ার দখলকারী বাহিনী ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দেশের ৭ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২ লক্ষ অধিবাসীকে হত্যা করেছে। জাতিসংঘের সভায় ও বাইরে মার্কিন সরকার এই গণহত্যার সাফাই গেয়েছে।
২৯। ইরান ১৯৮০	সন্ত্রাসবাদীর দমনের অজুহাতে আবার বোমাবর্ষণ ও আক্রমণ।

৩০। লিবিয়া ১৯৮১	সন্ত্রাসবাদী দমনের অঙ্গুহাতে আবার বোমাবর্ষণ ও আক্রমণ।
৩১। সালভাদোর ১৯৮১-৯২	মার্কিন মদতপুষ্ট একচ্ছত্র সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ দমনের জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ।
৩২। নিকারাগুয়া ১৯৮১-৯১	সি আই এ সংগঠিত প্রতিবিদ্রবী 'কন্ট্রা' বাহিনীর সমর্থনে সামরিক হস্তক্ষেপ। এই আক্রমণে দেশের ১৯ লক্ষ অধিবাসীদের প্রায় দু'লক্ষ নিহত। নির্বাচিত স্যান্ডিনিস্টা সরকার উচ্ছেদ।
৩৩। হন্ডুরাস ১৯৮২-৯০	জোর করে হন্ডুরাসে সামরিক ঘাঁটি বসাবার জন্য আক্রমণ।
৩৪। লেবানন ১৯৮২-৮৪	প্যালেস্তাইন মুক্তি যোদ্ধাদের ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য হলে, জলে, আকাশে আক্রমণ।
৩৫। গ্রেনাডা ১৯৮৩	গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মরিস বিশপকে উৎখাত করার জন্য ১১০,০০০ অধিবাসীর দেশে হলে ও আকাশে আক্রমণ। বিশপ গদিচ্যুত। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগানের মনোনীত এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির গদীতে অধিষ্ঠিত।
৩৬। লিবিয়া ১৯৮৬	গাদাফিকে গদিচ্যুত করার জন্য হলে ও জলে আক্রমণ। আক্রমণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ।
৩৭। ইরান ১৯৮৭	ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় ইরাকের সমর্থনে নৌবাহিনীর আক্রমণ।
৩৮। লিবিয়া ১৯৮৯	তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের দমনের জন্য নৌ ও বায়ু বাহিনীর আক্রমণ।
৩৯। ফিলিপাইন ১৯৮৯	দুনীতিপরায়ণ র্তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলন দমনের জন্য বোমাবর্ষণ।
৪০। পানামা ১৯৮৯	২৭০০০ মার্কিন সৈন্যের আক্রমণ। ৩০০০ পানামাবাসীকে হত্যা করে গণপ্রতিরোধ চূর্ণ। দেশের রাষ্ট্রপতি এটেনিয়া নোরিগাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ মাদক দ্রব্যের ব্যবসা। নোরিগা ইতিপূর্বে মার্কিন সরকারের একান্ত বশবৎ অনুচর ছিলেন। সম্প্রতি কোন কোন বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিচ্ছিলেন বলে এই শাস্তি।

৪১। ইরাক ১৯৯১-৯৩	বিরাট হুল, নৌ ও বায়ু বাহিনীর যৌথ আক্রমণ। এই যুদ্ধের ইরাকের উপর ৪০ দিন ও রাতে ১৭৩ লক্ষ পাউন্ড বোমা বর্ষণ করা হয়। এত কম সময়ে এত বেশি বোমা বর্ষণ ইতিপূর্বে কোনও যুদ্ধে হয়নি। এছাড়া আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিসম্পন্ন ডেজলিত্রয় ইউরোনিয়ামের অস্ত্রও ব্যবহৃত হয়, যার ফলে ইরাকে ক্যান্সার ছড়াচ্ছে। যুদ্ধের পরে ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ ঘোষণা করা হয়। এই অবরোধের ফলে লক্ষ লক্ষ শিশুর অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে। এই যুদ্ধের খোঁজ উদ্দেশ্য ছিল ইরাকের গণহত্যার অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস। ইরাকের এরকম কোনও অস্ত্রভাণ্ডার ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশকে ধ্বংস করা।
৪২। কুয়েত ১৯৯১	গদিচ্যুত রাজাকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য হুলে, জলে, আকাশে আক্রমণ।
৪৩। সোমালিয়া ১৯৯২	উপজাতিদের গৃহযুদ্ধে নিজেদের পছন্দের উপজাতিদের পক্ষে হুল সেনা, নৌ সেনা ও বায়ু সেনাদের আক্রমণ।
৪৪। যুগোস্লাভিয়া ১৯৯২-৯৪	দেশটাকে ভাঙার উদ্দেশ্যে নৌবাহিনীর আক্রমণ।
৪৫। বসনিয়া ১৯৯২-৯৪	দেশটাকে ভাঙার উদ্দেশ্যে নৌবাহিনীর আক্রমণ।
৪৬। হাইটি ১৯৯১	মার্কিন ক্রীড়নক অ্যাচারী ডিক্টেটর ডুভালিয়েরের উৎখাতের পরে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এ্যাভিস্টাইডকে সি আই এ সংগঠিত এক কু'তে গদিচ্যুত করা হয়। এই কু সফল করার জন্য মার্কিন নৌবাহিনী দ্বীপটিকে অবরোধ করে রাখে।
৪৭। জায়েরি/কসো ১৯৯৬-৯৭	রাওয়ান্ডার গৃহযুদ্ধে 'স্টু' উপজাতিকে পরাস্ত করার জন্য আক্রমণ।
৪৮। আলবেনিয়া ১৯৯৭	কলকনে আধিপত্য বিস্তারের জন্য আক্রমণ।
৪৯। সুদান ১৯৯৮	তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের শান্তি দেবার নামে ক্রোপাত্তা ছুঁড়ে সুদানের একমাত্র ওষুধ তৈরির কারখানা ধ্বংস।

৫০। আফগানিস্তান ১৯৯৮	সন্ত্রাসবাদীদের শান্তি দেবার জন্য কেপনাত্র নিক্ষেপ।
৫১। যুগোস্লাভিয়া ১৯৯৯	প্রজাতন্ত্রের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার অহিমায় ব্যাপক আক্রমণ। অসামরিক লোকের উপর বোমারো বোমাবর্ষণ ও কেপনাত্র নিক্ষেপ। অপেক্ষাকৃত কমশক্তিসম্পন্ন তেজস্ক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহার। সারা দেশ ধ্বংসরূপে পরিণত। যুদ্ধের শেষে দেশের রাষ্ট্রপতিকে গ্রেপ্তার করে যুদ্ধ অপরাধী বলে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য ছিল কলকানে আধিপত্য স্থাপনের জন্য শক্তিশালী যুগোস্লাভ যুদ্ধরাষ্ট্রকে ভেঙে দেওয়া। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। যুদ্ধের পর যুগোস্লাভ যুদ্ধরাষ্ট্রের অসরাজ্যগুলি পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হল। দুর্বল বলে এই রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমেরিকার উপর নির্ভরশীল।
৫২। আফগানিস্তান ২০০১	ওসামা বিন লাদেনকে ধরার অজুহাতে বিধ্বংসী বোমাবর্ষণ ও মার্কিন সরকার সৃষ্ট তালিবানদের ওপর আক্রমণ। বিন লাদেনকে ধরা যায়নি। তালিবানীরাও এখনও আফগানিস্তানে বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় যুদ্ধের পরে আফগানিস্তান বশবশত সরকার প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধের আসল লক্ষ্য মধ্য এশিয়ার বিপুল তেল ভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন।
৫৩। ইরাক ২০০৩	এই তালিকা তৈরি করার সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চলছি। ৯০ দশকের বিধ্বংসী যুদ্ধ এবং তার পরে এক দশককালে অবরোধের পরে এই যুদ্ধ আরব দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ও শক্তিশালী ইরাককে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আক্রমণের অজুহাত— ইরাকে গণহত্যায় সক্ষম এমন সব রাসায়নিক অস্ত্র মজুত আছে। জাতিসংঘের ত্রাশি দল বৎসরাধিকাল ধরে ত্রাশি করেও এরকম কোনও অস্ত্রের সন্ধান পায়নি। তবু আমেরিকার জাতিসংঘের প্রস্তাব উপেক্ষা করে একতরফা আক্রমণ চালায়েছে এবং ইরাকের দখল নিয়েছে। আসল উদ্দেশ্য — ইরাকের তেল ভাণ্ডারের (বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম) উপর দখল প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চিম এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন।

সূত্র. ইন্টারনেট এবং William Bloom—Rogue state : A guide to the world, only Super Power. □ সৌজন্য— প্রকৃত দলতত্ত্ব (কালান্তর)

ইন্দ্রানী

ইভা খাসনবীশ

দুধের ক্যানটা দোরগোড়ায় সশব্দে নামিয়ে গয়লা ভারী গলায় হাঁক পাড়ল— দুধ মাইজী! মাইজী! অর্থাৎ কৃষ্ণা মুসুন্দির রস বানানো হৃগিত রেখে দুধের ডেকটি হাতে বেরিয়ে এল। অনাদি বিছানায় পাশ ফিরে ওল। আরও আধঘণ্টা খানেক অনায়াসে ওয়ে থাকতে পারে সে। দুখটা স্বাঙ্গ দিতে বসিয়ে মুসুন্দির রস বানিয়ে কাঠের গেলাসে ঢাকা দিয়ে রাখবে কৃষ্ণা। তাজা দুধের ছানা কেটে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকবে। রেকার্ট, এ নতুন জুজুরফোটা ছোলা আর গোটামুগের উপর কয়েক কুচি নারকোল ছড়িয়ে দেবে। তারপর ট্রে-তে ফলের রস, ছানা, ছোলা আর মুগ সাজাতে সাজাতে রান্না ঘর থেকে ডাক দেবে, “এই ওঠো, আর কত ঘুমোবে? মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নাও।” অনাদি আলস্যের ভসিটে হাত-পা টান টান করে ওয়ে থাকে। তারপর আড়মোড়া ভেঙে ঘুম ঘুম চোখে উঠে বসে এক সময়, যদিও আসলে আলসেমী বা ঘুমের ছিটে ফোঁটাও অনুভব করছে না সে। তার সারা দেহ মন জুড়ে অদ্ভুত এক অস্থিরতা উদ্ভল হয়ে উঠেছে, যার বাস্পমাত্র কল্পনা করতে পারে না কৃষ্ণা। জলখাবারের ট্রে নামিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে স্বামীর প্রাণরান তদারক করতে ব্যস্ত সে। আজ তার উপোস। এমনভিত্তেও একত্রে ভোজন করে না দুজনে, অদ্ভুত সকালবেলা তো নয়ই।

কৃষ্ণার রাজ্যের কাজ বাকি পড়ে আছে এখন। ঠিকে ঠি আসবে। সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দিয়ে বাসন কৌশন মাজাবে, ঝকঝকে তকতকে করে ঘরদোর ধোয়াবে মোছাবে। ঝড়ন দিয়ে নিজে হাতে ঝেড়ে পুঁছে ঠিকঠাক করে শুছিয়ে রাখবে চেয়ার টেবিল বাতিদান, শো-কেসে সাজানো মিনিয়োরার ব্যাটলের সারি, নানা রকম কাঠের বিনুকের-কাঠের-পুতুল, শিং-এর, রোজ উডের, হাতীর দাঁতের জীবজন্তু পাখিপক্ষী, আয়নার কাজকরা মঙ্গলঘট, হোয়াইট মেটালের উট, কেয়লা থেকে আনা মেছো নৌকার মডেল। এছাড়া পিতলের ফুলদানী, ফুটবোল, মোমবাতিদান ও আরও টুকিটাকি জিনিস আছে— সেগুলোকে নিয়ে বসবে দুপুরে, ব্রাসো আর ন্যাকড়া দিয়ে ঘবে ঘবে চকচকে করে তুলবে তাদের। এর উপর রান্নাবান্না তো আছেই। দুপুরে ভাতের সঙ্গে অনাদি খাবে মাংসের মশলাছাড়া স্টু, পালশোক দিয়ে মুগের ডাল, পেঁপের ডালনা আর দই। বিকেলে এক গ্রাস বেলের পানা। রাত্রে সুজির রুটির সঙ্গে একটা যে কোন ডাল তরকারি আর একটু ফল আর ছানা। দুজনের সঙ্গেও কাজের অন্ত নেই কৃষ্ণার, ফুরসৎ নেই এক মুহূর্তও। এর মধ্যে পুজোপার্বন আছে, সংসার ও স্বামীর কল্যাণকল্পে বর্ষবিধ ব্রত পালন আছে। তার জন্য যা বাড়তি খাটাখাটনি সেগুলো রোজকার হিসেবের বাইরে।

জলখাবার খেয়ে জামাকাপড় পাল্টে অনাদি বাইরে বেরুল।

কৃষ্ণা দরজা দিয়ে গলা বার করে বলল, “রোদ্দুরে বেশি ঘুরো না যেন!”

অনাদি উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল হন হন করে। বড় রাস্তার মোড়ে পানের দোকানের সামনে এসে থামল। এ দোকানের বাঁধা খন্ডের অনাদি। ওকে দেখে দোকানি নিঃশব্দে দুটো ক্যাপস্টান আর গোটাকয়েক এলাচ এগিয়ে দিল। সিগারেটের নেশা অনাদির কলেক্স জীবন থেকে। এলাচের সূত্রপাত হয়েছে আটবছর আগে, সিগারেট খাওয়ার পক্ষে মারাত্মক রকম হানিকারক, কুছা এই তথ্যটি সংগ্রহ করে অনাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর। প্রথম দিকে অনাদির ভারী লজ্জা করত, সিগারেট আর এলাচের সমন্বয় দেখে দোকানি তার সম্বন্ধে কি ভাবছে তাই ভেবে। এখন আর এসব ছুটকো ভাবাবিধির তোয়াক্কা করে না সে। বিশেষত ইদানীং এক সর্বগ্রাসী ভাবনার হতাশনে দম্ব হচ্ছে তার সেই মন সমগ্র জীবন।

সিগারেট ধরিয়ে আবার ঠাঁটতে সুরু করল অনাদি। কিছু দূর গিয়ে একটা পাবলিক কল অফিসে ঢুকে পড়ল। সামনের বড় টেবিলে জনা পাঁচেক লোক বসে আছে। কল অফিসের পরিচালক এবং ফোনে কথা বলতে রত লোক দুটোকে বাদ দিলে অপেক্ষার্থীর সংখ্যা মোট দুজন। রবিবীর দিন সাধারণত ভিড় বেশি থাকে। আজ তা নেই দেখে নিশ্চিত বোধ করল। ঘরের একশাশে ছোট একটা কিউবিকল্— গোপনীয়তার প্রয়োজন থাকলে ওখান থেকে ফোন করা যায়। বাকি লোকদুটোর ফোন করা শেষ হলে অনাদি কিউবিকলে ঢুকে কাচের দরজাটা টেনে দিল। রিসিভার তুলে সন্তর্পণে একটা নাথার ডায়াল করল। এবং অপর প্রান্তে পরিচিত স্বর কানে আসতেই ব্যগ্রকণ্ঠে বলল “মালা, আমি অনাদি বলছি।”

“হ্যালো অনি।”

“শোন, তুমি কি এখন একা আছ?”

“আমি তো চিরদিনই একা।” মালার কণ্ঠে কৌতূহলের প্রমাস ছাপিয়ে সঙ্কল্প বেদনার আভাস ফুটে উঠল। নাকি সেটা শুধু অনাদির কল্পনা?

“মালা প্রীত, আমি তোমার কাছে আসতে চাই। এখনি।”

“অনি, তোমাকে আমার কিছু বলার ছিল।”

“ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি আসছি।”

“না অনি, তুমি এসো না। তুমি কাছে এলে কিছুতেই বলতে পারব না সে কথা, সব ওলট পালট হয়ে যাবে। শোনো, আমি অনেক ভেবে দেখলাম। এ হয় না।”

“কি হয় না মালা?”

“তুমি যা চাও। আমাদের বিয়ে, সন্সার, একত্রবাস।”

“একি বলছ মালা?”

“হ্যাঁ অনি। আমাকে বাধা দিও না। সব কথা বলতে দাও। তুমি আর আমি, আমরা দুজনে দুটো পৃথক জীবনধারায় গড়ে উঠেছি। একটা নুড়ি যেমন নদীর স্রোতের সঙ্গে চলতে চলতে একটা বিশেষ আকার লাভ করে, মানুষের বেলাতেও তেমনি বিভিন্ন উপাদান থেকে প্রাণরস সঞ্চয় করে একটা নিজস্ব সম্ভার সৃষ্টি হয় যার অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাশা আছে। সব কিছু থেকে হিনিয়ে নিয়ে তাকে নতুন রূপ দেওয়া তেমনি অসম্ভব, যেমন অসম্ভব গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে এনে ফুলদানীতে সাজিয়ে তাকে নতুন জীবন দান করা।”

“মালা, আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। আমার তোমার কাছে একটাবার আসতে দাও!”

“অবুঝ হয়ো না অনি। ভালবাসার নামে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নতুন জীবন যাত্রা শুরু করতে চাইলেও আমরা শেষ পর্যন্ত সফল হব কি? আত্মত্যাগের পাবাগভারের নীচে সুখ, শান্তি ভালোবাসা সবকিছু পিবে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তুমি ভাবছ যেহেতু আমার অবস্থার জন্য তুমি দায়ী, তোমাকে সে দায় বহন করতেই হবে। আমার কিন্তু তোমার কাছে কোনও দাবি, কোনও প্রত্যাশা নেই। আমাদের দুজনের কাছে আসার ফলে যা ঘটবে, তাকে দুর্ঘটনা, অদূরদর্শিতা, ভুল, যা খুশি নাম দিতে পার। কিন্তু আরেকটা ভুল আগের ভুলটাকে খতন করতে পারবে না। অনি, আমার দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। হঠকারিতার বেলা পার হয়ে গেছে।”

“কী করতে চাও তুমি?”

“আমি যা হতে চাই না অনি। এখনও বেশি দেরি হয়ে যায়নি। খুব সহজেই অব্যাহতি পেতে পারি এখনও।”

“মালা, এ তুমি কি বোলে? আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমার বিবেক বা কর্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় নয়, এমন কি তোমাকে ভালোবাসি বলেও নয়। আমি ঝাঁচতে চাই মালা। আমি পিতা হয়ে ঝাঁচতে চাই। এতদিনের বঞ্চিত জীবনে আজ পিতৃত্বের চির আবাসিকত বরণ নাগালের মধ্যে পেয়ে কিছুতেই তা হারিয়ে যেতে দিতে পারব না আমি। আমাকে দয়া কর মালা। হাত পিটি অনি।”

“কিন্তু...।”

“কোনও কিন্তু নয় মালা। সব বিধা ভয় ত্যাগ কর। আমাদের অনাগত সন্তানের চিন্তা সব কিছু ছাপিয়ে উঠুক, ভরে দিক আমাদের সমস্ত জীবন।”

“কিন্তু অনি....।”

“আঃ, বলছি তো কোনও কিন্তু নেই আর। সব কিছু আমার উপর ছেড়ে দাও। আজ দুপুরে আসব, কেনন? কয়েকটা দরকারী কাজ সেরে। কথা দাও কোনও পাগলামি করবে না।”

“পাগলামি মানে?”

“ওই যে বললে খুব সহজেই অব্যাহতি পেতে পার, এখনও বেশি দেরি হয়ে যায়নি...। ওসব কথা আর মনেও স্থান দিও না, বুললে?”

“বেশ, তাই হবে।”

এরপর আর একটা নাখার ডায়াল করল অনাদি। “হ্যালো, বিজন? শোন, একটা ভীষণ জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে। ফোনে হবে না। তুমি চটপট স্যাংগ্রীলার চলে এস, আমি সেখানে অপেক্ষা করবো।”

“কি ব্যাপার জামাইবাবু?”

“টেলিফোনে বলা যাবে না। দেরি করো না।”

“আমি এক্ষুনি আসছি।”

স্যাংগ্রীলার সবুজ পর্দা ঘেরা খোপের মধ্যে অনাদি আর বিজন। সামনে টেবিলের উপর চা এবং অনুপান অনাবাদিত পড়ে আছে। মুখোমুখি অর্থাৎ সামনে সামনি বসলেও এই মুহূর্তে তাদের দৃষ্টি পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ নয়। বিজন মাথা হেঁট করে এক হাতে রগদুটো চেপে ধরে আছে। অনাদির দৃষ্টিতে এক অস্বাভাবিক আলোয় চকচক করছে, শেষ রাতে

সর্ব্ব পণ করে দান চালা ছাড়াই মতো। অথচ যে রকম অগ্নি প্রতিক্রিয়া আশঙ্কা করেছিল অনাদি, বিজ্ঞানের ব্যবহারে তার লেশমাত্র প্রকাশ পায়নি। অনাদি অকপটে তার হাতের ভাসন্তলো মেলে ধরেছিল প্রথমেই। বলেছে তার বৃত্তু হৃদয়জোড়া তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা, যে আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণ মেটাতে পারেনি কিন্তু ঘটনাচক্রে আর কেউ মেটাতে পারছে। এজন্য কৃষ্ণকে দোষী করেনা অনাদি, তার অস্বস্তি তো অনাদি মেনেই নিয়েছিল এতদিন। কিন্তু তার পিড়রের লাগসা যে কত দুর্ব্বার, কত গভীর তা অনুভব করেছে সেটা মেটার সম্ভাবনা দেখা দেবার পর। আজ সকল বাধা-বিঘ্ন, তিরস্কার-ভয় তাই তৃণাতিতৃণ তুচ্ছ অন্যদিক কাছে। সে কোনও কিছুই পরোয়া করে না আর। এই নতুন পরিস্থিতিতে অন্যদিক জীবনে কৃষ্ণের অবস্থানের কোনও উপায় নেই। বিজ্ঞান যেন তার দিকিকে বুঝিয়ে বলে। অনাদি কৃষ্ণের নামে একটা সংকীর্ণ চিঠিও দিল বিজ্ঞানকে। যদি ভাইয়ের মুখের কথা কৃষ্ণের অবিচ্ছিন্ন মনে হয়, স্বামীর নিজে হাতে লেখা চিঠিখানা ঘটনাপ্রবাহের নির্মম সত্যতা সম্বন্ধে তার সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত ভাবে নিরসন করে দেবে। অবশ্য কৃষ্ণ চলে গেলেও, অনাদি তার সব দায় ঝেড়ে ফেলে না। আজীবন খোরপোষের খরচ খরচা দিয়ে যাবে। বরাবর।

কথাবার্তা যা কিছু অনাদি একতরফাই বলে গেল। বিজ্ঞান স্তম্ভিত হতবাক মুখে শুনে গেল সব এবং পরিশেষে এক হাতে কপালের রগদুটো চেপে মাথা নত করল। বিজ্ঞানকে সেই অবস্থায় রেখে একসময় উঠে দাঁড়াল অনাদি। বাইরে গিয়ে অস্পষ্ট পান-ভোজনের বিস চুকিয়ে রান্ডায় নামতে গিয়ে কী ভেবে ফিরে এল আবার।

পকেট থেকে কলম বার করে বিলের পিছনে একটা টেলিফোন নাম্বার লিখে বিজ্ঞানের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, “আমায় এই নাম্বারে পাবে। দরকার হলে ফোন কর।

বিজ্ঞান মাথা তুলে সুপ্তোষিতের মতো ঘোর-লাগা চোখে তাকাল। কিছু বলল না। অনাদি চলে গেল।

মালায় ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেখে টাইপরাইটারের সামনে বসে খুঁ খুঁ আওয়াজে দ্রুত টাইপ করে চলেছে মালা। একপাশে বিক্ষিপ্ত পাতুলিপি, অন্যপাশে সদ্য টাইপ করা কাগজের গোছ।

অনাদিকে দেখে মৃদু হেসে বলল, “তোমায় ছালায় লেখাটোখা সব লিখে উঠেছে। গোটাচারেক কাগজে লেখা পাঠানো বাকি। তাগাদা এসে গেছে অলরেডি।”

ছোট্ট এক কুঠিরির ফ্ল্যাট। একাধারে বেডরুম, ড্রইংরুম, স্টাডি। ঘরের পাশে বাথরুম। দোভালায় মোট ছানা ফ্ল্যাট এরকম। একক বাসিন্দার ফ্ল্যাট। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই, বড়জোর একটা হিটার রাখে কেউ কেউ। এ ঘরখানায় ভাও নেই। অবশ্য খুব একটা অয়োজনও নেই তার। নীচের তলায় সংকার ভোজনালয়। সদাসর্ব্বদাই দরকার মতো খাবার দাবার পাওয়া যায়। ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের অধিকাংশই বাঁধা খন্ডের ওখানকার। ভোজনালয়ে ছোকরা চাকর সিঁড়ি ভেঙে ট্রে-তে করে চা, জলখাবার, দুপুর ও রাতের খাবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায় নির্দিষ্ট সময়ে। এবং নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও। তবে তার জন্য ব্যরান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে হাঁক পাড়তে হয়। এছাড়া খুচরো কাজও করে সের দরকার মতো, সামান্য কিছু বকশিসের বিনিময়ে।

মালা ফ্রি-ল্যান্স জার্নালিস্ট। অনেকগুলো পত্রিকায় নিয়মিত লেখার জোগান দেয় বাঁধা

পত্রকার হিসেবে। ওর কর্মশালা বা অফিসঘর বলতে এই ঘরখানাই। অবশ্য লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে মাঝে মাঝে বেগোতে হয়। লাইব্রেরিতে গিয়ে বইপত্রের খাটে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ সুবিধা জোগাড় করে, বিশেষ বিশেষ ঘটনাস্থলে হাজিরা দেয়। কিন্তু লেখার কাজ যা কিছু ঘরে বসেই করে। লিখতে বসে আর হাঁপ থাকে না। রাত কাবার হয়ে যায়। ফ্রান্সভর্তি কফি বানানো থাকে। সন্ধ্যারাত্রে ভোজনালয় থেকে গরম ভ্রল অনিয়মে বানিয়ে রাখে সেটা। সে কফিতে না থাকে চিনি, না থাকে দুধ। কাপের পর কাপ সেই উষ্ণ-তিক্ত-কৃষ্ণ পানীয় গলাধঃকরণ করে আর অবিশ্রান্ত লিখে চলে ব্যাপার মতো। তারপর দিনের আলো ফুটলে টাইপরাইটারে তুফানমেল চলিয়ে দেয়। নিখুঁত টাইপ করে খামে ভরে দিয়ে আসে কাছে পিঠের পত্র-পত্রিকার দপ্তরে। দূরের বা শহরান্তরের পত্রিকার লেখাগুলো ডাকঘরে গিয়ে পোস্ট করে আসে। এরপর কয়েকদিন অশব্দ বিশ্রাম ও সুগভীর নিদ্রায় শ্রান্তি ও অবসাদ অপনোদনের পর মস্তিষ্কের কোষগুলো আবার সবল, সতেজ, কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে।

মালা একমনে টাইপ করে চলেছে। দুপুরে ভোজনালয় থেকে দুটো লাঞ্চ আনিয়েছিল। খাওয়া দাওয়ার পর অনাদি পাশের খাটে টুপচাপ ওয়ে পড়েছে দেয়ালের দিকে মুখ করে। ওর মস্তিষ্ক জুড়েও অসংখ্য চিন্তার পোকা কিলবিল করছে। টাইপরাইটারটা একটানা আওয়াজ করে যাচ্ছে নেপথ্য সঙ্গীতের মতো। ক্রমশ পোকাগুলো ঝিমিয়ে আসে, আওয়াজটাও যেন ক্লীণ হয়ে আসে ক্রমে। নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিল অনাদি? আশ্চর্য, এমন পরিস্থিতিতেও ঘুমোতে পারে মানুষ! মালা অনাদির পিঠে আলতো করে হাত রাখল, “অনি তোমার ফোন এসেছে, ওঠ।”

তড়াক করে উঠে দাঁড়ল অনাদি, “ফোন? কোথায়?”

“হ্যাঁ, নীচে যাও। ওই ছেলেটা নিয়ে যাবে তোমায়।”

দরজার বাইরে দাঁড়ানো ছেলেটা অনাদিকে সঙ্গে করে ভোজনালয়ে ঢুকল। কাউন্টারে কালো মোটা মতন একটা লোক ব্যস্ত ভাবে বরফি-লাডু-ডালমুট ওজন করে লাইন দেওয়া বন্দরদের প্যাকেট ধরিয়ে দিচ্ছে আর টাকা নিচ্ছে হাতে হাতে। তারই ফাঁকে ফাঁকে রক্তচাপে ঝাড়ন দিয়ে কপাল আর ঘাড়ের ঘাম মুছেছে, আবার মিষ্টি বোকাই কাঁচের বাসের আশে পাশে যে লোভাতুর বোলতাগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাড়নের কাপটা দিয়ে তাদেরও তাড়াচ্ছে মাঝে মাঝে। কাউন্টারের একপাশে টেলিফোন রাখা।

অনাদি দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে কান করা রিসিভারটা তুলে কানে লাগাল, “হ্যালো, অনাদি মুখুটি বলছি।”

“হ্যালো, আমি বিজ্ঞান।”

মূহূর্তে সজ্ঞা হয়ে উঠল অনাদির সদ্য ঘুমভাঙা সর্ব দেহ মন, “কি ব্যাপার?”

“বাড়ির চাবিটা আপনার অফিসের দারোয়ান তেওয়ারীর হাতে দিয়ে এসেছি।”

“বাড়ির চাবি? তার মানে?”

অপর প্রান্ত থেকে যান্ত্রিক কঠবর ভেসে এল, “আপনার বাড়ির চাবি। খালি বাড়ি খোলা রেখে গেলে চোর-চোর ঢুকতে পারে, তাই দরজায় তালা দিয়ে চাবি তেওয়ারীর কাছে রেখে এসেছি। ওখান থেকে নিয়ে নেবেন।”

অনাদির মাথার মধ্যে সব কিছু ভালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যেন। তার বাড়ির চাবি... খালি বাড়ি...। অর্থাৎ বাড়ি খালি হয়ে গেছে এর মধ্যে। কৃষ্ণ এক কথায় চলে গেছে কেনও ওজর আপত্তি না তুলে...। সুখের মধ্যে অদ্ভুত একটা গুরুত্ব অনুভব করল অনাদি। কিছু একটা বলা উচিত বিজ্ঞকে, অদ্ভুত ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু অনাদির অবাধ্য জিভটা টাকরায় আটকে পড়ে রইল। কিছুতেই নাড়ানো গেল না তাকে। বিজ্ঞ লাইন ছেড়ে দিল।

যন্ত্রচালিতের মতো সিঁড়ি ডেঙে উপরে উঠল অনাদি। না, সে আর কোনওমিকে চাইবে না। যা কিছু ভাবনা চিন্তা, তার জন্য রাতভর সময় ছিল। শেবরাতে পাশার দান ফেলা হয়ে যাওয়ার পর এখন আর ভাবাবি নিরর্থক।

মালা কাগজপত্র সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, “দাঁড়াও, চা আনতে বলি। গরম সিন্ধাড়া ভাজে এময়। চায়ের সঙ্গে বেশ জমবে।”

অনাদি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, “এখন আর ওসব কিছু না। চটপট জিনিসপত্র প্যাক করে ফেল, এখনি যেতে হবে তোমায়।”

বিস্মিত কণ্ঠে মালা বলে, “সেকি? কোথায় যাব?”

“কোথায় আবার। বাড়ি। আমার বাড়ি, যা আজ থেকে তোমারও।”

“কিন্তু...।”

“ইস, আবার কিন্তু কিন্তু শুরু করলে! এটা তোমার মৃত্যুদোষেই দাঁড়িয়ে গেল দেখছি। বলেছি তো এখন থেকে তোমায় সব দায় আমার।” তারপর একটু থেমে, “তোমার, আর যে আসছে তার সব দায় দায়িত্ব, ভাবনা চিন্তা আমার উপর ছেড়ে দাও।”

মালা দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল, “বেশ, তুমি যা ভালো বোঝ।”

একটা সুটকেসে জামাকাপড় আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে নিল। বই কাগজপত্র বোঝাই হল আরেকটা সুটকেস।

টাইপরাইটারটা ফেসে ভরে মালা বলল, “আমি রেডি।”

“বাকি জিনিসপত্র?”

“ওগুলো এখানেই থাক আপাতত। পরে দেখা যাবে। এখনি তো আর এখানকার বাস ভুলে দিচ্ছি না।”

একখায় অনাদির মনে কবিকের জন্য অসন্তোষের হোঁয়া লাগে।

পরমুহূর্তে সেটা ঝেড়ে ফেলে বলে, “দাঁড়াও, একটা ট্যান্ডি ডেকে আনি।”

“ডেকে আনতে হবে না। ওই তো মোড়ের মাথার ট্যান্ডি স্ট্যান্ড। ওখানে গিয়েই নেওয়া যাবে।”

দরজায় তালা দিয়ে মালা অনাদির হাতে টাইপরাইটারটা ধরিয়ে দিল। তারপর অনাদি কিছু বলার আগেই দু’হাতে দু’টো সুটকেস ঝুলিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। অনাদি নিঃশব্দে ওর পিছু নিল।

মালাকে অনাদি যেদিন বাড়িতে আনল, সেদিন রবিবার। পরদিন থেকে আবার দশটা পাঁচটা অফিস সূত্র হল তার। অনাদি এ বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে। ইদানীং স্যারসিনই বাইরে কাটাত সে। আর কৃষ্ণ সংসার নিয়ে ব্যস্ত রাখত নিজেকে। পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে মুখচেনা পরিচয় শুধু। ভাছাড়া পাঁচমিশেলী পাড়া, সবাই যে যার একুশ শতাব্দী ৩২

ধাক্কা খুরছে। প্রতিবেশীদের প্রতি কৌতূহল বা সৌহার্যের অবকাশ কম। এসব কারণে অনাদি এক দিক দিয়ে নিশ্চিত ছিল। মালার আগমন নিয়ে পাড়ায় কোনরকম হৈ চৈ এর আশঙ্কা নেই অসন্ত। তা নাহলে এখনি আবার হনো হয়ে গৃহ-মুগয়ায় বেরোতে হত তাকে। তবে ঠিক ষিটা দুদিন পরেই চলে গেল। গাঁয়ে তার শাতড়ির বড় ব্যারাম, বাঁচবে ঈনা ঠিক নেই এবং বাঁচুক না বাঁচুক সে নিজে গাঁ থেকে ফিরছে না আপাতত। কারণ বড়ির সম্পত্তির ভাগীদার অনেক। গোটা আষ্টেক ভাতুর দেওর আছে। ওর স্বামী হাবা গোবা ভালোমানুষ। এখন থেকে ওখানে গিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে না থাকলে পরে আর কিছুই ভুটবে না কপালে। এই সব বলে পাওনা গভা বুকে নিয়ে ঝি কেটে পড়ল। অনাদির দশটা পাঁচটা অফিস। মালার সুটকেসে বোঝাই কাগজপত্র। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি।

ওফিসার। মর্নিং স্টারে প্রতি সোমবার মালার নিজস্ব কল্যাম বেরোয়। হপ্তখানেক আগেই লেখা জমা দেয় প্রতিবার। এবার আর হয়ে ওঠেনি সেটা। বাড়ির কাজগুলো চটপট সেয়ে ফেলে লেখা নিয়ে বসার দুট সন্ধ্যা নিয়ে মালা অনাদি অফিসে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিপাটে লেগে গেল। বসার ঘরটার এ কদিন হাত পড়েনি মোটে। নজর চালিয়ে দেখল চতুর্দিকে। জিনিসে জিনিসে ভিলার্ধ ঠাই নেই ঘরে এবং সব কিছুর উপর পুরু ধুলোর আস্তরণ। নানা সাইজের মূর্তি, পাখিপাখালি, খেলনাবাটি সাজানো ধরে ধরে। দেয়াল ঘিরে টেবিল-টিপর-শোকেস জুড়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তারা যেন ধুলোর আড়াল থেকে মিটি মিটি হাসছে মালার দিকে চেয়ে। উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে ষ্টিটা ফেলে ঝাড়নের খোঁজে যায় মালা এবং একটু পরেই ঝাড়ন হাতে ফিরে আসে। বসার ঘর, শোবার ঘর, পাশের ছোট বাড়তি ঘর, সব শেষ করতে করতে বেলা দুটো বেজে গেল। ভারী ক্লান্ত বোধ করে মালা। তবে ক্লান্তিটা শুধু শারীরিক নয়, মানসিকও। এবং কোনটা যে বেশি তা বলা কঠিন। টাইপরাইটার হাতে নিয়ে পছন্দসই একটা জায়গার খোঁজে এঘর ওঘর ঘোরে। পড়ার টেবিল নেই একটাও। বুঁজে পেতে বসার ঘরে কাগজপত্রের বিছিয়ে টাইপরাইটার খুলে বসে। কিন্তু লেখা শুরু করার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। এখন আবার রান্না বান্না করতে গেলে আজকের দিনটাও বরবাদ হবে গত চারদিনের মতো। কালকের পাউরুটির অবশিষ্ট কটা পীস আর শেষ দুটো ডিম দিয়ে প্রাতরাশ সেবেছে ওরা, কাজেই ও দুটো জিনিস যে বাড়িতে নেই তা ভালোমতোই জানে মালা। বাজার করতে গেলেও সময় নষ্ট হবে খামোকা। মালা অনিশ্চিত মনে রান্নাঘরের লাগোয়া অপরিষার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল। শেলফের উপর আকারানুসারে লাইন দিয়ে সাজানো ডিবে বোতল হাতড়ে এখনি ক্ষুদ্রিক্তির মতো শুধু দুটো জিনিসই পেল সে, আধ প্যাকেট অ্যারাক্ট বিস্কুট আর এক ডিবে চিড়ে। মালার তখন বাছ-বিচারের সময় নেই। যাহোক মুখে দিয়ে অসমাপ্ত লেখাটা শেষ করতেই হবে যথা নীত সম্ভব এবং সম্ভব হলে অনাদি আসার আগেই।

একটা স্ট্রেট খানিকটা চিড়ে ঢেলে তার উপর বিস্কুট কটা চাপিয়ে ডিবে বন্ধ করে যথা স্থানে রেখে দিল। শেলফে রাখা ডিবে ওলোর দিকে আবার তাকিয়ে দেখল। এই অল্প কদিনের অবহেলায় সবকিছুর উপর ধূলা জমে গেছে। শিশি-বোতল-ডিবে, আভন-মিস্রি-ইলেকট্রিক কেটলি, এমন কি নীচের তাকে উপড় করে রাখা বাড়তি বাসনকোশন গুলোও ধুলোর ধূসর হয়ে আছে। মালার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে এল। চিড়ের স্ট্রেট নিঃশব্দে সরিয়ে রেখে ঝাড়ন হাতে আবার ঝাড়পোছে রত হল সে।

বিবেকেল অনাদি এসে দেখে মালা শুকনো মুখে বসে রয়েছে চুপচাপ। “কি ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি?”

“তেমন কিছু নয়।”

“তবু সাবধানে থাকা উচিত এ সময়। রাত জেগে লেখাটোখাওলো বন্ধ কর।”

“বন্ধই তো হয়ে গেছে। কোথায় আর লিখি এখন।”

অনাদি প্রশান্ত কণ্ঠে কথাগুলো আসে।

হাতের থলির দিকে ইঙ্গিত করে বলে, “অফিস ফেরত বাজার গেছিলাম। চমৎকার পাবনা মাছ, সবসময় ওঠেনা এদিকে। পটলও এনেছি। আদা আর জিরে বাটা দিয়ে ঝোল খাওয়া যাবে আজ। কদিন ধরে খিচুড়ি আর পাউরুটি খেয়ে খেয়ে তোমারও নিশ্চয় পেটে চরা পড়ে গেছে।”

মালা হ্যান হাসে।

অনাদি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট খুলে অস্ফুট আর্থনাদ করে উঠল, “ইস, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। সিগারেট কেনার কথা মনেই পড়েনি। চটপট চা দিয়ে দাও তো লক্ষ্মীটি। চা খেয়ে সিগারেটটা নিয়ে আসি।”

মালা নিশ্চেষ্টে রান্না ঘরে চলে গেল। অনাদি হ্রস্ব মনে শেষ সিগারেটটায় অগ্নি সংযোগ করে খবরের কাগজ তুলে নিল।

আদা আর জিরে বাটা দিয়ে রাঁধা মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে ওরা যখন উঠল নটা বেজে গেছে। রান্নাঘর পরিষ্কার করে কিছু কিছু বাসনপত্র ধুয়ে মেজে রাখতে আরও ঘণ্টাখানেক লাগল মালার। সেটা অবশ্য এখনি না করলেও চলত তার। অনাদি যদিও জানিয়েছে যে সকালে পাউরুটি তার খাতে সহ্য হচ্ছে না, পেট ভূঁট ভাট করছে প্রায়ই, তবু শেষ পর্যন্ত একটা পাউরুটি আর চারটে ডিম সে এনে দিয়েছে বিনা প্রতিবাদে। সিগারেট কিনতে যাবার সময়ই এনেছে ওগুলো। অতএব কাল সকালে উঠেই রান্নায় না লাগলেও চলেবে মালার। কালকের দিনটা অন্তত অনাদি পাউরুটি-ডিমে আপত্তি করবে না এটুকু আশা করতে পারে মালা। বিশেষ করে মালা যদি তাকে মুখ ফুটে বলে যে তার শরীর ভাল নেই। কিন্তু মালা মুখ ফুটে কিছুই বলে না তাকে। শুধু রান্নাঘরের কাজ সেয়ে টাইপরাইটারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবে। নিচু হয়ে সবসময় আঁচল দিয়ে কুলো মুছে কেন্দ্রে ভরে রাখে টাইপরাইটারটা। তারপর শোবারঘরে এসে নিশ্চেষ্ট শুয়ে পড়ে। অন্ধকারে বিছানার ওপাশ থেকে সাড়া পায় অনাদি। সঙ্গে ঘন হয়ে আসে। সর্বসেই দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওকে। অনাদির উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ মালার দেহে কিংবা মনে কোনও সাড়া জাগে না।...

পরদিন অফিস থেকে ফিরে অনাদি দেখল বাড়ির দরজায় তালা কুলছে। মালা বাজার টাক্সার কোথাও গেছে ভেবে রাস্তার সামনে পায়চারী করতে থাকে সে। সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্রমে রাত্রি নামল। শেষে ট্যাক্সি নিয়ে সংস্কার ভোজনালয়ে এসে হাজির হল অনাদি। সিঁড়ি ভেঙে মালার ফ্ল্যাটের সামনে এসে দেখে সেখানেও তালা।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় ভোজনালয়ের ছোকরা চাকর এগিয়ে এসে, “মেমসাব আপকস চাবি দেকে গিয়া।” পকেট থেকে একটা চাবি বার করে ওর হাতে দিল ছেলোট।

“এই ঘরের চাবি?” প্রশ্ন করে পর মুহূর্তে নিজেই তার উত্তর পেয়ে গেল অনাদি, চাবিটার দিকে ভাল করে দেখে।

অতি পরিচিত পুরোনো চাবিটা তারই। তার বাড়ির সদর দরজার চাবি। কদিন আগে কৃষ্ণার গৃহত্যাগের দিন বিজন এই চাবিটাই অফিসের দারোয়ানের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছিল। আজ মালাও... চমকে উঠল অনাদি। না-না, একি ভাবছে সে। ছোঁকরাটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল।

অনাদি ডাকল তাকে, “মেমসাব কীহা হ্যায়?”

“জী, মুখে মাসুম নেহী।”

“চাবি কব্ দিয়া?”

“সুবহ্ দশ বজে করিব্।”

বারোয়ারি জায়গা। কেউ কারোও খবর রাখেনা। আজ সকাল দশটা-নাগাদ মালা এখানে এসে চাবিটা দিয়ে গেছে, এর বেশি আর কোনও তথ্য উদ্ধার করা গেল না। অনর্থক আর জেরা করতে ইচ্ছে হল না অনাদির। চাবি নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

দশটা পাঁচটা অফিস। সেই চিরকালীন নিয়মে। ফাইলের স্থপ থেকে এক এক খানা করে ফাইল তুলে নিয়ে দেখে শুনে নির্দেশমত যথাস্থানে স্থানান্তর। অনাদির মনে হয় মানুষের জীবনটাও যেন একটা অফিস। নিকটস্থ বর্তমান কিছুকণের জন্য সবটুকু মনযোগ দাবি করে আবার মিলিয়ে যায় গুপীকৃত ঘটনার ভিড়ে। একটা মানুষের মনের কতগুলো রূপ থেকে কে জানে। বহরপীর মত পোষাক পালটে নিজেকেই চমক লাগিয়ে দেয়। নইলে অনাদি কি কোনদিন কল্পনা করেছিল, জীবনের এই চরম সঙ্কিশ্লেপে এসেও এমন নির্বিচার হয়ে নির্বিবাসে ক্রটিনমায়িক দিনের পর দিন কাটিয়ে যাবে সে! এ যেন ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির মুখের গোড়ায় বসে ধীরে সুস্থে খবরের কাগজের পাতা ওপ্টাচ্ছে কেউ।...

অনাদি এর মধ্যে মালার আর কোনও খোঁজ পায়নি। বিজন একবার এসেছিল। কৃষ্ণার শরীর ও মন একেবারে ভেসে পড়েছে, এই কথাটাই বলে গেছে।— জামাইবাবু, এভাবে চললে সিঁড়ি আর বেশিদিন বাঁচবে না। নির্ঘাৎ আকস্মাতী হবে। এত বছর পরে আপনার কেন এই দুর্ঘটি হল জামাইবাবু? দিদির মুখের দিকে যে আর তাকানো যায় না...। রুমাল দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে চলে গেছে বিজন। অনাদি নিশ্চুপ, পাষাণের মত বসে রইল। কৃষ্ণার কাছ থেকে ফেরৎ আসা মাসোহারার নোটের তাড়া কাঁচের পেপার ওয়েটের নীচে নড়াচড়া করতে থাকল ফ্যানের হাওয়ায়।

মালার চিঠিটা যেদিন এল, সেদিনও কোনরকম চাকাল্য প্রকাশ করল না অনাদি। ধীরে সুস্থে খাম খুলে চিঠিখানা সামনে মেলে ধরল।

অনি,

এ চিঠি না লিখলেও চলত। কারণ, কি লিখতে যাচ্ছি তা নিশ্চয়ই তুমি এতদিনে আশ্রয় করেছ। তোমাকে ভালবাসি কীনা সে প্রশ্ন এখন অবাস্তব। পথ চলতে চলতে একটা সুন্দর ফুল দেখে ধমকে খেমে মুগ্ধ হয়ে সবত্রে তুলে নিল কেউ। দিনের শেষে বাড়ি ফিরে হ্রান করে আসা ফুলটা দেখে হতাশ হলে কাকে দোষ দেবে বল? সে কথা এখন থাক।

আমাদের পরিপার্শ্বে নতুন কোনও অন্যান্য বা বিকৃতি আমাদের চেতনাকে আঘাত করে।

অথচ আরও শতসহস্রও বড় অন্যায় ও বিকৃতি আমরা অনায়াসে স্বাভাবিক বলে মেনে নিই যেহেতু সেগুলো আবহমান কাল থেকে চলে আসছে এবং আমরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

একটি পূর্ণাঙ্গ নারীর অবয়বে একজোড়া খর্বীকৃত পাকে সৌন্দর্যের পরাকর্ষ্য মানার যুগ হয়তো শেব হয়েছে। কিন্তু সেই Lilliputian পা তো শুধু প্রতীক বা চিহ্নগত ব্যাপার। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আর কোনও পরিবর্তন এসেছে কি? নারীদের অনুমোদিত ভাবমূর্তির সঙ্গে মিল খুঁজতে আজও মেয়েদের নিজের ব্যক্তিত্ব ও সম্ভাবনার অনেকখানি সার উপাদানকে পিবে ঠুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হয়।

এইচ. জি. ওয়েল্‌সের সেই গল্পটা পড়েছি নিশ্চয়ই— অন্ধদের দেশ। সেখানে সবাই অন্ধ। অন্ধত্বকেই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে তারা। চোখওলা মানুষটাই কিল্কুত ব্যতিক্রম, সৃষ্টিছাড়া জীব তাদের কাছে। ওরা তাকে গ্রহণ করতে রাজি ছিল শুধু একটি শর্তে: তার চোখদুটো পড়ে ফেলে তাকেও তাদের মত দৃষ্টিহীন হতে হবে।

গল্পের চোখওলা মানুষটা কিছুতেই তা পারল না। আমিও পারলাম না আমার সম্ভার অঙ্গচ্ছেদ শরিক হতে। স্নান-কমতটাই মানুষের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু নয় অনি, স্ত্রী বা পুরুষ কারও ক্ষেত্রেই নয়।

আমাকে তুলে যেও। শুভেচ্ছা রইল।

মালা

উপসংহার

তেওয়ারীর কাছে বাড়ির চাবি রেখে অনাদি সারাটা দিন বাইরে কাটানোর সম্ভব করে সকলেই বেিরিয়ে গেছে। বিজ্ঞান আদার অফিসের অদূরে ট্যান্সি থামিয়ে চাবি সংগ্রহ করল। ট্যান্সির পিছনের সিটে উপবিষ্ট কৃষ্ণা মাথার উপর আঁচল তুলে দিল। বিজ্ঞান ফিরে এলে ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিল তার নির্দেশ মতো। পুরোনো অতি পরিচিত বাড়িখানার সামনে এসে গাড়ি থামল। কৃষ্ণা চুপ করে জড়ভরতের মতো বসে রইল।

বিজ্ঞান ডাকল, “এসো দিদি।”

হাত ধরে ওকে গাড়ি থেকে নামাল। ইস্তিতে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে কৃষ্ণার হাত ধরে এগিয়ে গেল। দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকল দু’জনে। কৃষ্ণার দু’চোখে জল ভরে এস।

বিজ্ঞান অধৈর্য কণ্ঠে বলল, “হি দিদি, কেঁদো না। মনে রেখো তোমার উপর সব কিছু নির্ভর করছে এখন। জামাইবাবু এমনিতেই মরমে মরে রয়েছে। সে সব কাটিয়ে উঠে তোমায় আসার জন্যে চিঠিটা লিখেছেন সেই ডের। ওই ঘটনার আর উচ্চবাচ্য করবে না কখনও। আভাসে ইস্তিতে ঘৃণাকরেও জানতে দিওনা যে তোমার মনে কেনও কোভ আছে। যেন কিছুই ঘটেনি এমনি ভাব করবে, বুঝলে?”

কৃষ্ণা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

বিজ্ঞান বলল, “আমি চলি। ওই ট্যান্সিতেই চলে যাবেন। আমি যা বলে গেলাম সর্বদা মনে রাখবে। অভিমানের সময় এ নয়। তোমাদের সমস্ত জীবন নির্ভর করছে তুমি কী ভাবে ব্যাপারটা নিতে পারবে তার উপর। মনে জোর কর। □

তখন পড়ন্ত বিকেল। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। পাতার ডগা থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে।

বসবার ঘরে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। এমন সময় ছাত্র অরূপ এসে হাজির। দু-একটা কথা বিনিময়ের পরে বলল— 'স্যার, এবার দুর্গা পূজার সুভেনিয়ারে একটা গল্প দিতে হবে। আমি রাজি না হয়ে পরলাম না। অরূপ প্রণাম করে চলে গেল।

ভাবছিলাম এবার চিত্রাচরিত বস্ত্রপট প্রেমের গল্প না লিখে জীবন থেকে নেওয়া একটা ঘটনা লিখব যা গল্প হলেও সত্য।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখি প্যাকেট খালি। অগত্যা রাজ্যায় বেরোতে হল। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে রাজ্যা চলে গেছে। সেখান থেকে ডিকসন লেন বরাবর ব্রাচী সিনেমার কাছে যাওয়া যায়। পার্কের পথের দুধারে সারি সারি বেঞ্চি পাভা।

এই সকল বেঞ্চিতে বিকেল হতে না হতেই সব বুড়োরা এসে বসে পড়ে। বেশির ভাগই অবসর প্রাপ্ত। কারো হাতে ছড়ি, কেউ বা ছড়িহীন। কলতে গেলে বেশ উঁচু স্বরেই গল্প করে। কখনও রাজনীতির গল্প, কখনও সেন্সরের গল্প। চলার পথে এইসব কথা কানে আসে। তারা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা ইয়াকিও করে। মাঝে মাঝে কোনও প্রশ্ন নিয়ে ঝগড়াও বেঁধে যায়।

কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে এই দৃশ্য দেখতে আমি অভ্যাস। মাঝে মাঝে ভাবি, কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর নিলে আমাকেও এখানে সময় কাটাবার জন্য আসতে হবে। সবাই আমার পরিচিত মুখ। কেউ আমার ছাত্রী খুমার মামা, আবার কেউ বা ছাত্র সৌরভের দাদু।

এদের দেখে ভাবতাম কী আনন্দেই না এরা বিকেলটা কাটায়। দল বেঁধে সিনেমায় যায়। শীতকালে পিকনিকে যায়। আমার পাশের বাড়িতে থাকতেন বিশ্বস্তর সেন। কেন্দ্রীয় দপ্তরের উচ্চ পদস্থ অফিসার। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তার বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। অবসর নেওয়ার পর তিনিও এই পার্কের মঞ্জলিসে যোগ দেন। প্রথম প্রথম তিনি ইতস্ততঃ করতেন। সবার সাথে মিশবেন একথা ভেবে সঙ্কুচিত হতেন। পার্কের বেঞ্চির এক কোণে বসতেন ঠিকই কিন্তু নিজেকে সবার থেকে আড়াল করে রাখতেন। সময়ের সাথে সাথে তিনি চাকুরি জীবনের পদমর্যাদার পার্থক্য ভুলে গিয়ে সাধারণ হয়ে উঠলেন। দেখতাম, বিশ্বস্তর বাবুকে অন্যান্য ব্যয়ক লোকেরা যৎযৎ সম্মান করতেন।

এই বিশ্বস্তর বাবুকে আমি কাকা বলে ডাকতাম। তিনিও আমাকে পুত্র রেখে দেখতেন। সময়ে অসময়ে বাড়ি যেতাম। অফিসের ফাইল দেখতে দেখতে আমার সঙ্গে দিব্যি গল্প করতেন। কী অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কী গভীর জ্ঞান। মাথা নিচু করে আমি সব শুনতাম। ভীষণ ভালো লাগত। তার সীমাহীন ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করত।

কাকাবাবুর নিজের বাড়ি। গাড়ি আছে। অগাধ সম্পত্তির মালিক। গ্রুচর ব্যাঙ্ক ব্যালাস, এক কথায়, মা লক্ষ্মী তার প্রতি অকুণ্ণ। এক ছেলে আছে। সেও কেন্দ্রীয় দপ্তরে চাকুরিরত। দিল্লিতে বদলি হয়েছে, স্ত্রী ও কন্যা নিয়ে সেখানেই থাকে।

আমাদের আলোচনা বিভিন্ন বিষয়ে হত। রাজনীতি থেকে শুরু করে সিনেমা, বর্তমান

সমাজ ব্যবস্থা কোনও কিছুই বাদ যেত না।

মাঝে মাঝে উনি বলতেন— ‘উগ্ৰবান না চাইতে আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। আবার অনেক কিছু জিনিস থেকে বঞ্চিতও করেছেন’।

এই কথাগুলো শোনার পর আমার মন বেদনায় ভরে যেত। সংসারে থেকেও কেমন যেন তাকে উদাসীন মনে হত। কাকীমা তার ঘরে বাস্তব থাকতেন। টিভি দেখতেন। বই পড়তেন। আর কাকাবাবুকে দেখতাম নিজের ঘরে অফিসের ফাইল দেখতেন। মাঝে মাঝেই ওঁকে অফিসের কাজে গিঁটি ছুটতে হত। বিভিন্ন কনফারেন্সে লেকচার দিতে যেতে হত। কাকীমাকে সময় দিতে পারতেন না। এ নিয়ে কাকীমার মনে কোড ছিল। আমার মনে হত, দুজনের মধ্যে যেন ব্যক্তিত্বের সংঘাত আছে। দুজনের মধ্যে যেন দেওয়াল আছে। সেটা ছাড়িয়ে কেউ কাউকে দেখতে চায় না বা দেখতে পায় না। বোকা যায় অল্প বয়সে কাকীমা বেশ সুন্দরী ছিলেন। সাময়িক রূপ ও যৌবন নিয়ে অহঙ্কার ছিল। তার বন্ধু বান্ধবীদের নিয়ে ঘরে বসে আড্ডা দিতেন। বন্ধুদের নিয়ে সিনেমায় যেতেন। হোটেল রেষ্টোরাঁয় খেতেন। কাকা-কাকীমাকে অনুষ্ঠান ছাড়া একত্রে আমি কমই দেখছি। দুটো জীবন চলেছে। কার সাথে কারও যোগ নেই। যেন সুমেরু ও কুমেরু। দুজনের মধ্যে যে খুব একটা কথাবার্তা হত তাও নয়। অন্ততঃ আমি দেখিনি। এসব দেখে মাঝে মাঝে আমার অস্বস্তি বোধ হত। কাকাবাবু বুঝতে পারতেন। কিন্তু এ সবের তেয়াক্ষা না করে অনায়াসে আমার সঙ্গে গল্প করতেন।

সময় বদলায়। পার্শ্বি, ভোগী ও লোভী, কাকীমার সেই রূপের জৌলুস আর নেই। চোখে মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। এখন আর তেমন বন্ধু, বান্ধবী আসে না। নিজের ঘরে নিজেই বসি। একাকী যেন বন্দি নী রাজকন্যা। একরাশ অভিযোগ ও অভিমান সারা মুখে ছড়িয়ে। অনেক না পাওয়ার বেদনা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

তারপর একদিন কঠিন অসুখ হল। নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন পর মারা গেলেন। কাকাকে আরও অসহায় মনে হল। মনে হল এক বিরাট শূন্যতা তাকে যেন গ্রাস করেছে। চুপট মুখে কাকীমার মৃত মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন— ‘রাহ মুক্তি হল’।

তারপর থেকে সেই বাড়িতে কাকাবাবু একাই থাকেন। রান্নার মানী দু-বেলা রান্না করে দিয়ে যায়। ঝি দুবেলা বাসন মেজে দিয়ে যায়। কাপড় কাচার দিদি সপ্তাহান্তে কাপড় কেচে দিয়ে যায়। আর সর্বক্ষেণের জন্য একটি মেয়ে আছে। নাম রূপা। মেদিনীপুরের মেয়ে। ভেরো-চন্দ্র বছর বয়স হবে। কাকাকে দেখাশোনা করে।

ইদানীং কাকাবাবুর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। বয়স হয়েছে। নানারকম রোগ ধীরে ধীরে কাবু করেছে। পিঠের ব্যাথা, হাঁটুর যন্ত্রণা, হৃদযন্ত্রসার, সুগার সমস্ত রোগ আছে। আমি মাঝে মাঝে অভিযোগ করে বলতাম— ভালো ডাক্তার দেখান। পায়সার তো অভাব নেই।

উনি হাসতেন আর বলতেন— ‘এই তো বেশ আছি। বয়সে সবারই রোগ হয়। এটা নতুন কথা নয়। পাঁচ জনকে বলে এটাকে আমি উৎসব করে ডুলতে চাই না।’

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। পার্কের কাছে এসে দেখি সব বেঞ্চি ফাঁকা। একটা ব্যস্ত লোকও নেই। আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। দু-একজন লোক গাছের নীচে জটলা করছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করতে বলল— সবাই বিশ্বস্তর বাবুর বাড়িতে গেছে।

আমি দিশাহারা হয়ে পড়লাম। এমন কী হল যে সবাই কাকাবাবুর বাড়িতে গেছে। আমি যতদূর জ্ঞানি কাকাবাবু হরিদ্বার গেছেন। ফেরার সময় এখনও হয়নি।

বহুদিন ধরেই কাকাবাবু ভাবছিলেন কয়েকদিনের জন্য ছেলের কাছে কাটিয়ে তারপর হরিদ্বার যাবেন। নাটনিকেও দেখা হয়নি বহুদিন। এখন নিশ্চই সাত-আট বছরের হবে। এই কথা ভেবে ছেলের জন্য জামা-প্যাণ্ট, বৌমার জন্য শাড়ি, নাটনির জন্য জামা, পুতুল, খাবার-দাবার কিনে মজুত করেছিলেন আর যাওয়ার দিন গুনছিলেন। ছেলের কাছে যাবেন বলে ছেলেকে এস. টি. ডি. ও করেছিলেন। আমি তখন পাশে ছিলাম। ও প্রান্ত থেকে ছেলের কঠোর শোনা গেল— বাবা তুমি এখন এস না। জুলির শরীরটা ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। তুমি বরং দুমাস বাদে এস। ফোনটা রেখে দিয়ে তিনি গভীর ভাবে কিছুক্ষণ সোফায় বসে রইলেন। জুলি ওদের একটি পোষা কুকুর।

কাকাবাবু একরোখা ছিলেন। বললেন— যাব যখন ঠিক করেছি তখন যাবই। তবে ছেলের ওখানে নয়। কুকুরের শরীর খারাপ নিয়ে ওরা ব্যস্ত থাকুক। ওদের বিরক্ত করতে চাই না। ওরা সুখে থাক। আমি হরিদ্বার যাব।

উপহারের কথা বলতে গেলে উনি, লেন— ওগুলো হরিদ্বারের গরীব ছেলে মেয়েদের বিলিয়ে দেব। ভগবান আশীর্বাদ করবেন।

বলা মাত্রই ককা। কাকা চলে গেলেন হরিদ্বার। সাথে রুণা।

বাড়ির সামনে এসে দেখি ভীড়, লোকারণ্য। হিন্দু সংস্কার সমিতির গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে আসতে দেখে পিঙ্কীর বড়দা বলল— হরিদ্বারে গিয়ে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বর, বমি, পেট খারাপ। ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। কোনও কাজ হয়নি। বাড়ি ফিরতে চেয়েছেন। পথে ট্রেনেই মারা যান। যাওয়ার আগে চিঠি লিখে গেছেন যেন তার মৃত্যুর পরও তার পুত্র ও পুত্রবধূকে কোনও খবর না দেওয়া হয়। আর তাঁকে যেন ঘটা করে দাহ না করা হয়। হিন্দু সংস্কার সমিতির গাড়িতে যেন নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি মৃত্যুর আগে একটি উইল করে যান। তার স্বাবর-অস্বাবর সমস্ত সম্পত্তি যেন রুণাকে দেওয়া হয়। কারণ এই রুণাই তাকে জীবনের অসময়ে দেখেছে। রুণা অবস্থায় সম্মেহে সেবা পরিচর্যা করেছে। এই টাকাত্তে গরীবের মেয়ে রুণার একটা গতি হবে। রুণার বাবা যে প্রতিমাসে টাকা নিতে আসে সেও রুণাকে ভালোভাবে বিয়ে দিতে পারবে।

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আমার মুখেও কথা সরছিল না। চারিদিকে বিষণ্ণতা, নিঃশব্দতা, নীরবতা বিরাজ করছে। আর তারই মধ্যে রুণা হাউ-হাউ করে কাঁদছে। কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিশ্বস্তর বাবুকে দেখছে আর মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, ওর যেন নিজের কেঁউ চলে গেল যে আর কখনই ফিরে আসবে না। আর রুণা মা বলে সোহাগ করে ডাকবে না।

আমিও নীরব। বহু শ্রুতি মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল। গাড়ির বাইরে রুণার অসহায় কান্না। অনেকদিন ধরে কাকাবাবুর কাছে আছে। গাড়ির কাঁচের ভিতর দিয়ে অন্তিম পথযাত্রী কাকাবাবুকে শেষবারের মতো একবার দেখতে ইচ্ছে হল। মুখখানি প্রশান্ত নিখর। কোনও ক্ষোভ নেই। নেই কোনও অভিযোগ, অভিমানের সন্কেত। মুখের কোণে একটু মুচকি হাসি। মনে হল পরম কৌতুকে কাকাবাবু যেন বলছে আমার— জানতে কী পেরেছিস ঠিক, এ জীবনে কে আপন আর কে পর, আমি বুঝিয়ে দিয়ে গেলাম। রুণাকে সেবিস। গলির মোড় ঘুরে গাড়ি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ঝাপসা চোখে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

ছাত্রের অনুরোধে গল্প লেখাটা কখন যে সত্যি সত্যি ঘটে গেল বুঝতেই পারলাম না। □

খোলা পাতা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

দু একটি পাতা ওহু

শীতের কমলালেবু বেড়াতে এসেছে

কলকাতার বাজারে

তার মনে পড়ে

ক্যামেলিয়া ফুলগুলি বলেছিল

তুমি কেন চলে যাচ্ছ সমতলে

পাহাড়িয়া কেউ গেলে তারা তো ফেরে না

এ সত্য কি অর্ধসত্য নয়!

যারা যায়

ভাদের কয়েকজন ফিরে চলে আসে...

আসে নাকি!

অপেক্ষার স্নানলাগুলি

কবিতার বই-এর মতন

চিরকাল খোলা পড়ে থাকে...

ছোট হওয়া

শিশির সামন্ত

হাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে গাছগাছালি,

সারা দিনই চু কিত কিত খেলছে এসে রঙিন অলি।

এই ভো পুঁখি মুক্ক হওয়ার ভাৎকণিকে আলোর দেশে,

গাছের ভিতর, আলোর ভিতর, পাতার ভিতর নিরুদ্দেশে।

গা মুছিয়ে দেবে কি কেউ জলের সঁতার সাস হলে,

ছোট্ট মাছের মা বাবারা ছলছলায় কি হাসির ছলে?

ইলিবিবিলির এই যে মাটি আলোছায়া, পাশেট জামায়

সারাদিনই দুঃখ করে লোক ডেকে কি স্নানায় স্নানায়।

সবাই কিন্তু শিশুই থাকে, কারও বয়স বাড়ে না ঠিক

তধু আমার বয়স বাড়ে, অনেকটা তার হয়তো বেশিক

সবাই বড় হয়ে গেলে এই পৃথিবীর থাকবেটা কী?

[গৃহবধু শঙ্করী ঘোষ লিখতে ভালোবাসতেন। স্বামীর সঙ্গে দেশে বিদেশে ঘুরেছেন অনেক। লেখার জন্য আকৃতি থাকলেও হাতলা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ ছিল না। 'একুশ শতাব্দী' প্রথম তাঁকে জনসমক্ষে নিয়ে আসে। সে মাত্র বছর তিনেকের কথা। তাঁর কবিতা, গল্প, প্রকাশিত হয়। ক্রমে অন্য পত্রিকাতেও তাঁর উপস্থিতি দেখা যেতে থাকে। অনেকদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। গত ৯ ফ্রেব্রুয়ারি হৃদরোগে অফোস্ট হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর আত্মশ্লিক মুদ্রা আশ্রানের ব্যক্তি ও শৈলীভিত্তিক করে। এখানে তাঁর একটি অপ্রকাশিত কবিতা মুদ্রিত হল। —সম্পাদক]

খাদক

শঙ্করী ঘোষ

শীর্ষে ছিল, বড় প্রিয় খাদ্য তালিকার :
পাঁচ তারা, সাত তারা, প্রাচ্য-প্রতীচ্য।
সুদৃশ্য বিলিতি মোড়ক— রেডি টু কুক।
অথবা দিশী, এসি মার্কেট থেকে,
বেছে এনেছে, কিনে, সাদা উর্দির খানসামা।
কর্কট।

সব্ভাঙ সাক্য সমাবেশ।
মুদু স্বর গঞ্জল গায়কের।
সুশিক্ষিত বয়-বেয়ারার দস্তানা পরা হাত।
রূপোর পরিবেশন পাত্র,
সুসজ্জিত। সুবাস সু-বাস—
কর্কট।

বুকের খাঁচায় কখন সে নিয়েছিল বাসা!
জানিনি। বুঝিনি, দেখিনি কখনও,
কর্কট।

নাম চিনি খাদ্য তালিকায়,
স্বাদ চিনি ডিনার টেবিলে,
রূপ? অচেনা সে— দেখিনিও,
বাসা বেঁধে আছে বুকের পাঁজরে।
কর্কট।

খাদ্য নয়। খাদক আমার!

যুদ্ধবিরোধীদের জন্য

প্রভাত চৌধুরী

পৌরাসিক যুদ্ধের সেই কাঠবিড়ালিটির কথা এখনও গুনতে পাওয়া যায়,
কারণ সেই সময় যুদ্ধবিরোধীদের কোনও ভূমিকা ছিল না,
মঙ্গলকাব্যেও কি ছিল? এই সব প্রশ্ন হলে কেউ যদি আমাকে
যুদ্ধের পক্ষে ভেবে বসেন আমি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব না,
কেমনা আমি জানি, যিনি যুদ্ধ-বিরোধী মিছিলে হেঁটে গেলেন
গোষ্ঠ পালের মূর্তির পদদেশ থেকে, তিনিই আগামীকাল নামখানায়
কিংবা হরিণজাঙ্গল তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন,
হাতে তুলে নেবেন মারণাস্ত্র, এদের অস্ত্র দেখার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ
কোনও পর্যবেক্ষক পাঠাবে না,

ধ্বলগিরির চূড়ায় যিনি পাথরের মূর্তি হয়েছেন, বলিসযুদ্ধে
তাঁর ভূমিকা কিন্তু মুছে যায়নি, স্তম্ভল যত গভীর হোক না কেন
গাইডরা আঙুল তুলে এখনও সেই যুদ্ধকে দেখায়, যুদ্ধবিরোধীরা
ওদের আঙুলকে বশে আনতে পারেনি,

আমি যুদ্ধবিরোধী নই, আমার যুদ্ধ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে।

গল্পমালা থেকে

যশোধরা রায়চৌধুরী

আজ যদি ঝগড়া হল, তুমি চুষনের থেকে ঠোট তুলে নিলে
পাশাপাশি থাকলেও মনে হয় না পাশাপাশি আছি।

মধ্যে মধ্যে ফেসে থাকে জীবনের আশ্চর্য ঘটনা,
গঙ্গা ও স্টিমার, দুজনের মধ্যে ভাসানো পনটুন,
তার উপর কালো থাম; যার উপর বসে আছি আমি
জীনসের কাপড়পরা বিষন্নতা পাশে বসে আছে।

এরকমই সন্ধ্যা আর চাপচাপ বাঁধা অন্ধকার
সোজা সোজা মনখারাপ, নিগারেট-ভালানো ঘটনা
এত বেশি চেনা চেনা : লক্ষ করতে ভালোও লাগে না।

তুমি যদি ঐ দূরত্বের থেকে ফিরে এসে আবার নিকট হতে চাও
তার জন্যও না কি প্রয়োজন ছায়া একটি বড় চেউ?

সাদা পাতা -১

কৃষ্ণা বসু

হস্তারক সাদা পাতা টেনে তোলে রাতে,
ঘুম নেই চোখে তোর রুচি নেই ভাতে,
শব্দভ্রম কবিত্রয়, রাত্রি অন্ধকার,
কে টানে খাতার কাছে? গানেই নিস্তার
চেয়ে গান গাই, গান বাঁধি শিল্পাতুর
আমি, ঘোর লাগা উঠে বসি গাড় সুর
রক্তের ভিতরে গিয়ে গান গায় খুব।
মরণগানের মধ্যে মগ্ন দিই ডুব!

সাদা পাতা দশ হাতে শত হাতে টানে,
এ জীবনে যা পেয়েছি তার ঠিক মানে
জানিনি তো; শুধু জানি জীবন জোগায়
সংখ্যাতীত কথামালা, জীবনই তো গায়
রক্তের ভিতরে ঢুকে হাড় মজ্জা খায়,
দাঁস খায়, শাঁস খায়, গ্রাণ বায়ু হায়,
সব খেয়ে ফেলে রাখে নৃশী কবিতিকে
সংসার সামর্থ্য ক্রমে হয়ে আসে ফিকে!

সাদা পাতা -২

যোগতন্ত্র সন্ন্যাসীর মতন একাকী
তন্ত্রাবিষ্ট উঠে বসি, কাঁধে হাত রাখি,
কর কাঁধে হাত রাখি শব্দাক্রান্ত নারী?
যথার্থ অনুবাদ করতে কি পারি
মানবী জীবন খানি? হস্তারক পাতা
ঘোর রাতে ডেকে তোলে বেজ্ঞাচারী খাতা।
সারাটা জীবন ধরে শিল্পাবিষ্ট হয়ে
বসে থাকি, রক্ত মজ্জা ক্রমে যায় ক্ষয়ে,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় আয়ু, ক্ষয়ে যায় গ্রাণ,
কী গান গাইতে এসে গানে কোন টান
খুঁজে পাই? জীবনের যাপনের রীতি?
অহি থেকে, গ্রহি থেকে উঠে আসে গীতি।
হস্তারক সাদা পাতা টেনে তোলে রাতে,
রক্তাক্ত কলমটিকে নিয়ে ডান হাতে
খুঁকে পড়ি, শব্দ খুঁজি, শব্দ-জন্ম কবি
শব্দে সব ধরতে পারি, শব্দে ধরি সব-ই।

আজও, তোমাকে

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালোবাসা—
অন্তর্যুগ স্বপ্ন এখন,
তোমার দিক্‌চক্রে অপস্রমমান
প্রতিবিশ্ব রেখে গেছে
নিঃশব্দ আমার হৃদয়ে;
তোমাকে দেখছি আমি
মুক্ততার সেই প্রথম আলোভেই—

ছায়াসূর্য রূপকথা লিখে চলে।

দিন যায়—

অগ্রাকৃত ছবি ক্রমে ক্রমে

স্পষ্ট হয়,

রাত আসে;

দেখব তোমাকে আমি

অন্যপূর্ব সূর্যোদয় হলে...

তার অনুসরণের আলোয়...

শহীদের ডাক

মৃণাল দত্ত

শবনম বসে আছে নদীতীরে
গোধূলির বিদায়ী সূর্যরেখা
টিকটিক করছে ক্ষীণস্রোত নদীবক্ষে
সন্ধ্যা নেমেছে ঝটবৃক্ষের কাকস্বী মুখের ডালে
দূরে গ্রাম্য কুটীরে শঙ্খধ্বনি
জোনাকি জ্বলা রাত
নক্ষত্রের আলো অন্ধ আকাশে।

নিবিড় অমি বললুম
তুমি কি উনিশের একুশের
ছেলেদের কথা ভাবছো
শবনম চুপ করে রইল,
মায়ের ভাষা মায়ের কর্মমালায়
গর্বিত মানুষেরা শহীদ হয়ে গেছে
হামলাকারীর হিন্দে রোষে।

আকাশে জ্যোৎস্না ঘুমিয়ে আছে।
অনারাধে মহাশূন্যে
বোমারু বৃশের গর্জন। বিশ্বায়নের অক্টোপাস হাত
বুঝি বিলি কাটে তার কৃষ্ণ কুন্তলে
নিঝুম নদীতীরে ঝটবৃক্ষডলে
ঋদ্যোতের জ্বলা নেভা—
শবনম তাকালে আমার দিকে
অস্পষ্ট সে মুখে প্রত্যয়ী ভাষা। বললে
প্রাণের চেয়ে বড় আরও কিছু থাকে পৃথিবীতে
ঋণাকুপা; হয়তো বা হত্যা করে— মরে না সে
প্রাণবন্যায় জেগে থাকে— শিখা তার অমলিন
হয়তো বা আরও দীপ্ত
মিছিলে মিছিলে বিনিমিত দিনে রাতে
করোচ্ছল পৃথিবীতে
তুলে ধর
শহীদের রক্তে লাল মাড় বর্ণমালা
অমারাধে
স্তুত কর প্রত্যাষের গান।

একুশ শতাব্দী ৪৪

নববর্ষে

অরিজিত দত্ত

একত্রিশ শেষ হয়ে
পেরিয়ে গিয়েছে মাঝরাত
সুসভ্য নগরে চরে
সুদক্ষ হায়নার জাত।

মেয়েটি শালীন নয়
চোখে মুখে খুব আহ্বান
উদ্ধত পোশাক পরে
তুলেছে আনন্দের বান।

পিছু নেয় হায়নারা
ক্রান্তগামী চারচক্র যানে
হটোড়ে মেতে ওঠে
মেয়েটির হাত ধরে টেনে।

হায়না ঝাঁপিয়ে পড়ে
লোভনীয় সুলভ শিকার
স্তম্ভতা ধ্বস্ত হয়
মেয়েটির তীক্ষ্ণ চিৎকার।

সেই দৃশ্য সেবেছিল
ভয়হীন তরুণ যুবক
একাকী অরণ্যচারী
বিপদে সাহায্য যার শব।

শিকার ফসকে যায়
হায়নারা ক্রুদ্ধ হয় রাগে
যুবক বিদীর্ণ হল
নববর্ষে প্রত্যাষের আগে।

চট্টল খেলাঘর

সমর্পণ শ্রুতপাধ্যায়

বুক নিংড়িয়ে অন্তঃস্থল থেকে টেনে এনে
সাতকাহন শোনাতে পারি শুধু তোমাকেই,
শরীর নিবিক্ত বহুদূর থেকে নিয়ে আসা
সহজ গল্প।

সীমিত সাহচর্যে গৈথে রেখেছি যে ভাবে
সে ভাবেই শোনাব অশ্রমেধের কাহিনি।

• একটা কেন্দ্রস্থল থেকে শুরু করে
ক্রমশই তুল হয়ে যায়, কে কার ঐরকেন্দ্র ?
হিসেবগুলো সহজ,—
দুবেলা হাতিয়ে যাও নামের সঙ্গে যশ—
কাজ ক্ষমতা বীজতলা চাষের মাঠ ও খরা
সমবহরের সালতামামি লিস্টি ধরে দাঁড়িয়ে আছে রাজ পেয়াদা।

তোমরা পুড়িয়েছ অনেক পরিচর্যা
এখন কি সামান্য দাক্ষিণ্যে ছেড়ে দেবে রাজপাট— ?
ভুখা মিছিলে, স্বরূপনগর বাদুড়িয়ান বৈশ্বাকাষ্ঠ হয়ে
ঝুলে থাক ফলের বাগানে—।
কতটা দক্ষিণে যাবে—
যতটা সহজ বামে মনোবোগী হওয়া।

শতাব্দীর সেরা ঐশ্বর্য তুমি ও তোমরা
বিন্দু বিন্দু বেদ ঝরিয়ে গেলে
হল না কিছু গড়া,— গিঠোপিঠি
রাজপথে কার্ণিভাল,—
আজ মিঠুন কাল হস্তিক, এভাবেই
হুম্ হ্যাম রাহি প্যায়রকে, হম্কে কুছ না বোলিয়ে।

দিব্যা আছি ভায়া
পেঁকুলামের মতো ঘুরে ঘুরে
দোল দোল মোদুল দুলনায়—
কখনও সন্ধ্যায় সীম প্রদীপ ছেলে আকাশ পানে তাকাই
কখনও গভীর রাতে জলের দিকে ফিরে
খুঁজি জলের সন্ধান—
এ এক অকৃত চট্টল খেলাঘর।

শকট ভ্রমণ

প্রবীর ভৌমিক

চোদ্দটি প্রদীপ জ্বলে তৃতচতুর্দশী রাত্রে এই
বাংলাদেশে
শ্মশান, মশান পার হয়ে তার কাছে যাওয়া
পঞ্চদশীর রাত্রে কৃষ্ণ অন্ধকারে।

চোদ্দটি অতীত পার হয়ে আমি আসছি
অপেকায় থেক—
অন্ধকার অনন্তর মাঠে
শি-শির ডাকের মাঝে, মাঝে-মাঝে
শিবির চীৎকার
শূঙ্গার শীৎকার হয়ে আকাশে ভেসেছে।
বাতাসে মাংসের গন্ধ।
আমি আসছি অপেকায় থেক।

তৃতচতুর্দশী অর্থে চোদ্দটি অতীত আমি
পৌনঃপুনিক ভূলে গেছি
দূরে ছুঁড়ে দিয়েছি প্রাক্তন
স্বতঃস্ফূর্ত ঝরনা কলম, পাতুলিপি।

শরীর উন্মুক্ত করে রেখ
অন্ধকার অন্ধকার অনন্তর মাঠ
পঞ্চদশীর রাত্রে প্রহারে, প্রহারে
দংশনে-দংশনে, গুহার ভিতরে
বিপরীত ক্রিয়ার ভিতরে আলোড়িত করে
গুরা ভিথির দিকে নিয়ে যাও।

পুনরায় গুরু করি শকট ভ্রমণ
গুরু করি যৌথ খামার,
কবিতার দৃট পাতুলিপি
গুরু করি—

শেষ বন্দর থেকে লেখা

মানসী সরকার

যতবার
মৃত্যুকে ডেকে এনে ছুঁয়েছি
তার নীল ওষ্ঠাধর,
শেষ বন্দর থেকে ঘন্টি বেজে ওঠে।
আর এক দূর পাটাতনে

নীল নক্ষত্র;

পড়ে থাকে একক একাকী।
যতবার দহনে চেয়েছি তোমায়
চেয়েছি অগ্নিময় দীর্ঘ উৎসবে
তার চেয়ে দীর্ঘ কোনও আগুনের সাথে
ভেসে গেছে
জলজ মৃত্যু।
মিশে গেছে মৃদু ঘ্রাণে উৎসবমি
থেকে উঠে আসা অন্ধকারে।

কর বিচার

মৃদুঞ্জয় কুহু

হাত বাড়ালেই যে হাতের
নাগাল পাওয়া যাবে—
এমন কোনও কথা নেই।

কিছু কিছু হাত হাতছানি দেয় ঠিকই
কিন্তু হাত বাড়িয়ে দিলেই—
সে হাতগুলো অন্য দিকে ঘুরে যায়।

আলোয়াকে যারা আলো ভাবেন
তারা একবার ভেবে দেখতে পারেন
আসল ফারাকটা কোথায়।
অন্ধকার কে অন্ধকার ভাবুন
ক্ষতি নেই।
আলোয়াকে আলো ভাবলেই ক্ষতি।

সব হাতই যে আলো হবে
এমন নয়।
কিছু কিছু হাত আলোয়ও হতে পারে।
হাত ধরে নামাবার জন্যে
কিছু হাত তৈরি হয়ে আছে
কিছু হাত ভাঙা সাঁকো
পার করবার জন্যেও।
আপনাকে হাতের ভাষা বুঝে
হাত বাড়াতে হবে।

হাত পেতেছি কৃষ্ণচূড়া

দেবাশিষ শেঠ

হাত পেতেছি তোমার কাছে
কৃষ্ণচূড়া, বসন্ত দিন,
একটা শুধু আকাশ দিয়ে
ফুল ফোটানো যন্ত্রণাহীন।

পর্ণমোচী ডালপালাতে
গভীর করে পরশ দিয়ে
রক্ত রঙে রঞ্জিয়ে নেওয়া
রোমান্থিৎ উত্তরীয়।

ঝরিয়ে দিয়ে দুঃখ যত
পাতার বৃকে জ্বলিয়ে রাখা
একটা শুধু বৃষ্টি বিবেক
সাক্ষী থেক শিরিষ শাখা।

তোমার কাছে হাত পেতেছি
শ্রদ্ধা বেলা বৃষ্টি বিহীন
হাত পেতেছি কৃষ্ণচূড়া
হাত পেতেছি বসন্ত দিন।

তীর্থ

ফেরদৌস নাহার

সে তার গন্তব্যের অধিক আনে
কিপ্র শপথ
মানুষের ইতিহাসে পায়ের পরিচয়
বেশ কিছু রোমাঞ্চকর ও ঘূর্ণিময়
বৈরথের সমান্তরাল, মূর্তিমান ভূগোল
চবে খায় উদয়ন, অস্তগামীকণ
আজ সে পায়ের পাতায় মাটি লেগে আছে
এস তীর্থ তোমাকে শুদ্ধ করি
জল ঢেলে ঢেলে।

কবিতার স্বর

জয়ন্তী রায়

আমার সব কথাই তোমাকে স্পর্শ করবে
এমন ভাবি না,
সব বুঝি কি মাটিকে ভেজায়?
হাওয়ায় উড়ে যায় ফুলের পাপড়ি,
কখনও ঝরে পড়ে মসৃণ বারান্দায়,
কখনও নর্দমার জলে, অথবা
ভেসে যায় নদীর তরঙ্গে।
কথাগুলো কোথাও সাজাব
বলে তো রাবিনি,
কোথায় কার দুঃখের অংশীদার হবে
অথবা কোন রোগের বিশল্যকরণী,
তাকে কোন ধ্বজাধারী ইত্তেহাদ
হতে বলিনি আমি,
বলিনি ঋষি খোলা হিমে সাপ হতে
কিনবা বর্মহীন বল্লম,
প্রেমিকার চোখের যাদুমায়া,
অথবা বন্দীশালার গ্রহরী,
সে আমার রক্তাক্ষরও নয় অথবা ঘাতক—
কখন কোন শব্দে সে জেগে উঠে
ঝিনুকের ভেতরে মুক্তো খুঁজবে,
কোন আলোর নেশায় পুড়বে পতঙ্গ,
নিরঙ্গের মুখে গুঁজে দেবে ভাত,
অন্ধকার রাতে দিশাহীন পথিকের সামনে
টেনে আনবে আলোর সকাল,
অনাথকে টেনে আনবে তার নিজের ঘরে,
কুৎসিত রক্তাক্ত অনায়া থেকে
সরিয়ে এনে বলবে 'আমি তোমার মা,
আমি তোমাকে সমস্তরকম
মৃত্যু থেকে বাঁচাবো।'

কে ডাকছে কাছে

কে মুখ ঘোরাল

কক্ষসাধন নন্দী

ওই শুকনো হাসি নাই হাসল ওষ্ঠ
আসার দিনগুলো মনে আছে নিশ্চয়ই
ভাঙা চেয়ার পাতল না পাতল কেউ
দিন কেটে যায় এর পরই সূর্যাস্ত

কে ডাবল কাছে কে মুখ ঘোরাল
কে ফোড়ন দিল গরম তেলে
বড় ফাঁকা মনে হয় এইসব
তাই এমন উচ্চারণ এলোবেলে।

আনন্দপ্রসাদ নিয়ে যাচ্ছিলো শোন
তোমাদের জন্য রেখে গেলাম তা
এ শহর থেকে কলমটাই নিলাম
অনেক কিছুই অপূর্ণ ইচ্ছা ফেরি।

বিষাদ বর্ণনা

তাপস রায়

বুকে ঘুণপোকা মাথা কটকট কাটে
কারও মনে এল সই-রাস্তায় হাঁটা
বছর ফুরল সেই একা দিন কটে
অলস যাপনে, পূর্ণিমা বনে কাটা

আড়াল করেছ পতাকা টতাকা এনে

- আড়ালে আড়ালে মুখে ভাসানের হিম
ধুলোবন্না ঘিরে রচিত সিংহাসনে
ভীষ্মকথামালা খন্ড ছিন্নদিন

যতটা জীবন ততটাই পাপগাথা
যতটা জীবন পরাজয় ছুটে আসে
'কর ত্রাণ' বলে কোথায় দাঁড়াব পাশে
চুপে! প্রেমে ঝরে হেমন্ত-পাতা

কথা পান্টায়, কথারা তরলমতী

দীপ দুচোখে অসম্ভবের যতি

বোঝা না বোঝা

মিলনেন্দু জ্ঞান

বোঝে সে সে ভালোই বোঝে
লাল না সবুজ—
তবুও থাকতে চায় নির্ঝঞ্ঝা অবুঝ!
এটা কি আকাশী কোনও রামধনু টঙ?
অথবা ক্রিকেট কোনও মাঠ খোলা সপ্ত?
চিনে সে নিরেট চেনে...।

চিনে সে নিরেট চেনে কবিতা ও কবি,
তবুও থাকতে চায় পটে আঁকা ছবি;
হয়তো এটাই ধর্ম নদ বা নদীর—
তাইতো ভিক্ষাসা সাঁটা কিন্তু বা যদিও!
বোঝে সে ভালোই বোঝে...।

প্রতিক্রিয়াশীল

অলোক কুমার হালদার

দস্ত নখর রোমশ বক্ষ বিঘাট অনূভবে
সব রাস্তায় খেলতে খেলতে রক্ত ঢালছে কারা?
জ্ঞানি জ্ঞানি সব স্রোতের উৎস, তবুও বলতে হবে—
গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা

যারা ডেকেছিল পথে নেমে এস সাধি
পৃথিবীর সব ক্রেদ ধুয়ে মুছে ফেলি।
তারাই এখন ঘরে ছেলে সুখ বাতি
ভোগের সাগরে করে ব্যাভিচার ফেলি।

এমন দিনে তারে বলা যায়—

বিপ্লব বলে আসলে শিকল পরিয়ে দিয়েছে পায়।
দুনিয়াদারির মালিকের চোখে আব্দুল উঠিয়ে যারা
বলেছিল— ভাই ভয় নেই তুই বুক টান করে দাঁড়া।
মালিক ও শ্রমিক মাঝখানে তারা দালাল হয়েছিল হয়
এমন দিনে এসব বেদনা কাহারো বোঝানো যায়?

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

(১৯৪২—২০০৩)

তারাপদ আচার্য

বড় অসময়ে মঞ্জুষকে চলে যেতে হল। যে কবিতাসৃষ্টির কাজে তিনি আলীশন মগ ছিলেন, তার অনেকখানি অসমাপ্ত রইল। এক অর্থে অবশ্য পৃথিবীর কোনও সৃজনশীল মানুষের সব কিছু সনাপন করা হয় না। অনেক কিছুই অসমাপ্ত থেকে যায়। এ নিয়ে আত্মসাস করার নেই। মানুষের জীবনে কখন যে ঘনি়ে আসবে মৃত্যু, তা কেউ বলতে পারে না। মঞ্জুষ তাঁর ষাট বছর বয়সের মধ্যে যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তা নিছক সামান্য নয়। তথ্যের দিক থেকে দেখলে দেখা যাচ্ছে তাঁর পদ্য ও গদ্যগ্রন্থের সংখ্যা সীহিত্রিশ। তাঁর সমগ্র কবিতা দুটি বৃহৎ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংকলন বা সংগ্রহটি তিনি মেখে যেতে পারেননি। ১৯ জানুয়ারি ২০০৩-এ তাঁর জীবনাবসান। এর সামান্য কয়েকদিন পরে বইমেলায় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতাসংগ্রহ ২। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে ডিসেম্বর ২০০২-এ। বইটির নাম 'এই যে পুরবীকথা বলো'। এই কবিতার বই তিনি দেখে গেছেন এবং নিজের হাতে উপহারও দিয়ে গেছেন অনেককে।

মঞ্জুষের জন্ম ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪২। অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম তাঁর জন্মস্থান। ফলে, কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর, সে অভিজ্ঞতা আরও প্রসারণ লাভ করে শিক্ষকতায় ও সরকারি চাকরি জীবনে। তিনি সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়েও তাঁকে আসতে হয়েছে। মিশেছেন অসংখ্য ভিন্নরুটির মানুষের সঙ্গে। এই সবকিছুই তাঁকে সাহায্য করেছে, সাহায্য করেছে নানা বয়সের বন্ধুদের ঔদার্য ও সংকীর্ণতা, সব মিলিয়ে পূর্ণ হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার ভান্ডার। যে কোনও সচেতন কবিতাপাঠকের কাছে সহজেই ধরা পড়ে এসব।

ভালোবাসা এক নারীর ভিতরে নদী

এত বাক তার এত রহস্য কুয়াশায় মাখামাখি

তবু তাকে বোকা জ্বলের মতনই সোজা

খুব জ্বর হলে উদ্বেগ নিয়ে বিষয় ঢেউ যদি

তোমার কপালে জলপটি দেয় সেই নারী সেই নদী

(ভালো আছে ভালোবাসা, ১৯৯৮)

আরও অল্প বয়সের লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় অভিজ্ঞতার বিচিত্র নির্বাস। সেসব কবিতা মূলত রোমান্টিক। যদি বলা যায় মঞ্জুষের কবিতার প্রধান উপজীব্য প্রেম, তাহলে বোধহয় ভুল হয় না। তাঁর প্রেমের কবিতায় যে-সব প্রতিমার দেখা মেলে, সে-সবই দুঃখ-বেদনা ও আনন্দ-উজ্জ্বলের সমাহার। বস্তুত, জীবন মানে তো এ সবেরই টানা পোড়েন। একেবারে কুড়ি

বছর বয়সের লেখায় এই কবি-জীবন আরম্ভের বীজ :

জেনেছি সকলি যায়— কালের গীটার
ওনিয়েছে বারে বারে আবৃত্ত অংকার
সুতরাং কুয়াশায় শেব হলে মিলিত গ্রহর
তখন দেখব বেশ— হিমা নারী নারীর শহর।
কখন কি হবে ডেবে বিষমতা মৈত্রী পায় যদি
জন্ম ক্ষণে তবে মৃত্যু— পারবে না যেতে নদী সমুদ্র অবধি।

(প্রথম দিনের সূর্য, ১৯৬২)

আরো দশ বছর পর ১৯৭৩-এ মঞ্জুষ লিখেছেন :

একটি দারুণ শব্দ পৃথিবীকে সবচেয়ে বড়ো বিশেষণ
দূরতম অন্তরীক্ষ চকিতে দেখাবে
গোপন থাকবে না কিছু— নির্বাস প্রান্তর হবে তোমার হৃদয়।
একটি বিখ্যাত শব্দ প্রেমিকার সমস্ত কথাকে
ত্ত্ব করে দেবে—
ক্রমে তার মুখ হবে গোধূলির আশ্চর্য আকাশ
রক্তকরবী ডালে আরো বেশি রক্তের জোয়ার।
সমাদৃত সেই শব্দ স্মৃতি হবে কিছুকাল পরে।

(অন্য বনভূমি, ১৯৭৩)

মঞ্জুষ এখানে 'একটি বিখ্যাত শব্দ' বলতে অবশ্য প্রেমিকের কিছু উচ্চারণের কথা বলেছেন, সে উচ্চারণ এই অর্থে 'সমাদৃত' হবে এবং 'স্মৃতি' হবে যে, তাঁর সেই অকৃত্রিম সহজ কথায় প্রেমিকার 'মুখ হবে গোধূলির আশ্চর্য আকাশ।'

এই ছোটো নিবন্ধে শুধু এইটুকুই বলে রাখি যে মঞ্জুষের কবিতায় দীর্ঘকাল জুড়ে নারী-প্রেমই ছিল প্রধান উপজীব্য। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, অন্য ধরনের কবিতা তিনি লেখেন নি। লিখেছেন, আর সেসব কবিতায় আছে জগৎ ও জীবনের অন্যতর কথা—

ঠান্ডা এক নীল আলো নির্ভুর আঙুলে হিঁড়ে ফেলে
একগাদা কালো কালো ভয়ঙ্কর পাখির পালক
ঈশ্বরেরা ফুটবল খেলতে হঠাৎ পাঠান
স্বর্গের বাইরে লাল বল, আর তখনি আকাশে
সূর্য দিবি চমকে ওঠে সমুদ্রের নাকের উপরে—
এই সব দৃশ্যগুলি সেবে নেয় বিস্মিত বালক।

(দুর্গ থেকে টেলিফোন, ১৯৮০)

আলোচ্য কবির সমগ্র কবিতার বেশিরভাগ জুড়ে আছে নারীপ্রেম। আর, শেষের দিকে আছে মৃত্যুর কথা। অবশ্য নারীপ্রেম বলতে নিছক পৃথিবীর রক্তমাংসের নারী নয়। বলা যেতে পারে নারীপ্রেমের আধারে তিনি বিশ্বকে দেখেছেন। আবার, শেষের দিকের কবিতায় আছে

মৃত্যুর অল্প অনুব্রত। যেন মৃত্যুর আবেষ্টনীতে তিনি দেখেছেন জীবনকে, জগৎকে, নারীকে, প্রকৃতিকে।

নারীর প্রেক্ষাপটে জীবনকে নানাভাবে বিবিত্ত করেছেন। এ নিয়ে অবশ্য দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রইল। শারীরিকভাবে সক্ষম হলে এবং মজ্জাবের গ্রহিত অগ্রহিত সমস্ত লেখাপত্র হাতে পেলে একদিন সে চেষ্টা করা সম্ভব হবে।

এই কবি অবশ্য সাম্প্রতিক ইতিহাস-ঘটনা নিয়ে তেমন কিছু লেখেননি। সে একটা অনান্দিক। যাকে বলে ইতিহাস চেতনা, তা খুব অল্পই আছে তাঁর লেখায়। তবে সময় বা কাল-চেতনায় তিনি আচ্ছন্ন থাকেন তাঁর মতো করে :

- (১) চাঁদ ঘুরে যায়— পৃথিবী কেন্দ্রে থাকে
পৃথিবীকে করে সূর্য পরিক্রমা
ভেবো না নিয়ত তোমারি চতুর্দিকে
আমি ঘুরে যাব প্রতিদিন প্রিয়তমা।

(খণ্ড থেকে টেলিফোন ১৯৮৩)

- (২) নিতান্ত নিরীহ ওই অরক্ষিত বৃক্ষের মতন
জন্তুর নখর লাগে দেহে প্রতিদিন
ডাল ভাঙে, পাতা ঝরে— আসে না মঞ্জুরী
বড়ো প্রতিবাদহীন সর্বসহ সময় এখন।

(খণ্ড থেকে টেলিফোন, ১৯৮৩)

‘এত প্রিয় এখন পৃথিবী’ (১৯৯২) নামক আশ্চর্য কবিতার বইটিতে ‘শব্দশব্দ’ নামে একটি কবিতা আছে। যখন তাঁর কেবলই অন্যতম কথা, নারীর কথা, প্রকৃতির কথা। যখন তাঁর অসুখ ধরা পড়েনি। বেশ সুস্থ ও সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী মজ্জাব হঠাৎ কীভাবে যে এমন আত্মপ্রতিকৃতি আঁকলেন, তা ভেবে অবাক হয়ে যাই। নিজে ভীষণভাবে অসুস্থ ছিলাম বলে কবির শেষ যাত্রায় সঙ্গী হতে পারিনি। তবে, বন্ধুদের বিবরণে যা জেনেছি, তাঁর সঙ্গে আশ্চর্য মিল এই লেখায়। দশ বছর পূর্ববর্তী সময়ে কী বৃষ্টিতে পেরেছিলেন তিনি এই আপন পরিণতি। এমন হতেই পারে যে কবি সব মানুষের শেষ পরিণতির ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন।

শব্দের হাত পা আছে মাথা আছে হাড়গোড় আছে
ওধু প্রাণ নেই
রাম নাম সত্ হ্যায় গাড়ির ভিতরে
দমবন্ধ কাঁচের আড়ালে
শব্দশব্দ শাড়ি ওয়ে থাকে
নিতান্ত নিরীহ কবি সিদ্ধ কোনো সম্যাসীর মতো
আঁকুলের পঞ্চমুখী জবাফুল থেকে
একটু অমৃত দিলে দুরন্ত দামাল শিশু লাফ দিয়ে ওঠে

মধ্য রাতে সূর্য নীল কার্পেটের আকাশে দাঁড়ায়
কবি চলে গেলে পর
শব্দশব ফের শান্ত; অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে থাকে—
আরেক সন্ধ্যাসী কবে
পুনর্জন্ম অব্যাহত করে...

সাধারণত, যে সময়সীমায় কবি লিখছেন 'অথচ সে মধ্যরাতে চুপনে চুপনে শিহরিত,'
লিখছেন, 'হে নারী আমার প্রিয় হয়ে আছি সমুদ্রের শান্ত বালুচরে', অথবা, লিখছেন,
'প্রেমিকা তখন/হাতের সুদীর্ঘ নখে সুন্দরের বুকে/গোধূলির গলা টিপে রক্তপাত করে/চলে
যায় দিবা হাসিমুখে'— এই সময়কালের মধ্যে হঠাৎ লেখেন, 'শব্দশব শান্ত হয়ে থাকে/নিতান্ত
নিরীহ কবি নিষ্ক কোনো সন্ধ্যাসীর মতো'। এই যে আশ্চর্য বৈপরীত্য, এ-ও লক্ষ করা যায়
মঞ্জুষের কবিতায়।

২০০১-এর ডিসেম্বরে যখন কবি জেনেছিলেন যে, তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে
আক্রান্ত। মৃত্যু খুবই নিকটে এসে গেছে, তখন তাঁর আবুল আকুতি ছিল আর মাত্র তিনটি
বছর বেঁচে থাকার। কেননা, যা কিছু তিনি লিখেছেন সেগুলো সব শুছিয়ে নেবেন এবং আর
কিছু না লেখা কবিতা লিখবেন। কিন্তু তাঁর এই আকুতি সকল হয় নি। দুরারোগ্য ব্যাধির
কথা জানার এক বছর চারমাসের মধ্যেই তাঁকে চলে যেতে হল। অথচ, বিস্ময়কর ভেঙে না-
পড়ে মঞ্জুষ অপ্রতিরোধ্য গতিতে লিখেছেন অনেক কবিতা। সে-সব কবিতা শুধু মৃত্যুর কথাই
বলে :

মৃত্যুকে যে হত্যা করে সেই ব্রহ্মা দয়া দিয়ে ধুতে
পারেনি আমাকে
তবু তাঁর ব্রহ্মপন্থ
করুণার চাঁদ আলো পড়ে থাকে ঘাসে।

(এই যে পুরবীকথা বলো, ২০০২) □

একটি নতুন কবিতার বই

মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ

ভাপস রায়

অনুদ্বীপ ■ কলকাতা-৯

দাম-৫০ টাকা

ব্রহ্মাণ্ড মজুমদার স্ট্রিটের সেই ছোট্ট ওমটি-ঘরটার সামনের দিকে বসে থাকা সেই সাদামাটা মানুষটাকে আর দেখা যাবে না। সাদামাটা বলছি এজন্য যে সুনীল দত্তর চেহারা বা বেশভূষায় গ্রাম্যের নামক বস্ত্রটির সামান্য ছিটে ফোটাও ছিল না। একটি অর্ধমলিন পাঞ্জামা, তাও আবার পায়ের পাতা থেকে চার-ছ' ইঞ্চি উপরে উঠে থাকে, সঙ্গে একটি গরীব-গরীব ফুতুয়া বা পাঞ্জাবী, এই ছিল তাঁর নিত্যদিনের পোশাক। কথাবার্তা, শরীরী অভিব্যক্তি কোনও কিছুতেই সুনীল দত্ত দৃষ্টি আকর্ষক ছিলেন না। কিন্তু 'জাতীয় সাহিত্য পরিষদ' এর ওই ঘুপচি ঘরে রাশি রাশি বইয়ের সামনে 'তাকে, একমাত্র তাঁকেই মানাত।'

সেই ব্রটে রাজত্বের তিনিই রাজা। মলিন তাঁর কাণ্ড সিংহাসন। এছাড়া শূন্য, নিঃসঙ্গ জন্মেছিলেন ১৯২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার চেলসায়। বাবা কঙ্গীকৃষ্ণ, মা গৌরীবালা। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনা মন ছিল না। নাট্যাভিনয় ভালোবাসতেন কিশোর বয়স থেকেই। একটু বড় হয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে বিজ্ঞান ভট্টাচার্য, শত্ৰু মিত্র, উৎপল দত্ত, সুধী প্রধান, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিদের সংস্পর্শে থেকে কাজ করেছেন নেপথ্যে, প্রয়োজন হলে ছোটখাটো চরিত্রে মঞ্চেও উঠেছেন। পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠা বামপন্থী আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক অন্যতম শরীক। সেই ছয়ের দশকে বাম আন্দোলনের সময় পুলিশের ওলিতে তাঁর পায়ের শিরা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে কারণে পরবর্তীকালে ভালো করে হাটাচলা করতে পারতেন না। রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনে তাঁর লেখা প্রচার-নাটিকা 'রক্তে বোনা ধান', 'শেকল ছেড়ার গান', 'সংবিধান বিদ্রোহ' ইত্যাদি কব্বার ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে মঞ্চের জন্য লিখেছেন 'জড়গৃহ', 'ত্রিনয়ন', 'হরিপদ মাটার', 'ধরনদীর স্রোতে', 'সীমান্ত প্রহরী' প্রভৃতি নাটক। উপরন্তু ভাস ছদ্মনামে লিখেছেন 'অভিনয় চিন্তা', 'শত্ৰু মিত্র ও সৌন্দর্য প্রকাশ', 'নাটক রচনা ও প্রয়োগ কৌশল'। নাট্যচর্চা ও থিয়েটারকে ভালোবেসে একক প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছিলেন 'জাতীয় সাহিত্য পরিষদ'। মূলত নাটক ও নাট্যবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশন হিসেবে 'জাতীয় সাহিত্য পরিষদ' বাড়লা প্রকাশনা জগতে একটি বিশেষ স্থান লাভ করে। ব্যক্তি মানুষের একক উদ্যোগে এতটা কাজ বড় সহজ কথা নয়। তাঁর সম্পাদিত 'নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর' নাট্যকর্মী ও গবেষকদের কাছে এক অবশ্য-পাঠ্য আকর গ্রন্থ।

প্রচারবিমুখ এই মানুষটি আপন মনে নিজের মতো করে আমরণ শুধু কাজই করে গেছেন। নিজের ঢাক নিয়ে বাজানো গোত্রের মানুষ তিনি কোনও দিনই হননি। শেষের দিকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য রোজ আসতেও পারতেন না তাঁর ওই বগ্ন-কুটির 'জাতীয় সাহিত্য পরিষদে'। বছর দুয়েক আগে একদিন আমাকে কললেন, 'শত্ৰু মিত্র সম্পর্কে আপনার লেখা প্রবন্ধটির একটা জেরক্স কপি দিতে পারেন?' বললাম— 'হ্যাঁ দেব, কিন্তু কী করবেন?' কললেন: একটি সংকলন গ্রন্থ বেঁধে। সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন দীপাণ বাবু, ওটা ওখানে দরকার।' দিয়েছিলেন। আমার লেখা 'শত্ৰু মিত্র : বনিবাসিত রাজা' প্রবন্ধটি জেরক্স করে দিয়েছিলাম। সংকলনটির স্বর জালিনা। কিন্তু ঘটনাটির উদ্দেশ্য এ কথাই মনে করায় যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কাজ করতে চেয়েছেন। দারিদ্র আর শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে অস্বস্তি লড়তে লড়তে মানুষটি নিঃশব্দে অন্তর্হিত হলেন সাতাশে মার্চ, ২০০২। □

৬ নভেম্বর ২০০২ বাঙলা প্রকাশনা ভগতের অন্যতম দিকপাল কৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যু প্রকাশনা শিল্পে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি রেখে গেলেন দুই পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি নাতিদের। জন্মেছিলেন অবিতস্ত ভারতবর্ষের গ্রীষ্ম ছেলায় মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত মহাপেখী বড়কাপন গ্রামে। পিতার নাম কালীকুমার ভট্টাচার্য, মাতা বামাসুন্দরী দেবী।

গ্রীষ্ম শহরে ‘ওরিয়েন্টাল’ নামে একটি ক্ষুদ্র প্রকাশন সংস্থা নির্মাণের মাধ্যমে প্রকাশনা অচেনা ভগতে কৃপেশচন্দ্রের প্রথম প্রবেশ (১৯৩৬)। মাত্র দশবছরের মাঝায় পেশভাগ হয়ে যাওয়ায় অনেকের মতো তাঁকেও এই বাঙলার পাড়ি জমতে হয়। সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হল ‘ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড’ গৌহাটি ও শিলচরে। কলকাতায় প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি আগে থেকেই ছিল। কারণ সে সময় পূর্ব বাঙলা কিংবা আসামে বইপত্র ছাপানো বা বাঁধাই-এর বিশেষ উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। কাজগুলি কলকাতা কেন্দ্রে থেকেই করা হত। সেই সঙ্গে ছিল বিক্রয়ের ব্যবস্থাপনা। ক্রমে কলকাতাই হয়ে ওঠে কৃপেশচন্দ্রের স্থায়ী বাসভূমি এবং প্রকাশনার প্রধান কার্যালয়। ১৯৬৭ সালে বারানসীতে ওরিয়েন্টালের শাখা স্থাপন করেন হিন্দী ভাষায় বই প্রকাশের জন্য। ‘ওরিয়েন্টাল’ মূলত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম অনুযায়ী উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশের পীঠস্থান হওয়ায় আধুনিক ও ক্লাসিক সাহিত্য প্রকাশনার জন্য কৃপেশচন্দ্র ‘সাহিত্য বিহার’ নামে একটি সমান্তরাল সংস্থা গড়ে তোলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ও বিচিত্র বিষয়সম্ভারে ক্ষুদ্র এর গ্রন্থ তালিকা।

সেই ১৯৩৬ সালে যে অচেনা প্রকাশনা ভগতে ভীকু পায়ে প্রবেশ করেছিলেন পরবর্তী আট দশকব্যাপী সে ভগতে কৃপেশচন্দ্রের দৃঢ় ও নিশ্চলবিত্তারী পদচারণা স্নায়বিক বিষয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কোনও অহঙ্কার বা আত্মত্তরিতা ছিল না। তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতালব্ধ সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বভারতের প্রকাশনা ভগত নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশক সভার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা বা তারও আগে ১৯৭২ এ দিল্লীতে প্রথম বিশ্ব গ্রন্থমেলা আয়োজনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রকাশনা ছাড়াও সারাজীবন নানান সামাজিক ও জনহিতকর কাজে নিজে থেকে যুক্ত রেখেছেন নিঃশেষ আত্মদেতনায়।

‘একুশ শতাব্দী’ তার জন্মলগ্ন থেকেই কৃপেশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি নিজে একসময় ‘জনশক্তি’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন। স্বভাবতঃ যে কোনও প্রকাশনাতেই তিনি সমাদর করতে জানতেন। সততা, আত্মবিশ্বাস ও কর্তব্যনিষ্ঠা থাকলে মানুষ যে প্রতিফুল্লতা অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে কৃপেশচন্দ্রের জীবন তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গীয় প্রকাশক সমাজ হারিয়েছে তার অভিভাবক-প্রতিম আত্মজ্ঞান। ‘একুশ শতাব্দী’ হারাল এক গণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক। □

মহাভারত বিষয়ে হতাশ-কৌতূহলবশত প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণো', বইটি পড়তে গিয়ে, বেশি দূর এওতে না এওতেই— আমার মতো পল্লবগাহীদের মহাভারত বা মহাভারত সংক্রান্ত যেটুকু পড়াশুনা বা ভাবনা-চিন্তা তার ভিত্তিতেই— কিছু না লেখা ঠিক হবে না মনে হল। যত এগিয়েছি এ ধারণা তত দৃঢ়মূল হয়েছে। 'প্রাক্কথন'-এ শ্রীমতী বসু বলেছেন, 'আমার বক্তব্য নেহাৎ সরল, একজন সং পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া মাত্র, যা আমি পঞ্চাশ বছরেরও অধিক কাল ধরে বহন করে চলেছি।' সমগ্র বইটি পড়লে, আরও অসংখ্য স্ববিরোধীতার মতো, এই উক্তিটিকেও নিতান্ত স্ববিরোধী মনে হতে বাধ্য। উনত্রিশ বছর বয়সের পাঠ এবং ত্রীশ বছরের পাঠে মহাভারত বিষয়ে তিনি 'এক-বিশ্রান্তিতে পীড়িত।' কোনও গ্রন্থ, যাকে 'মহাগ্রন্থ' (তার নিজেরই ভাষাতে 'চিরন্তন মহাগ্রন্থ') বলে স্বীকার করা হচ্ছে, উনত্রিশ আর ত্রীশ বছরের পাঠে অনুভূতির কোনও পার্থক্য যদি না ঘটে তবে এ কথা বোধহয় বলা যায় যে হয় সে গ্রন্থটি 'মহাগ্রন্থ' নয়, অথবা সেই পাঠকের কোনও বিবর্তন ঘটেনি।

'ওধুমাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলায় অনূদিত মহাভারত' টাই কারও নির্ভর হওয়াটা অনুচিত না হতে পারে (যদিও, রাজশেখর এবং বুদ্ধদেব বসুও তিনি পড়েছেন বলেছেন) যদি পাঠটা সং এবং নিরপেক্ষ হয়। যদিও মহাভারত এবং মহাভারতের কাল সম্বন্ধে কোনও 'অসামান্য গ্রন্থ' (দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর প্রকাশক কন্যা দময়ন্তী, উৎসর্গপত্রে যার সম্বন্ধে শ্রীমতী বসু বলেছেন, 'যার জন্য এই বইয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে') রচনা করতে গেলে, 'তুলনামূলক ব্যাখ্যার জন্য অন্য কোনো পৌরাণিক পুঁথি বা আধুনিক নথিও আমি খঁচিনি বললে সেটা মেনে নিতে একটু কষ্ট হয় বই কী! বস্তুত এই বইটি সম্বন্ধে ঠিকমতো আলোচনা করতে গেলে আর একটি এই মাপের বইয়ে কুলোবে কী না সম্ভব।

ব্যাসদেবকে শ্রীমতী বসু যে ভাবে চিত্রিত করেছেন এবং নিজের কাহিনি রচনার ক্ষমতাকে যিনি নিজের প্রিয় পাত্র-পাত্রীদের (তাঁর মতে, প্রধানত বিদুর, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবাদি) অনুকূলে ব্যবহার করেছেন বলে তাঁর বিশ্বাস, সত্যিই তা হয়ে থাকলে, 'এতোগুলো কেনর কোনও জবাব দেননি ব্যাসদেব' বলে তিনি কি ওই রকম অভিযোগ করতে পারতেন? তাঁর হাতের কলমটিকে পাণ্ডব এবং পাণ্ডবানুকূলদের পার্থে বন্ধক রাখলে, শ্রীমতী বসু যে অভিযোগ করেছেন (বস্তুত, যে অভিযোগে নতুনও কিছু নেই) কৌরবদের প্রত্যেকটি 'যথান বীরকে পাণ্ডবরা অন্যায় যুদ্ধে নিধন করেছেন, তার দরকার হত কি? বাস্তবে আমরা দেখি, পাণ্ডবদের নিতান্ত মানবিক দুর্বলতাগুলোও কী নির্মমভাবে সেথিয়েছেন বৈপায়ন! যুধিষ্ঠিরের অস্ত্র দ্যুতাসক্তি, কার্যোদ্ধারে অর্ধসত্য উচ্চারণ এবং এ সবার পরিণাম কোনও কিছুই আড়াল করেননি মহাভারতের রচয়িতা। ভীম, অর্জুন পর্যন্ত সময় বিশেষে কী নির্মমভাবে গালাগালি করেছেন যুধিষ্ঠিরকে তাঁর দুর্বলতাগুলোর জন্যে (পাশাফেলায় হারার পর ভীম তো একবার যুধিষ্ঠিরের হাতই পোড়াতে' যাচ্ছিলেন, অর্জুন নিবৃত্ত করেন অনেক বুকিয়ে সুকিয়ে!)! পঞ্চপাতী হলে যুদ্ধশেষে আপাত-সফল চরিত্রগুলোর পরিণতি অমন ট্রাজিক হতে পারত তাঁর হাতে? হতে পারত কি কৃষ্ণ ও ভীম যদুবংশের ওই দুগতি?

বিদুরের প্রতি কী অন্ধ আক্রোশ শ্রীমতী বসুর! শেষ বয়সের নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে যার বিদুর

চরিত্র লেখার ইচ্ছা ছিল সেই নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীকে পূর্বেই তা লিখতে হয়েছে এ কথা বলেছেন তিনি তাঁর 'মহাভারতের ছয় প্রবীণ' গ্রন্থে। সৌজন্যবশত শ্রীমতী বসুকে তিনি বারবার বিদ্বৎকরেননি। কিন্তু বৃকতে অসুবিধা থাকে না 'মহাভারতের মহারণ্যে' তাঁকে কী ভীষণভাবে পীড়িত করেছে! সবচেয়ে বেশি করে যেটা তাঁকে বেজেছে তা হল শ্রীমতী বসুর শব্দপ্রমাণকে অতিক্রম করা। আত্ম পর্যন্ত মহাভারতের কোনও টীাকার, ব্যাখ্যাকার বা সমালোচক বা নাকী করেননি তা করেছেন এই 'ব্রাহ্মমনিরী লেখিকা' একটি উপন্যাস রচনা করে। কিন্তু সমস্যা হল, এটি উপন্যাস হলে তবু তো না হয় এসব খানিকটা মেনে নেওয়া যেত, এটা তো 'Interpretation of Mahabharata'!

দুর্যোধনের জন্মক্ষণে নানান অশুভ সংকেত দেখা দিলে ধৃতরাষ্ট্রকে সেই পুত্র ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন বিদুর— একথা উল্লেখ করেছেন শ্রীমতী বসু। অথচ সমবেত ব্রাহ্মণরাও যে একই পরামর্শ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে তিনি রইলেন নীরব। এই অনুসন্ধানের গুরুত্ব কম নয় এই কারণে যে সেই কালে রাজ্য দরবারে ব্রাহ্মণদের গুরুত্ব কতখানি ছিল তা আমাদের অজানা নয়। কৃষ্ণের সর্বময় প্রভাবের অন্যতম কারণও ছিল তাঁর ব্রাহ্মণমান্যতা (সাধে কী আর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের পদপ্রস্থালনের ভার নিয়েছিলেন!) ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু পরে স্বীকার করেছিলেন, 'আমি নিতান্ত দুর্মতি, হিতকাম মহাত্মা বিদুরের হিতবাক্য না শুনে আজ শোকে দম্ব হচ্ছি। মনমতি দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করবার কথা বিদুর বারবার বলেছেন, পাশাখেলা নিবারণ করতে বলেছেন। দীর্ঘদর্শী বিদুরের কোন কথাই শুনিনি। পাশাখা, দুর্যোধনেরই অনুবর্তন করেছিলাম। তারই ফল ভোগ করছি।' এ তো প্রায় শেবদিকের (অশ্বমেধ পর্ব) কথা, সেই সভা পর্বে পুত্র দুর্যোধনকে বলছেন ধৃতরাষ্ট্র, 'হে গান্ধারীপুত্র, পাশাখেলা থেকে বিরত হওয়াই উচিত। বিদুর এটা অনুমোদন করেন না। মহাবুদ্ধি বিদুর কখনও আমাদের অহিত কথা বলবেন না, এটা নিশ্চিত। মহাজ্ঞানী বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে শাস্ত্র (নীতি ও রাজধর্ম) উপদেশ দিয়েছিলেন, মহামতি বিদুর তা সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন।' মহাভারতের চরিত্রাবলী গ্রন্থানুসার বৃদ্ধদেবের বইয়ে (মহাভারতের কথা) উদ্ধৃত জার্মান পণ্ডিতের (Johann Jakob Meyer) লেখা যে অংশটির কাছে তাঁর গ্রন্থনামটির জন্যে কণী শ্রীমতী বসু সেখানে যে বলা হয়েছে, '...আর সেই সঙ্গে থাকেন ত্যাগ পরায়ণ বনরী, যার দৃষ্টি জগৎসীমান্তের উর্ধ্বলোকে সংহত, এবং যার ভাবনা বহির্বিষয়ের ও তাঁর অন্তরাত্মার গভীরতম স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে...' তা কিন্তু বিদুরকেও মনে করিয়ে দেয় (শ্রীমতী বসুর পুরো বইটিতে অবশ্য এমন কোনও চরিত্র প্রায় দেখাই যায় না)।

যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে তিনি যখন একাধিকবার বলেন যে এমনকী বউটিও নিজের ক্ষমতায় অর্জিত নয়, ছোট ভাইয়ের অর্জন ভোগ করা, তখন তাঁর একবারও মনে পড়ে না যৌষেয়-জ্ঞাননী দেবিকার কথা যিনি স্বয়ংবর সভায় যুধিষ্ঠিরকে বরণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, চিত্রাঙ্গ দ সূতা তাঁর স্বয়ংবর সভায় দুর্যোধনের সামনে উপস্থিত হয়েও তাঁকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছিলেন তখন কর্ণসহায়ে তাঁকে হরণ করে দুর্যোধন বিয়ে করেছিলেন। এও মনে পড়ে না যে যুধিষ্ঠির খুব স্পষ্ট ভাবায় বলেছিলেন যে মা অজ্ঞতাবশত যা বলে ফেলেছেন (পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করে খাওয়ালাপ উক্তি) তা মানার কোনও প্রয়োজন নেই, কৃষ্ণ শুধু অর্জুনেরই থাকবে এবং সেখানে অর্জুনেরই ধর্মপুত্রকে উপেক্ষা করে মাতৃ-আজ্ঞাই শিরোধার্য করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

শ্রীমতী বসু ভীমকে বিধ খাইয়ে হত্যা করার দুর্যোধন প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত লঘু করে দেখাবার আশ্রয় চেষ্টা করেছেন (১৫২ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে 'রটানো হয়েছিলো'ও বলেছেন

তিনি) ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রতি ভীমের অত্যাচার বারবার উল্লেখ করে। কিন্তু বিভিন্ন বাঙ্গালীড়ায় ভীমের কাছে পেরে-না-ওঠা দুর্যোধনাদির প্রতি সর্বাপেক্ষা বলবান ভীমের অত্যাচার ছিল অমিত বলশালী সরলস্বভাব এক বালকের আমোদের খেলা ছাড়া। বালকদের মধ্যে এসব দুর্লভ নয়। দুর্লভ যেটা তা হল : ঐ পুরাঙ্ঘা (দুর্যোধন) ভীম সেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে সান্ত্বিত্য উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, “কুন্তীর মধ্যম-পুত্র কুকোদর বলবান, বিক্রমশালী ও শৌর্য্যযুক্ত; এই পুরাঙ্ঘা একাকী আমাদিগের শত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাভ্য করে; অতএব যখন ভীম পুরোদ্যানে নিম্নিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গদায়া নিক্ষেপ করিব, তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া অনার্য্যাসেই সমাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব।” (এ উদ্ধৃতি কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ থেকেই) এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে ভীমকে বিধি ঋতুয়ানোর পিছনে যুধিষ্ঠিরকে রাজত্বের অধিকার দেওয়ার ভয় কাজ করেছিল দুর্যোধনের— বিদুর এ কথা বলার প্রেক্ষিতে শ্রীমতী বসু মন্তব্য করেছেন, “বিদুরই সকালের নিকট ধর্মের স্বরূপ। বিদুরের সেই ছদ্মবেশ সকলের কাছেই অপ্রাপ্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গটা কেউ তোলেননি, দুর্যোধনের প্রতিপক্ষ তো ভীম নয় যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরকে মারবার চেষ্টা না করে ভীমকে করা হ’ল কেন?” এমনকি ধৃতরাষ্ট্র বা ভীষ্মের কাছেও যে ছদ্মবেশ অপ্রাপ্য শ্রীমতী বসু তা বরতে পারার জন্যে ধন্যবাদ। যাইহোক, এই প্রসঙ্গটির উত্তর কিন্তু খুবই সহজ। দুর্যোধনের কাছে সিংহাসনের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ যুধিষ্ঠির হলেও, যে লড়াইয়ের ময়দান পরিণে সে সিংহাসনে পৌঁছাতে হবে সেখানে প্রবল প্রতিপক্ষ অবশ্যই ভীম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমের ভূমিকা তার জাঙ্ঘল্যমান প্রমাণ।

কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তিনি অজ্ঞত অভিযোগ করেছেন এবং কৃষ্ণের অনেক কাজ যে বলরাম মেনে নিতে পারেননি তা খুব গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করে একরকম আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। এই সময়ে তাঁর একবারও মনে হয়নি যে যাদবদের অনেকেই চেয়েছিল কৃষ্ণ রাজা হোন। কিন্তু তার বিরুদ্ধ এক পক্ষ আছে জেনে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যাতে গড়গোল না হয় তাই বৈমাত্রের ভাই— বসুদেবের বড় ছেলে বলরামকেই তিনি রাজা করলেন। বলরাম জানতেন যে কৃষ্ণের সৌজন্যেই তিনি রাজা। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, বলরাম কৃষ্ণের বুদ্ধি বিবেচনাকে খুব মর্যাদা দিতেন, মান্য করতেন, তাঁর কিছু কিছু ব্যাপার প্রথম প্রথম ঠিকমত মেনে নিতে না পারলেও।

কংসের স্ত্রী পিতা জরাসন্ধকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে প্ররোচিত করলে জরাসন্ধ যখন ভীষণ আক্রমণ চালাতে শুরু করলেন, না পেরে যাদবদের মণ্ডুরা থেকে দ্বারকায় পালাতে হল। কিন্তু শুধু এই কারণেও নয়, জরাসন্ধ বাধে অন্য কারণও ছিল, জরাসন্ধ যাদের জন্যে কৃষ্ণকে দায়ী করার সময় শ্রীমতী বসু যা উল্লেখ করেননি। সেই সময়ের ক্ষত্রিয় নীতির তোয়াক্কা করেননি জরাসন্ধ। তাঁর অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল। জরাসন্ধের কারাগারে প্রায় শতখানেক রাজা কিন্তু তখন বলির প্রহর গুণছিল! জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বে কৃষ্ণ কাতর প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর কাছে সেই সব রাজাদের মুক্তি দেওয়ার জন্যে। জরাসন্ধ-বধের ফলে তাঁরা প্রাণ এবং স্রুতরাজ্য ফিরে পেয়েছিল। আর জরাসন্ধের ছেলে সহস্রবাক অভয় দিতে বসানো হয়েছিল পিতার সিংহাসনে!

কৃষ্ণের শিশুপাল বধেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন শ্রীমতী বসু। পাতবসের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্কের মতো, যাদবদেরই এক মেয়ের ছেলে চেদীর রাজা শিশুপালের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক তেমনই। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক গোঁয়ার শিশুপাল ছিলেন কৃষ্ণের ভ্রাতানক পক্ষ এবং কংসের সহযোগী। যদিও অতিথি শিশুপালকে ওইভাবে মারা মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়। তবুও দু-একটি কথা থাকে। শিশুপালও যেন ভুলেই গিয়েছিলেন যে

তিনি সেখানে অতিথি। অতিথির মর্যাদা তো রাখলেনই না, উপরন্তু তীত্বকেও করলেন অপমান। 'কৃষ্ণ শিশুপালকে এমনি মারেননি, তাঁকে না মারলে রাজসূয় যজ্ঞের শেষ বড় খারাপ হত। শিশুপালকে মড়প ধেকে রাগের ভরে বাইরে যেতে দেওয়া ঠিক হত না,' বলেছেন ইরাবতী কার্তে। রাজ্যের রাজ্যের বিবাদ থেকে রক্তপাত ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারত, এক শিশুপালকে হত্যা করে তা এড়ানো হয়েছে। ভাছাড়া, কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান না করে আর কাকে তা দেওয়া যেত তা জানাতে শিশুপাল যে ভাবে যে সব নাম উল্লেখ করেছিলেন (বসুসেব ফ্রপদ থেকে দ্রোণ-ম্যাস-ভীষ্ম, এমনকি দূর্যোধন অশ্বখামা-কর্ণ-কর্ণ-শল্যও) তা থেকে তাঁর একটা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল— উপস্থিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদেরকে আরও আরও বড় করে দেখিয়ে নিজের দলে (মতোও বটে) টানা এবং বিপরীতে, কৃষ্ণকে আরও ছোট করে দেখানো। স্বীকৃত তালিকার শিশুপাল অবশ্য নিজের নামটি রাখেননি। তবে তো নিজের খাওয়ার ইচ্ছা হলে পাশের পাতে আরও দেওয়ার কথা বলার মতো ব্যাপাশা? যাইহোক, এর পরে কিন্তু কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের স্বপক্ষে তীত্বের যুক্তি (প্রধানত কৃষ্ণের শাস্ত্রজ্ঞান ও শক্তি সম্বন্ধীয়) শ্রীমতী বসুর বিশ্লেষণে সে ভাবে এল না। এল না কারণ তাঁর বক্তব্য 'তীত্বকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করানো হয়েছে কৃষ্ণ মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও ইনিই ঈশ্বর।' অর্থাৎ তীত্ব পুরোপুরি পরের মুখে ঝাল খেয়েছেন। নৃসিংহপ্রাসাদের কাছে 'তীত্বের এই বিশ্লেষণটি' কিন্তু 'স্বই মূল্যবান' মনে হয়েছে (পুস্তক : মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ, আনন্দ পাবলিশার্স)।

শ্রীমতী বসু লিখেছেন, 'কৃত্তী বললেন, পাছু তাঁকে বলেছিলেন, ক্ষেত্রবিশেষে কানীন পুত্র, অর্থাৎ কুমারী জীবনেরও যদি কোনো পুত্র বর্তমান থাকে সেই পুত্রও প্রয়োজনে পতির পুত্র হিসেবেই গ্রহণযোগ্য হয়। কৃত্তীর ভাষা, পাছু পুত্রাকাজক্ষী হয়েছিলেন।' এর পরে শ্রীমতী বসুর প্রশ্ন যে কৃত্তীর তো কুমারীকালের পুত্র কর্তৃ ছিল এবং কর্তৃ কোন পিতামাতার কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে তাও কৃত্তীর জানা ছিল, তাহলে সে কথা পাছুর কাছে না বলে গোপন করলেন কেন? উত্তরে তিনিই দিয়েছেন, 'বিদুরের সঙ্গে সংগত হয়ে যে তিনি আরো একটি অবৈধ সন্তানের জন্মদায়ী হয়েছেন, নিশ্চয়ই সেই সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার ভয়ে। তদ্ব্যতীত, কর্তৃকে প্রকাশিত করলে কর্তৃই হবেন জ্যেষ্ঠ। বিদুরের রাজ্যের পিতা হবার সাধ তাহলে সমূলেই বিনষ্ট হয়ে যায়।' বিদুরের মতো মানুষ নিঃশব্দে কখনওই যে সেটা মনে নেবেন না তাও তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী কার্তে বলেছেন, 'নিজের কুমারী অবস্থায় জন্মানো সন্তানের পরে কী হয়েছিল, সে বেঁচে আছে কী না, এই কথা কৃত্তীর জানা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে কুমারী অবস্থার কথা তিনি পাছুকে বলেন নি, এতে বিশ্বাসের কিছু নেই।' আমার কিন্তু অন্য কথাও মনে হয়। যে কারণে কর্তৃকে জন্ম দিয়েও সন্তান হিসাবে কাছে রাখতে পারেননি সেই লোকলজ্জার জন্যে আজও তিনি তা প্রকাশ করতে পারলেন না এবং আজ আর এক বাপ-মায়ের বুক খালি হওয়ার ভয় যে তাঁকে পেয়ে বসেনি তা-ও ভাবার কোনও কারণ নেই। তার উপর সেই সন্তান (যার পক্ষে অভিমানী হওয়াই স্বাভাবিক) আবার কৃত্তী-পাছুর কাছে সানন্দে চলে আসবে সে বিষয়ে কৃত্তী নিশ্চয়ই নিশ্চিত হতে পারেননি (পরে সত্যিই চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু কর্তৃ আসেননি)।

মহাভারতের ভাষা অনুযায়ী, অজ্ঞাত বিবাহিত জীবনে কৃত্তী অসতী ছিলেন না। কোন পরিস্থিতিতে কত বিধা-ধ্বংস-মোলাচল, যুক্তি-তর্ক প্রাসঙ্গিক কাহিনি-বর্ণনা ইত্যাদির পরে তবে পাছুর ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের আদেশে কৃত্তীর রাজি হতে হয়েছিল তা মহাভারতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর শ্রীমতী বসু যে বলেছেন, 'ধারণা হয়, যে দুটি সন্তানকে তিনি (কৃত্তী) মাতৃর সন্তান বলে পরিচয় দিচ্ছেন, সে দুটিও তাঁর।'—আমাদের কিন্তু তা

মনে হয় না। এমনিতে তো কুড়ীর যুক্তি ছিল যে শাস্ত্র অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রীবনে আপত্যকালে, স্বামীর আদেশে হলেও, চতুর্থ পর পুরুষে উপগত হলে তাকে দ্বৈরিনী (পঞ্চমে বেশ্যা) বলে তাই কুড়ী পাভুকে মাত্রীর কথা বলেছিলেন এবং মাত্রীরও স্বাভাবিক কারণেই সন্তান ধারণ ইত্যাদির সাধ ছিল।

আর একটা সম্ভাবনার কথা শ্রীমতী বসু ভাবতে পারতেন। তা হলে স্বামী সম্ভোগস্পৃহা তৃপ্ত করতে এবং সন্তান দানে অক্ষম আর বড় সতীন কুড়ী অন্যভাবে সে সব মিটিয়ে নিচ্ছে দেখে বয়সে আরও তরুণী মাত্রীরও বাসনা জেগেছিল একইভাবে তৃপ্ত হতে এবং সন্তানবতী হতে। মহাভারতের গল্পটি কিন্তু এদিকেই বরং পা বাড়িয়ে আছে।

এখানে কিন্তু একটা গ্রাসনিক কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে কেন্দ্রজ সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সম্ভোগস্পৃহা তৃপ্ত করার কোনও সুযোগই ছিল না। যে কারণে কেন্দ্রজ সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত নিয়োজিত পুরুষকে শাস্ত্রবিহিত দীর্ঘ আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষে দধি, লক্ষ ইত্যাদি সারা গারে মেখে উপগত হতে হত কেবলমাত্র চরম উদ্দেশ্যটুকু সাধন করতে। সেই থাকত অসম্ভবরকম পিচ্ছিল এবং সময় সুযোগ পরিবেশ সমস্তকিছুই থাকে স্বাভাবিক মিলনের বিপরীতে।

দুর্যোধনাদির জন্ম প্রসঙ্গে শ্রীমতী বসু যে বলেছেন, ‘অনুমিত হয় গান্ধারী যখন পেটে টিউমার নিয়ে দু’বছর অসুস্থ ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তখনই বিভিন্ন রমনীসঙ্গ করে এতোগুলো মানবসন্তানকে পৃথিবীতে এনেছিলেন।’— তা অনেকটা বাস্তবিক। বিশেষত যখন মেধি দুর্যোধনের পরেই জন্ম হয় যুবুৎসুর— যিনি কীনা এক দাসীর গর্ভজাত যে দাসী গান্ধারীর গর্ভধারণ কাল জুড়ে ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করেছিলেন। কিন্তু এখানে কাল সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। গান্ধারীর গর্ভাধান থেকে দুর্যোধনাদির জন্ম চার বছর লেগেছিল বলে মহাভারত বলেছে (কলসীতে মাসেপিভ ভাগ করার পরে আরও দু’বছর ধরে)। আর সব ক’টি পুত্র-কন্যা জন্মায় এক মাস ধরে। ধরা যায় কিঞ্চিদধিক তিন বৎসরে ধৃতরাষ্ট্র মিলনে যারা গর্ভবতী হয়েছিলেন এক মাসের মধ্যে তারা সকলেই তাঁদের সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। সেটা ঋনিকটা অতিকল্পনা। তার উপরে প্রম জ্ঞাপে, ধৃতরাষ্ট্র তার পরে আর কারও সঙ্গে কি মিলিত হননি? অথবা মিলিত হলেও তাঁরা কেউ আর গর্ভবতী হয়ে সন্তান জন্ম দেননি! এটা আরও অতিকল্পনার নামান্তর। মহাভারতে কাল নিরূপণ অবশ্য মাঝে মধ্যে বেশ কঠিন। সুবময় ভট্টাচার্য যে হাজার হাজার বছরকে এক এক বছর হিসাবে বরায় কথা বলেছেন তা স্থান বিশেষে খুবই কাল্পনিক।

শ্রীমতী বসু যে বলেছেন, ‘দুর্যোধনের মাতা কে তা যেমন আমরা জানি না, মনে হয় দুর্যোধনও জানেন না। অতএব স্বাভূত্রেই, পিতৃস্নেহ, দুই-ই তাঁর নিকট প্রায় শূন্য।’— তা অন্যত্র (অসতর্কভাবে সম্ভবত) দুর্যোধন সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি ‘পাপাত্মার মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন’ (পৃঃ-১৪৩) তার দিকে কিন্তু এগিয়েই থাকে। নামে শতপুত্র, গান্ধারীর অধিকাংশ পুত্রই তো নামেমাত্র। আর কুড়ীকে দেখুন। জন্মের আগেই তিনি দত্তা শূর সেনের গৃহ থেকে তাঁর পিসতুতো ভাই কুড়ীভোজের গৃহে। একটু বড় হলে কাজ নির্দিষ্ট হল কী না— নানান মন ও মেজাজের পুরুষদের সেবায় তৃপ্ত করা। সেই পালক পিতা বিয়ে দিলেন এক অসম্পূর্ণ পুরুষের সঙ্গে। কিন্তু প্রয়োজন যখন পড়ল, একান্তমনা হয়ে কুড়ী কিন্তু আহ্বান করলেন রূপে-গুণে জ্ঞানে-গরিমায় পরমাকাঙ্ক্ষিত সব পুরুষদের (সেলিট্রিট?)।

যাচিগ্রন্থতার কারণে পাছ স্ত্রী-সন্তোগে অপারগ ছিল (কিনক-মূনির শাপ সংক্রান্ত কাহিনির আধুনিক ব্যাখ্যা) ধরে নিলে এ কথা কি বলা যায় না যে নিজের শারীরিক

অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে কামোদ্ভূত হয়ে স্ত্রী-সংসর্গ করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ও ঘরোয়া ফলেই পান্ডুর মৃত্যু হয়েছে। এর পিছনেও বিদুরের হাত আবিষ্কার করতে হল! অন্যত্র আবার তিনি ধরে নিতে চেয়েছেন পান্ডুর স্বাভাবিক মৃত্যু। আশ্চর্য, যে বিদুর পূণ্যার্থ্যরূপে গণ্য হয়ে এসেছেন এতকাল তাঁর নিকে পান্ডুর গুপ্তহত্যার মতো অভিযোগের আঁড়াল তোলা যায়, আবার পান্ডুর মৃত্যুকে স্বাভাবিক হিসাবেও ধরে নেওয়া যায়।

আর সাক্ষী প্রমাণ লোপের প্রসঙ্গে আমাদের মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে স্বামীর সহমৃত্যু হওয়ার জন্য মাতীর কাছে কুস্তীর সেই প্রার্থনা, 'আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্মফল আমারই প্রাপ্য; অতএব আমি পরলোকগত ভর্তার সহগমন করিব, তুমি এ বিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না, তুমি গাহোখান কর। অতি সাবধানে এই সকল সজ্জনতালি প্রতিপালন করিও। আমি মহারাজের মৃতসেই লইয়া চিতারোহণ করি।' তার পর, আমরা জানি, মাতীর পান্টা বলিষ্ঠ যুক্তি এবং আত্মিক কাছ থেকে পরাজিত হতে হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের উক্ত উদ্ধৃতি ছাড়াও, পতি বিয়োগে কুস্তীর কান্না সম্বন্ধীয় উদ্ধৃতিটিও গুনুন: কুস্তী মাতীর বচনানুসারে কুমারগণকে রাখিয়া একাকিনী 'হা হতোষি' বলিয়া রোদন করিতে করিতে ওখায় গমনপূর্বক সেবিলেন, মাতী রাজার মৃতসেই আলিসন করিয়া ভূমিতলে শয়না আছে। তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাতীকে সম্বোধন করিয়া...। নাকি, এক্ষেত্রেও শ্রীমতী বসু ব্যাসের চক্রান্ত আবিষ্কার করবেন, অথবা প্রস্তুত ঘোষণা করবেন এই অংশটিকে! সবচেয়ে চতুর স্ত্রীলোকও কিন্তু একটু কাঁদবেন— সত্যিকারের কান্না না হলেও এই সময়। এমন একটি বিষয় নিয়ে শ্রীমতী বসু কেন অযথা মিথ্যা অভিযোগ করলেন। অন্যত্র অবশ্য স্বামীর মৃত্যুর পরে কুস্তীর কান্নার কথা একটু উল্লেখ করে তিনি ঘটনাটিকে সাজানো আখ্যা দিয়েছেন।

ওখু স্বামীর ভুলতু চিতায় আরোহণকে 'সহমরণ' বলা হলে সহমরণ শব্দটির প্রতি সুবিচার করা হয় তো? মৃত্যুর সড়েরো দিন পরে পান্ডু ও মাতীকে চিতায় তোলা হয় বলে নাকি এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে মাতী সহমৃত্যু হননি। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে স্বামীর মৃতসেই আঁকড়ে মাতী প্রাণত্যাগ করেন। এটাকে সহমরণ বলা যাবে না। আর মহাভারতের কালে সহমরণ প্রথা চালু ছিল না বলেছেন শ্রীমতী বসু। আমার তো মনে হয় প্রথা হিসাবে চালু না থাকলেও সহমরণ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না— ইচ্ছা হলে কেউ কেউ সহমৃত্যু হতে পারত। শ্রীকৃষ্ণের একাধিক স্ত্রী কিন্তু সহমৃত্যু হয়েছিলেন।

বাণ-ভাইয়ের ঘোষণা সত্ত্বেও— কর্ণ যখন ধনুতে বান যোজনা করে প্রস্তুত হয়েছেন তখন ভেসে— ওখু জাত তুলে শ্রীপদীর কর্ণকে নিরস্ত করাটা ওখু অসম্ভবই নয়, অন্যায়ও। কিন্তু কর্ণ যখন বলেন, 'সেবতারী স্ত্রীলোকের এক ভর্তাই বিধান করেছেন। শ্রীপদী সেই বিধি লঙ্ঘন করে যখন অনেক ভর্তার বশবর্তিনী, হয়েছেন, তখন ইনি বারম্বার। সুতরাং সভামধ্যে আনয়ন, বা বিবসনা করা, মোটেই আশ্চর্যের কিছু নয়' (উদ্ধৃতি শ্রীমতী বসুর পুস্তকানুসরণ)— তখন বরাবর নারীর সপক্ষে কলন ধরা প্রতিভা বসু (বসন্ত, নারীর যে নিতান্ত মানবিক দুর্বলতাও কিছু কিছু থাকতে পারে তা তাঁর ওই জাতীর লেখাগুলি পড়লে মনে হয় না) তার মধ্যে কিছুমাত্র প্রতিবাদের দেখলেন না। শ্রীপদীর প্রথম অন্যায়টি স্বরণ করিয়ে দিয়ে এটিকে সমর্থন করলেন। শ্রীপদীকে সেই সভায় 'দাসী' 'বেশ্যা' ইত্যাদি সম্বোধন, মৃশাসনকে শ্রীপদী ও পান্ডবদের কাণড় ঝুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার মধ্যেও শ্রীমতী বসু কর্ণের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু দেখলেন না। প্রসঙ্গত একটা কথা উল্লেখ্য। যুদ্ধের সময় কর্ণ ও অর্জুনের বীরত্বের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীমতী বসু বলেছেন যে যুদ্ধের কনিয়ায় এটা স্পষ্ট ছিল যে কর্ণ হেরে যাবেন না, জয়ী হ'লে কৌরবদের রক্ষা

করতে পারবেন। কর্ণের বীরত্বকে ছোট করে দেখার কোনও সুযোগই নেই। অসাধারণ বীর কর্ণ। অর্জুনের সঙ্গে টঙ্কার দেওয়ার মতো ক্ষমতা ধরেন তিনি। যাইহোক, তুলনামূলক অভ্যাসি বর্ণনার সময় শ্রীমতী বসু কিন্তু একবারও স্বরণ করেননি যে পূর্বে একাধিকবার কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে না পেয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন!

মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলো যে দ্বন্দ্বদীর্ঘ— বর্ম ও অধর্মের আগাত ও বৃহত্তর মঙ্গলের, আদর্শ ও বাস্তবের, আর যে কারণে চরিত্রগুলোর আজও এত জীবন্ত এত বাস্তব, আশ্চর্য, শ্রীমতী বসুর বিশ্লেষণে চরিত্রগুলোর সেই দ্বন্দ্বই প্রায় উধাও। যাইহোক, বীকার করতে বিধা নেই যে বইটিতে বাস্তবসম্মত ভালো কিছু মূল্যায়ন প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু তার অনেকটাই আমরা আগেই পেয়েছি বিভিন্নজনের লেখায়। সে সব বেশি আলোচনা না করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বাভাবিক কারণে তাঁর সঙ্গে ধর্মতের বিষয়গুলি একতরফা ভাবে আমাদের উল্লেখ করতে হয়েছে বেশি করে। □

সুপ্রসন্ন পুরকায়স্ট

একালের আবোল তাবোল □ মৃত্যুঞ্জয় কুহু □ অ্যাকিউরেসি □ ৩৫ টাকা

সুকুমার রায় স্টু কালজরী আবোল তাবোলের ছন্দচ্যুত্ব অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় কুহু একালের আবোল তাবোল কাব্য সাহিত্য কাব্য রসিকদের উপহার দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের non sensical verse এর ধাঁচে সুকুমার তাঁর অধিতীম চিরায়ত আবোল-তাবোল রচনা করেছিলেন। অতঃপর তাঁর রস বাস কৌতুকপ্রিয় পথ ধরে আরও কিছু ছড়া কবিতা রচিত হয়েছে। আলোচ্য কবিতা গ্রন্থটি সুকুমারের অনবদ্য ছড়া কবিতাগুলির অনুরণন। এই গ্রন্থের কিছু কিছু কবিতা সুকুমার স্টু চরিত্র বা আচরণের প্রলম্বিত সংস্করণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ‘হাসজ্ঞান সূত্রে’ পাত্রী কেমন? বৃদ্ধের কলের সংস্করণ ইত্যাদি। একালের আবোল তাবোল সুকুমারের অনবদ্য উপস্থাপন সীমিত বর্তমান যুগের বিভিন্ন সমস্যা, সভ্যতাভিনাশী মানুষের সামাজিক আচার আচরণ, ক্রম ক্ষয়মান মূল্যবোধ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের কণ্টাকার ইত্যাদি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রীকুহু অত্যন্ত সরস বাস কটাক্ষের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর অনবদ্য কয়েকটি কবিতা— টিভির ততো, দাদাবাবু, মন্ত্রীমশাই, সবজাভা, চাই চাই, শেয়ানে শেয়ানে, বুড়িয়ে চলা, ধর্মের বর্ষ, চেকবই, মিনিবাস ইত্যাদি। বিষয়বস্তুর পরিধিও ব্যাপক। নবীন, প্রবীন, সকলেই এই কবিতাগুলো পড়ে ও আবৃত্তি করে মজা পাবে।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বরাবরই ছন্দে স্বচ্ছন্দ। তাঁর কবিতাগুলিতে অপূর্ব শব্দচয়ন ও ধ্বনিবৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে। ফলে এগুলি একের পর এক পড়ে যেতে হয়। বিষয় বৈচিত্র্য ও ছন্দ বৈচিত্র্যে কবিতাগুলির আকর্ষণ অব্যাহত থাকে— এক ধ্যেয়মির ক্রান্তি আসে না। এখানেই শ্রীকুহুর সার্থকতা। প্রখ্যাত কার্টুনিষ্ট শ্রীচন্দ্রী লাহিড়ীর প্রচ্ছদ ও কবিতাপ্রতী হৃদয়ঙ্গমের চানটোন বইটির আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে। প্রিয়জন বৈভাঙ্গনের হাতে তুলে দেবার পক্ষে এটি একটি চমৎকার উপহার। পাঠকমহলে সুকুমারের আবোল তাবোল কৃষ্টিলালিত এ বইটির সনাদর হবে এমনটি অবশ্যই আশা করা যায়। □ আদিত্য কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রী

প্রতীপ কুমার রক্ষিত তাঁর Memoirs of An Indian Civil Servant পুস্তকটিতে তাঁর আই. এ. এস. পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ প্রশাসক পদে কার্যরত অভিজ্ঞতার স্মৃতিভাষ্য থেকে নানা তথ্য ও তত্ত্ব পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক স্বীকারোক্তি করেছেন যে তাঁর বিষয়বস্তু কোনও নির্দিষ্ট সিনপট্রী পরম্পরায় আসেনি। শুধুমাত্র স্মৃতিরোমহূন ভিত্তিতে তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি আই. এ. এস. হিসাবে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অর্জিত অভিজ্ঞতাই তাঁর স্মৃতিচারণে স্থান পেয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কার্যকালে বিভিন্ন বরোয়া নেতৃবৃন্দ ও আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে তিনি যে ধ্যান ধারণা অর্জন করেছেন এবং তাঁদের বিষয়ে কিছু কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা “ককে জানিয়েছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁর জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ছোতি কসু, বর্ধমানের মহারানী রাধারানী মহতাব, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ প্রমুখ। বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছে— তাঁদের কর্ম বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারার পর্যালোচনাও তাঁর স্মৃতি চিত্রে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন উচ্চপদস্থ প্রশাসক প্রতিভাদের মানসিকতা, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, কিছুটা বা ইর্ষাপ্রসূত রেবারেবির আভাস তার বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থটি একদিকে যেমন প্রাক্তন বা আধুনিক প্রশাসকবৃন্দের যথেষ্ট আগ্রহোদ্দীপক হবে তেমনি আবার সাধারণ পাঠক সরকারি দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের ব্যাপক কর্মকান্ড, দায়দায়িত্ব ও পারস্পরিক মানসিকতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন। পুস্তকটির আলোচ্যবিষয় মুখ্যতঃ কর্মজীবন ভিত্তিক হলেও লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতা সাবলীলভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখনীতে আত্মীয় বন্ধনের স্নেহমমতা এবং তার নিজেদের কর্তব্যবোধ সব কিছুই তিনি বিবৃত করেছেন। বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার প্রশাসন দায়িত্বে অত্যন্ত কর্মরত ব্যক্ততার মধ্যেও তিনি উন্নয়নমূলক কিছু সামাজিক কাজও করেছেন। তাঁর আত্মকথনে আমরা তাঁর সাহিত্য ও মনোরঞ্জক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহের পরিচয় পাই। তিনি নিজে বিভিন্ন ন্যাট্যাভিনয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাভিনয় করেও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। পুস্তকটিতে কয়েকটি আলোকচিত্রে রক্ষিত দম্পতির ন্যাট্যাভিনয় ও সামাজিক মিলনোৎসবের চিত্রও সংশ্লিষ্ট আছে। সাধারণত উচ্চপদাভিষিক্ত প্রশাসকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিভা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। পাঠক অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন সম্ভবত ত্রীরক্ষিত এই সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কাজের গুরুদায়িত্বভার কিছুটা লাঘব করতে পারতেন।

স্মৃতিচারণে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বর্ণনায় আবগেতাড়িত হয়ে কিছুটা পুনরাবৃত্তি ও অতিরিক্তন দ্বারা রচনাত্মক ভাৱাক্রান্ত করেছেন। গ্রন্থ বর্জন রীতিতে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিমার্জিত হলে পুস্তকটি আরও আকর্ষণীয় হতে পারত। পরিশেষে আর একটি কথা। চাকুরিজীবনের স্মৃতি ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক ঘটনা অভিজ্ঞতা তাঁর রচনার আওতায় রয়েছে। সূত্ররূপে পাঠক তাঁর কাল্য কৌশল ও ছাত্রজীবনের ঘটনা বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হতেই পারেন। একজন কৃতি প্রশাসকের পঠন পাঠন পদ্ধতি, নিজেদের সফলতার পথে এগিয়ে নেওয়ার প্রকৃতি পর্বের কিছু তথ্য স্থান পেলে পুস্তকটি আরও মনোগ্রাহী হতে পারত। □

অমিত্য কুমার মুখোপাধ্যায়

একুশ শতাব্দী ৬৩

আমাদের কথা

■ হৃদয় আমার প্রকাশ হল অন্যর আকাশে : ১১ জুলাই ২০০২ পাঁচটায় বাংলা আকাশেমির জীবনানন্দ সভাঘরে 'গান ও কবিতা : আন্তঃসম্পর্ক' এই পর্বায়ে আলোচনার অংশে সেন দিলীপকুমার মিত্র, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও প্রতুল মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিল 'একুশ শতাব্দী' সহ 'সুইনহো সিটে', 'সৃষ্টিকোণ', 'সহস্রধারা', 'চন্দ্রমাস', 'কবোক্তা' ও 'ড্রাবা একাডেমি ইন্ডিয়া'। গানে ও কবিতায় ছিলেন শুভেন্দু মাইতি, মীরা গোপালকৃষ্ণ, অঞ্জি কামাল নাসের ও কৃষ্ণ মল্ল। বরচিত কবিতা পাঠ করেন প্রব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত, ভাপস রায়, চিত্রা লাহিড়ি, নমিতা চৌধুরী, গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বজিৎ রায়, ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, মেঘালিস চট্টোপাধ্যায়, অতীশচন্দ্র ভাওয়াল, পাপড়ি ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর বাগচি। আবৃত্তিতে তিতু রায়, স্বপন সরকার ও জয়িতা দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কৃষ্ণা বসু ও বিশ্বজিৎ রায়। আয়োজক সাগর বিশ্বাস - ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়।

■ আছে দুঃখ আছে মুক্তা বিরহ মধন লাগে : ৮ আগস্ট ২০০২ ক্যাম্পাসটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট বেসমেন্ট হলে পাঁচটার আরোহিত হর কবি কমলেশ চক্রবর্তী স্বরণ সন্ধ্যা। 'কবিতার মুক্তা চেতনা' বিষয়ে আলোচনা করেন আলোক সরকার, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার মিত্র ও উত্তম দাশ। কবিতা পাঠ করেন এই সময়ের ব্যারোজনে কবি। আবৃত্তিতে কল্যাণী সাহা, এরা চন্দ ও স্বাসাচী কসু। অনুষ্ঠান সংযোজনা— ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, আয়োজক-সাগর বিশ্বাস।

■ কবিতার কুলো ওড়ে সারা রাত্রি মনের ভিতরে : ৩ ডিসেম্বর ২০০২ পাঁচটার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সত্ত্ববতম জন্মদিন উপলক্ষে বিরাটের তরুণ সেনগুপ্ত স্মৃতি ভবনে আরোহিত কবিতা সন্ধ্যায় কবিতা পাঠ করেন অরুণাভ দাশগুপ্ত, অর্পূব কব, বাসব দাশগুপ্ত, অতীন্দ্র মল্লমদার, রায়াল পুরকারহ, আত মুখোপাধ্যায়, শংকর সরকার, অমলেশ্ব বিশ্বাস, শিখা ঘটক, সুমিত্রা দত্তচৌধুরী, মনসী সরকার, উত্তম দত্ত, সমীর সেন, অমিত চক্রবর্তী, অমর আলীব দত্ত, সুবোধ ভৌমিক, প্রমুখ। শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেন সাগর বিশ্বাস ও মিহির সেন। একটি কবিতা আলোচ্য 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' উপস্থাপন করে আবাসা সংস্থা, পরিচালনায় সোমেশ নাথ। অনুষ্ঠানটির আয়োজনে ছিল একুশ শতাব্দী, ভরাংশ, অতএব ভাবনা ও উত্তর বন্দন সংকৃতি পরিষদ। সঞ্চালক প্রবীর ভৌমিক ও রূপম ভৌমিক।

■ উত্তর শহরতলী লিটল ম্যাসাজিন মেলা : ৭-৮ ডিসেম্বর ২০০২ কেলঘরিয়ার ঐকতান ক্লাব গ্রাসনে অনুষ্ঠিত এই মেলার আলোচনা, গান, কবিতা, ছড়া, আবৃত্তি, গল্পপাঠের আসর ছিল বিবেক আকর্ষণীয়। প্রথম বার্ষিক এই মেলার উদ্বোধনা সংস্থার (পত্রিকা) মধ্যে ছিল একছোট, অতএব ভাবনা, ক্রন্দসী, একুশ শতাব্দী, বালার্ক, আলোচনা চক্র, মীলালোহিত, সাংবাদিক নাট্যকথা, প্রথমত, দুর্বার, সুহাসিনী, কবিতা ব্যারোমাস, আজকের কাদশরী ও কলাকা।

■ প্রতি বছরের মতো এবারও উনিশে মে (২০০৩) 'একুশ শতাব্দী' পত্রিকা দপ্তরে মাতৃভাষা (বাঙলা) আন্দোলনের শহীদ স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হল। অথবা বিশ্বাসের কঠমস ১তে সূচিত এই সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে একভাষা ও বহুভাষাবিশিষ্ট দেশে মাতৃভাষার অবস্থানগত পার্থক্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক অনিমেবকাতি পাল। কবি কৃষ্ণা কসু জাতীয় জীবনে মাতৃভাষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা আবেগ-ভঙ্ক ভাষায় তুলে ধরেন। পরে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করেন সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়িতা দাশগুপ্ত। নির্বাচিত রবীন্দ্র সমীত পরিবেশন করেন নখিতা কুহু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন এরা চন্দ।

■ সম্ভ্রতি 'একুশ শতাব্দী' www.sristi.sandhan.com. ওয়েবসাইটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

With best compliments from

OPPORTUNITY

for developing your skill in speaking English in

THE ENGLISH CONVERSATION CENTRE

Near the Navadarsha Community Hall
Birati, Kolkata - 700 051

Your Guide will be an experienced teacher recently returned from London after 20 years of service in U. K. Please contact for application and admission

Mrs. T. Purkayastha

H-12, Navadarsha, Birati, Kolkata-51, Ph : (R) 2512-7082

N. B: Admission for course, starting in April/May

প্রকাশিত হল

সাগর বিশ্বাসের নির্বাচিত নিবন্ধ সংকলন

সময়ের শব্দ

মূল্য ৬০ টাকা

নবপত্র প্রকাশন

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Ekush Shatabdi

A Distinctive Bengali Periodical □ R. N. 68099/96

191-8 □ No. 1-2 January-June 2003 □ Rs 10

একুশ শতাব্দী

‘মাতৃভাষা বাঙলাভাষা’ সংখ্যা

লিখেছেন

অনিবেশকাঙ্গি পাল □ তরুণ সান্যাল □ এষা দে □ মৃণাল নাথ □
পরিতোষ পালচৌধুরী □ হোসেনুর রহমান □ বিজ্ঞানবিহারী পুরকায়স্থ □
হিতেন ঘোষ □ কানু আইচ □ নীতীশ বিশ্বাস □ সুমিত্রা দত্ত □ সাগর বিশ্বাস

‘নজরুল-জীবনানন্দ’ সংখ্যা

লিখেছেন

সুমিত্রা চক্রবর্তী □ অনিবেশকাঙ্গি পাল □ প্রভাত কুমার দাস □ বিজ্ঞান চৌধুরী
□ প্রদীপচন্দ্র বসু □ হুম্মাদ বসু □ সাগর বিশ্বাস □ বাঁধন সেনগুপ্ত □
মাহবুব হাসান □ আজিবুল হক □ মজিদ মাহমুদ □ কৃষ্ণা বসু □
ওত্থান রায়চৌধুরী □ তারাপদ আচার্য □ উদয়ন ঘোষ

‘তারারশঙ্কর’ সংখ্যা

লিখেছেন

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার □ অলোক রায় □ সুমিত্রা চক্রবর্তী □ সরোজ মোহন মিত্র
□ উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় □ তারাপদ আচার্য □ সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় □
পরিমল ঘোষ □ কাক্ষনকুন্ডলা মুখোপাধ্যায় □ সাগর বিশ্বাস □ কিম্বর রায় □
সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় □ কমল মমিন

কিছু কপি এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

প্রতি কপি ২৫ টাকা।

ডালিয়া রায় (সম্পাদিকা) কর্তৃক ইউ. এম. প্রিন্টার্স, ১১১, রাস্তা রামমোহন রায়

সরনি, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত ও এন ২১, নবাবদর্শ,

কলকাতা-৭০০০৫১ থেকে প্রকাশিত

সম্পাদক □ সাগর বিশ্বাস

বঙ্গ মতাব্দা

বর্ষ ৮ □ সংখ্যা ৩-৪ □ জুলাই - ডিসেম্বর ২০০৩

শতবর্ষে

প্রমোদ্র মিত্র □ সৈয়দ মুজতবা আলী

বইমেলা : অন্যদেশে

অনুবাদ গল্প □ ভীষ্ম সাহানি

চারটি ছোটগল্প

তেইশটি কবিতা

স্মরণের আবরণে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় □ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় □ কল্পতরু সেনগুপ্ত
ভবেন শাইকিয়া □ বিমল কর □ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় □ শিশিরকুমার দাস
ধনঞ্জয় দাস □ ভূদেব চৌধুরী □ জগন্ময় মিত্র □ ভীষ্ম সাহানি
বইপত্র □ আমাদের কথা

With best compliments from

উত্তর দমদম পৌর-হাসপাতাল

এম. বি. রোড, বিরাটী, ফোন : ২৫১২-৫৪১৮

মাতৃসদন ও সকল প্রকার শল্য চিকিৎসা হয়

- এখানে E.C.G./U.S.G. করা হয়।
- সকল বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ সর্বসময়ে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করেন।
- জেনারেটর সহ সবসময়ে আলোর ব্যবস্থা আছে।
- স্বল্পমূল্যে I. O. L. ও Laparoscopic সার্জারি (চোখ/গলদ্রাডার) করা হয়।
- আধুনিক যন্ত্রাদি সহ আরও ২টি নতুন অপারেশন থিয়েটার চালু হয়েছে।
(Cardiac Monitor/Pulse Oximeter সহ)
- কেবিন সহ ৩৫টি বেডের পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল।
- সর্বসময়ের জন্য ডাক্তার ও নার্স থাকেন।
- হাসপাতালের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্যানেল অ্যানাস্থেসিস্ট আছে।
- ন্যূনতম ব্যয়ে সাধারণের জন্য চিকিৎসার সুযোগ আছে।
- বর্তমানে মেরুদণ্ডের শল্যচিকিৎসা (Spinal Cord Surgery) করা হচ্ছে।
- সুলভে X-Ray ব্যবস্থা চালু আছে।

নিরঞ্জন নাহা

উপ-পৌরপ্রধান

উত্তর দমদম পৌরসভা

শচীন্দ্রমোহন সরকার

পৌরপ্রধান

উত্তর দমদম পৌরসভা

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ-৮ □ সংখ্যা ৩-৪ □ ২০০৩

(জুলাই—ডিসেম্বর ২০০৩)

সম্পাদক □ সাগর বিশ্বাস

সহযোগী □ মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, সুমিত্রা দত্তচৌধুরী

এন-২১, নবাবদর্শ

কলকাতা-৭০০০৫১

দূরভাষ □ ২৫১২-২০৬৪

একুশ শতাব্দী

সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৩০ টাকা, ডাকযোগে ৫০ টাকা। নতুন লেখকদের ভালো লেখা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হয়। লেখকেরা কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

কলকাতায় একুশ শতাব্দী পাওয়া যায়

পাতিয়াম বুক স্টল, কলেজ স্ট্রিট □ বুক মার্কেট, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট □ অমর পোদ্দার, তমসুক, বি. বা. দী. বাগ (টেলিফোন ভবনের বিপরীতে) □ প্রোগ্রেসিভ বুক স্টল, রাসবিহারী এভিনিউ □ রত্নাকর বুক স্টল (বিরটি স্টেশন)

আগামী সংখ্যা

জসীমউদ্দীন বিশেষ সংখ্যা

লেখক সৃষ্টিতে দুই বাঙলার বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বৃন্দ

With best compliments from

OPPORTUNITY

for developing your skill in speaking English in

THE ENGLISH CONVERSATION CENTRE

Near the Navadarsha Community Hall
Birati, Kolkata - 700 051

Your Guide will be an experienced teacher recently returned
from London after 20 years of service in U. K.
Please contact for admission

Mrs. T. Purkayastha

H-12, Navadarsha, Birati, Kolkata-51, Ph : (R) 2512-7082

একুশ শতাব্দী

(শ্রাবণ - পৌষ ১৪১০)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়-৫

প্রবন্ধ

সৈয়দ মুজতবা আলী : দেশের মানুষ, বিশ্বের মানুষ □ সুমিত্রা চক্রবর্তী—৬

প্রেমেন্দ্র মিত্র : সাহিত্যের সবাসাচী □ তরুণ দ্যানাল—১৭

বইমেলা : অন্যদেশে □ সাগর বিশ্বাস—২১

গল্প/অনুবাদ গল্প

মনিব এলেন নৈশভোজে : ডীপ্ত সাহানি □ প্রবীর মন্ডল—২৫

তার জোনার আমার উচ্চ আশা □ অভিজিত ঘোষ—৩১

সুজন বাদিয়ার কড়চা □ সুনীল দাস—৩৫

বদন চাঁদের মা □ ইভা বাসনবীল—৪১

সূর্যাস্ত □ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৫

কবিতা ৪৭—৫৯

বের্টোল্ট ব্রেখট/দিগন্ত দাশগুপ্ত • অনন্ত দাশ • শিবরত দেওয়ানজী • কৃষ্ণ বসু • শংকর চক্রবর্তী • শুভ্রত চক্রবর্তী • মনোজ নন্দী • অল্পন নায়েক • পীযুষ ধর • সুকুমার চৌধুরী দেবালিন চট্টোপাধ্যায় • নমিতা চৌধুরী • বিশ্বজিৎ রায় • কাশীনাথ দাশ চাকলাদার • সুমিত্রা দত্তচৌধুরী • রঞ্জন গুপ্ত • সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় • শান্তি বিশ্বাস • মধুসূদন মিত্রঘোষ • মিতা নাগ ভট্টাচার্য • মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় • অলোক কুমার হালদার • মানিকমাল মন্ডল

স্মরণের আবরণে ৬০—৭০

পুঞ্জিত নক্সপাত

(কল্পতরু সেনগুপ্ত/মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়/বিমল কর/অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়/ ভূদেব চৌধুরী/খনদ্রয় দাশ/শিশিরকুমার দাস/জগন্ময় মিত্র/ডীপ্ত সাহানি) □ সাগর বিশ্বাস

সুজন মুখোপাধ্যায় □ রাণা চট্টোপাধ্যায়

ভবেন শাহিকিয়া □ জগৎপতি সরকার

বইপত্র ৭১—৭৯

আব্বাসউদ্দিন/মাটির সুরের রাজা আব্বাসউদ্দিন □ অরবিন্দ পুরকাইত

একান্তে অতিমন্য/ যেখানে দাঁড়িয়ে/পালকের কথা □ মৃতাঞ্জয় কুহু

Survival in Danger/Dalits-Debates and Dynamics □ আদিত্য মুখোপাধ্যায়

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মুগাল দত্তর কবিতা □ প্রণব চট্টোপাধ্যায়

আমাদের কথা—৮০

প্রজ্ঞদলিপি □ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রিষড়া পৌরসভা

রিষড়া, হুগলী

চলুন বেড়িয়ে আসি

রিষড়া পৌরসভা পরিচালিত

হলিডে হোম

শৈলশহর দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং ও রাজসীর

সমুদ্রসৈকত পুরী

যোগাযোগ : রিষড়া পৌরসভা

ফোন - ২৬৭২-১৩৭৩

R M 80, 2003-2004

With best wishes from

A WELL WISHER

BANSDRONI • Kolkata

Chayan Udyog

Opp. Puspashree cinema
Borisha, Kolkata-8

এখানে সহজ কিস্তিতে বা ন্যায্য মূল্যে

বেতের চেয়ার, মোড়া, উপহার সামগ্রী,

কাঠের তৈরি খাট, চেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

গত সংখ্যায় ইরাক প্রসঙ্গে আমেরিকার আন্তর্জাতিক আইন ও যুদ্ধনীতির শান্তিবাদী নমুনার কথা লিখেছিলাম। যে মাসের প্রথম প্রত্যয়ে যুদ্ধের (বলা ভালো আগ্রাসনের) সমাপ্তি ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ যে স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন তা ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। ওটিকেই তাবদোর ছাড়া বৃহত্তর বিশ্বের কোনও দেশই আমেরিকার কথায় সৈন্য রফতানি করে “ইরাক পুনর্গঠন”-এর দায়ভাগ গ্রহণ করেনি। তাঁর পুতুল সরকারের প্রতি ইরাকের সাধারণ মানুষের ঘণা ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুনরুদ্ধারের জন্য ইরাকী জনগণ গেরিলা যুদ্ধের পথ গ্রহণ করেছে। প্রতিদিন গেরিলা আক্রমণে বিশ্বস্ত হচ্ছে বিদেশি সৈনিক ও সমর সত্তার। মাসের পর মাস এই ধারাবাহিক আক্রমণে বিপর্যস্ত মার্কিন সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রমশ হতাশার ছায়া ঘনীভূত হচ্ছে। সে ভয় মনোবল চাপা করার জন্য দায় প্রেসিডেন্টকে ছুটে আসতে হচ্ছে ইরাকে। আসতে হচ্ছে প্রতিরক্ষা সচিব র‍্যামসফেল্ডকেও। এ যেন সেই ডুইট আইজেনহাওয়ার কিংবা লিন্ডন জনসনের এবং রবার্ট ম্যাকনামারার ভিয়েতনাম পরিদর্শন। লাগামহীন অত্যাচার ও নাপাম বোমার মুশলধারা নিক্ষেপ করেও ভিয়েতনামে আমেরিকা শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ইরাকের সর্বশেষ পরিস্থিতি অনিবার্যভাবেই আমাদের ভিয়েতনামের কথা মনে করিয়ে দেয়। জাগ্রত স্বাধিকার ও দেশাঘ্রবোধের কাছে এভাবেই যুগে যুগে বহিঃশক্তি ও স্বৈরাচার প্রতিহত হয়। স্বদেশের প্রতি এই দায়বদ্ধতা তীব্রতর হলে, সাদ্দাম থাকুন বা না থাকুন, একদিন মানুষের জয় হবেই। এখন সাদ্দামের বিচার যারা করতে চাইছেন, তাঁদের বিচার হবে না? একুশ যুদ্ধাপরাধী সাদ্দাম, না কী বুশ ও ট্রেরার? দস্ত আর শক্তিমত্তা জর্জ বুশকে এতটাই বধির করেছে যে নিজের দেশের মানুষের কষ্টদ্বরও তিনি আর গুনতে পাচ্ছেন না। দেয়াসের লিখন দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা!

ঠিক এইখানটাতে এসে একবার স্বদেশের মাটিতে চোখ ফেলার ইচ্ছে লাগে। এই মুহূর্তে আসামে হিন্দিভাষী মানুষের উপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চলছে (বাঙলাভাষীদের নিরাপত্তা তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে)। কেন্দ্রীয় সরকার ভাবার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি পুনর্গঠনের পর যে ত্রিভাষা-সূত্র গিলিয়েছিল দেশবাসীকে, তার বাস্তব রূপায়ণ আজও হয়নি। পক্ষান্তরে একটি মাত্র ভোটে সরকারি কাজের ভাষা হবার অধিকার পেয়ে হিন্দি আজ রাষ্ট্রভাষার একচ্ছত্র জায়গাটি দখল করতে উদ্যত। তার উদ্ধত, আগ্রাসী চেহারা অনেক রাজা ও জনগোষ্ঠী বরদাস্ত করতে চায়না। উত্তর-পূর্ব ভারতে হিন্দি চলচ্চিত্র বন্ধ করার দাবি উঠেছে। দক্ষিণ ভারতেও একসময় অনুরূপ দাবি উঠেছিল। ভাষার প্রশ্নে দক্ষিণ ভারত আজও হিন্দির বশ্যতা মানতে নারাজ। ওথাপি আঞ্চলিক মাতৃভাষাগুলিকে দাবিয়ে রেখে দেশবাসীর টাকায় যেভাবে হিন্দি-পোষন চলেছে তা যেমন দৃষ্টিকটু তেমনই ভয়ঙ্কর। যেন এক নতুন সাজাজীবাদ, যার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই কোনও না কোনওভাবে মানুষের কষ্ট সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কষ্টদ্বর কেন্দ্রীয় সরকারের কানে পৌঁছায় না। এই প্রশ্নে সেও বধির। □

সৈয়দ মুজতবা আলী : দেশের মানুষ, বিশ্বের মানুষ সুমিতা চক্রবর্তী

সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা থেকে বার বার উঠে আসে সিলেট আর করিমগঞ্জ—যেখানে তাঁর জন্ম। তাঁর লেখায় মণিখন্ডের মতো জ্বল জ্বল করে বোলপুরের শান্তিনিকেতন—যেখানে তাঁর শিক্ষা কেবল নয় হয়ত বা তাঁর অন্তরের আলোক-উৎস, তাঁর গ্রাণের আরাম। সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখার পায়ে পায়ে আমরা ঘুরে আসি কাবুল থেকে জার্মানি—এই যাত্রাপথেই গড়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের নিরুপম মূর্তি। বাঙলা সাহিত্যে এমন শিল্পী সম্ভবত মাত্র দুজনই আছেন—সৈয়দ মুজতবা আলী আর অমিয় চক্রবর্তী। পর্যটক নন, দুজনকেই বলতে পারি ভ্রামণিক। ভ্রমণ তাঁদের চিন্তাধারার আশ্রয়। প্রকৃত ভ্রামণিক ভ্রমণের জন্য ট্যুরিস্ট স্পট খোঁজেন না। বহু দিন ধরে বহু ফ্রোশ ঘুরে, বহু দেশ ঘুরে যেমন তাঁদের চলা, তেমনই ঘরের পাশের ধানের শিসের শিশিরবিন্দুতে বিচিত্র সূর্যের আলো দেখেও তাঁদের আনন্দ। অমিয় চক্রবর্তী তিন পঙ্ক্তির একটি ছোটো কবিতায় লিখেছিলেন—

‘জগৎযাত্রী, গাছের তলায় বসে

চেয়ে সেখান থেকে ছোটো পুকুরের জলে—

সারা ভুবনের ভ্রমণের মন নিয়ে।’

(‘গ্রামে ফিরে, চলতি’, ‘ঘরে ফেরার দিন’)

ঠিক এই কথাটিই বলা যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে। কী নেই তাঁর লেখায়! পিরপঞ্জল-এর বরফে ঠান্ডা করা আঙুরের শুষ্ক থেকে করিমগঞ্জের মাটির দাওয়ায় সানকি ভরা পাড়া ভাত। কে নেই তাঁর লেখায়! জাহাঙ্গীর সিলেট খালসি থেকে হের হিটলার। অথচ এই বিশ্ব-যাত্রীর উপরে যেন বাঙালি মনের সজল, সরস, সবুজ উত্তরীয়টি পেতে দেওয়া হয়েছে।

আর, কী আশ্চর্য! অমিয় চক্রবর্তী আর সৈয়দ মুজতবা আলী—করোরই দেশ-ঘর ছিল না কলকাতা-দিল্লি-মুম্বাই-চেন্নাই। অমিয় চক্রবর্তী এসেছিলেন অসমের গৌরীপুর থেকে; আলী সাহেব এসেছিলেন সিলেটের করিমগঞ্জ (বর্তমানে অসম প্রদেশের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত) থেকে। এবং আরও কী আশ্চর্য! দুজনেই পৌঁছেছিলেন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রবৃন্দে। রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজ মনের মধ্যে ভেঙেছিলেন গ্রাম-দেশের সমস্ত বেড়া কিন্তু বিশ্বকে বিধিত করেছিলেন সেই বোলপুরের গ্রামটিতে—যার আসল নামটাই যেন প্রতীকী নাম—ভুবনডাঙা। সেই ভুবনডাঙা থেকে রবীন্দ্রনাথের যে কজন শিষ্য ভুবন-ভ্রমণকেই জীবন করে নিয়েছিলেন তাঁদেরই অন্যতম দুজন অমিয় চক্রবর্তী আর সৈয়দ মুজতবা আলী।

পিতার নাম সৈয়দ সিকান্দার আলী। মায়ের নাম আমতুন মাহান বাতুন। পিতার কর্মস্থল ছিল সিলেট জেলার করিমগঞ্জ শহরে, রেজিস্ট্রেশন বিভাগে। পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন

তিনি, খান বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন পরে। করিমগঞ্জেই জন্ম মুজতবা আলীর—১৯০৪ সালের শেষের দিকে।

বাজালি মুসলমানের মধ্যে খারাপ শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ তাঁরা জন্মসূত্রেই বিরল ধরনের এক ঐশ্বর্য-খন্ড, সমগ্রীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারেন। মাতৃভাষার সূত্রে হিন্দু পুরাণ এবং ধর্মীয় দর্শনের বিপুল ভান্ডার তাঁদের আয়তনের মধ্যে এসে যায়। নখাণ্ডে বিখিত হয় রামায়ণ-মহাভারত। আবার পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মীয় আচরণ-সূত্রে আরবি এবং ফারসি ভাষায় রচিত সুবিপুল সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত হয়ে যায় তাঁদের কাছে। মুক্ত মনের মুসলমান লেখকদের লেখায় ঝলকায় এক আশ্চর্য ইশ্রদ্ধা যা অনেকেই সারা জীবনেও একে তুলতে পারেন না মসীরেখার নকশায়। বাঙালি সাহিত্যে ভেতন উদাহরণ হাতের কাছেই আছেন দুজন— কাজী নজরুল ইসলাম এবং সৈয়দ মুজতবা আলী। উনবিংশ শতাব্দীর মীর মুশাফক হোসেনের নামও করা যায়। সাম্প্রতিক কালের আবঙ্গ জব্বার, সৈয়দ মুহাম্মদ সিরাজ আর আবুল বাশার-এর নাম করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হিন্দু বাঙালি লেখকদের ক্ষেত্রে এটা কম হয়। কারণ সাধারণত তাঁরা ইসলাম ধর্মের বই পত্রের হাদিস রাখেন না।

মুজতবা আলী সাহিত্যের টান জেনেছিলেন ছাত্র বয়সেই। ওমর খৈয়াম-এর রুবাইয়াৎ পড়লেন সেই সাহিত্যপ্রীতি থেকে। তখন সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে কাঙচিচন্দ্র ঘোষের করা ওমর খৈয়াম-এর কবিতার অনুবাদের সংকলনটি— প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা সহ। মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। মনোবৃত্তে স্থান করে নিলেন প্রমথ চৌধুরীও। সৈয়দ মুজতবা আলীর লিখনকর্মে যে দুজন বাঙালি সাহিত্যিকের হৃদয়, মনন এবং শিল্প-শৈলীর প্রতিসরণ লক্ষ করা যায়— তাঁরা রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী।

অতঃপর সৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন—
“মুজতবা আলীর ঝোঁক চাপল রুবাইয়াতের বিভিন্ন বাংলা ও ইরোজী অনুবাদ সংগ্রহ করার দিকে। সে ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ, উইল্ডকিন্ডের অনুবাদ, সত্যেন দত্ত ও কাঙচি ঘোষের অনুবাদ সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ত। পরবর্তী জীবনে নজরুল ইসলামের রুবাইয়াতের অনুবাদের এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সরস ভূমিকা লেখে।” (ভূমিকা পৃ. ক. সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১৩৮১, সপ্তম মুদ্রণ ১৪০৩)। এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি স্কুলের ছাত্র থাকার সময় থেকেই মুজতবা আলী কেবল সাহিত্যে অনুরাগী নন, হয়ে উঠেছিলেন একজন সাহিত্য-গবেষক। এই আর এক ধরনের বিরল সংশ্লেষ ঘটেছিল তাঁর মননে। সরস মনের এবং বৃদ্ধ জীবনব্যয়ের সঙ্গেই জ্ঞান আর মনীষার সমন্বয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ হল। এখানেও তাঁর পূর্বসূরী প্রমথ চৌধুরী। তবে যে হৃদয়ের সজলতা এবং অনুভবের স্নিগ্ধতা মুজতবা আলীর লেখায় পাই তা প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বে ততটা ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলন বাঁধভাঙা হয়ে উঠল ১৯২০-২১ সাল থেকে। মুজতবা আলী তখন সিলেটের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। প্রথম ইওয়া ছাত্র, কিন্তু নেমে পড়লেন ধর্মঘটে। পিতা সরকারি কর্মী। চাপ এল উপর-মহল থেকে। কিন্তু পিতার নির্দেশ অমান্য করলেন মুজতবা, স্কুলে ফিরে যেতে রাজি হলেন না।

তার আগে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ সিলেটে এসেছিলেন এবং একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ছাত্রদের কাছে। বিষয় ছিল 'আকাশকাক্স'। চোন্দো বছরের বিদ্যার মুক্ততবা আলী সকলকে গোপন করে একটি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। জানতে চেয়েছিলেন কেমন করে আকাশকাক্সকে মহৎ করে তুলতে হয়। সে চিঠির উত্তরও এসেছিল আশমানি রক্তের খামে ওই রক্তেরই কাগজে। অপ্রত্যাশিত সেই পত্র আলী পরিবারে বেশ আলোড়ন তোলে এবং মুক্ততবার মনে জাগায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ। আমাদের মনে পড়ে যায়, ফুলের ছাত্র অমিয় চক্রবর্তী প্রথমে 'ঘরে-বাইরে' পাঠ করে তারপর অগ্রজের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে।

সিলেটের উত্তম রাজনৈতিক আবহ থেকে তাঁর পিতা যখন পুত্রকে সরিয়ে নেবার কথা ডাবলেন তখন মুক্ততবা নিজেই শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তখন বিশ্বভারতী একটি বিশ্ববিদ্যালয় রূপে সবে মাত্র স্থাপিত হয়েছে ১৯১৮ সালে। তিনি বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে যোগ দিলেন বহিরাগত ছাত্র হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তখন শিক্ষক। বাঙলা এবং ইংরেজি কব্যা-কবিতা তাঁর কাছে পড়েছিলেন মুক্ততবা আলী। বিশ্বভারতীর একেবারে প্রথম যুগের ব্রাহ্মক তিনি। তারপরে কিছুদিন তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছিলেন।

জীবিকা সন্ধানের পালা যখন এল তখন হঠাৎ তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপনা করবার। এই সুযোগের মূলেও ছিল শান্তিনিকেতনের সংযোগ। শান্তিনিকেতনে তখন ছিলেন ফরাসি অধ্যাপক এফ. বেনোয়া এবং রুশ অধ্যাপক বগদানভ। এই দুজনেই যোগ দিয়েছিলেন আফগানিস্তানের শিক্ষা-বিভাগে। তখন আফগানিস্তানের শাসক আমানুল্লা খান। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুশিক্ষিত, আধুনিক মনোভাব সম্পন্ন আমানুল্লা খান আফগানিস্তানকে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ফলে ব্যাপক শিক্ষা-সংস্কার শুরু করেছিলেন দেশ জুড়ে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন অধ্যাপকদের। এই দুই পূর্ব পরিচিত অধ্যাপকের সাহায্যেই বিশ্বভারতীর তরুণ ব্রাহ্মক সৈয়দ মুক্ততবা আলী কাবুলে গিয়ে সে দেশের শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। তিনি পড়াতেন কৃষিবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে মানবিক বিষয় সমূহ। এ ঘটনা ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি। দুবছর কাবুলে থেকে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়। আমানুল্লা খান তখন ক্ষমতাচ্যুত। মৌলবাদী বাফাই সফও তখন কাবুলের বাদশা। শিক্ষা-সংস্কার বন্ধ। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েই দেশে ফিরে আসতে হয় তাঁকে।

এদেশে এসে কর্ম-সংস্থান করা কিন্তু একটু সমস্যাই হয়ে দাঁড়াল। বিশ্বভারতীর ডিগ্রি ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্বীকৃত ছিল না তখনও। মুক্ততবা বিদেশে গিয়ে অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসিত কোনো দেশেই বা খোদ ব্রিটেনে বিশ্বভারতী প্রদত্ত ডিগ্রি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হওয়া সম্ভব ছিল না। যে-কোনো দেশের স্বদেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিত জার্মানি। একদিকে প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের কাছে পরাজিত জার্মানির প্রশাসন 'ট্রিটিশ' নিয়মাবলি অনুসরণ করা আবশ্যিক মনে করেনি। দ্বিতীয়ত জার্মানিতে তখন বাদেশিকতার প্রতি, জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন ক্রমশ উগ্রতর হতে শুরু করেছে। মুক্ততবা আলী জার্মানির 'উইলহেল্ম হমবোল্ট' (Wilhelm Humboldt) নামক

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে একটি মাসিক বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৯২৯ সালেই জার্মানি চলে যান, তিনি প্রথমে জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হলেন। কিছুকাল পরে বার্লিন ছেড়ে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন এবং অর্জন করলেন পি-এইচ. ডি. উপাধি। সময়টি ১৯৩২। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল— ‘খোজা সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের বর্তমান ধর্মীয় জীবন’ (‘The origin of the Khozhas and their religious life to-day’। তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৯৩২-এ। সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান অধিকার করে আছে গ্রাক্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জার্মানি। তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি প্রধান পটভূমি জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চল (শহর ও গ্রাম) এবং তাঁর লেখার একটি প্রধান উপকরণ জার্মান সংস্কৃতি। হিটলার-কে নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন তিনি। যে কারণে অনেকে তাঁকে ফ্যাসিবাদ সমর্থক, বিশেষ করে হিটলার সমর্থক মনে করেছেন। এই বিষয়টির আলোচনার আমরা পরে প্রবেশ করব।

মুজতবা আলী জার্মানি থেকে ফিরে আসেন ১৯৩২ সালে। অল্প কিছুকাল পরে ১৯৩৪-এ আবার চলে যান জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ। তখনই তাঁর মনের ধর্ম হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সেই গান। তিনি তখন থেকেই সুদূরের গিয়াসী— ‘ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর— তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি’। মানুষের যে জানা নেই তা নিয়ে দুঃখ না করে সৈয়দ মুজতবা আলী কলকাতা এবং আকাশ যানকেই বিকল্প বেছে নিয়ে সেই বাঁশির টানে ঘর ও বাহির করেছিলেন সারা জীবন।

আবার তিনি চলে গেলেন ইউরোপ। সেখান থেকে মিশরের কায়রো শহরের সুপরিচিত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল লেখাপড়া করেন। এখানেও সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর মিল। তাঁদের দুজনের কাছেই সুদূরের আহ্বান কেবল ভূগোলের দেশ থেকে আসেনি, এসেছিল মানব সভ্যতার মীর্ষাকাল হয়ে সঞ্চিত সংস্কৃতির দেশ থেকেও অমিয় চক্রবর্তীর প্যালেস্টাইন ভ্রমণ স্মৃতি।

বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গাইকওয়াড় আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন তিরিশের দশকের শেষের দিকে। তিনি মুগ্ধ হলেন সৈয়দ মুজতবা আলীর পাণ্ডিত্যে ও ব্যক্তিত্বে। তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন স্বদেশে। শেষে ফিরে মুজতবা আলী বরোদার গেলে তখনই মহারাজা তাঁকে বরোদা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। আট বছর সেই পদে থেকে, মহারাজের মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। বরোদার থাকাকালীন আরবি ভাষায় গুজরাটের একটি ইতিহাস সম্পাদনা করতে শুরু করেছিলেন তিনি। সে কাজ শেষ করতে পারেননি।

কলকাতায় এসে তিনি প্রথমেই চলে আসেন তাঁর বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুবের কাছে। তাঁর সাহচর্যেই বাস করেন মীর্ষাকাল। রোগাক্রান্ত আইয়ুব দক্ষিণভারতের মদনাপট্টীতে গেলে মুজতবা আলীও তাঁর সঙ্গে যান। তখন তিনি কিছুকাল বাসালোরে বসবাস করেন।

ভারত স্বাধীন হল। সৈয়দ মুজতবা আলী বগুড়া কলেজের অধ্যাপক রূপে কাজে যোগদান করেন ১৯৪৯ সালে। কিন্তু প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রত্যাগী সম্পর্কিত একটি পত্রিকা তিনি প্রণয়ন করেছিলেন যেখানে বাঙালী ভাষাকে সমর্থন জানাবার জন্য তিনি প্রশাসন-কর্তৃপক্ষের বিরোধাজন হন। যদিও

১৯৫১ সালে রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তবু পূর্ব বাঙলায় তিনি থাকতে পারেননি, ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এদেশে চলে আসেন। রাবেয়া খাতুন অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং কর্মক্ষেত্রে উচ্চ সরকারি পদাধিকারী ছিলেন। তাঁদের দুই পুত্রও সুশিক্ষিত ও সৃষ্টিশীল। তাঁরা পূর্ব বাঙলায় থেকে যান এবং পরবর্তীকালে ও বর্তমানে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক।

দেশে ফিরে এসে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথমে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক সংযোগ (Cultural Relation) বিভাগের সেক্রেটারি পদে যোগ দেন। তারপর ভারতীয় বেতার বিভাগে যোগদান করেন। প্রথমে ছিলেন অল ইন্ডিয়া রেডিওর কটক স্টেশন-এর অধিকর্তা। তারপর চলে যান যথাক্রমে পাটনা এবং দিল্লিতে। সেখানেও ছিলেন বেতার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। শেষ পর্যন্ত আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি জার্মান ভাষার অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে বিশ্বভারতীর স্কলারশীপ সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। একেবারে শেষ জীবনে আবার কলকাতায় দানযাপন করেছিলেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর লিখন কর্মের শুরু মোটামুটি পরিণত বয়সেই হয়েছিল। মোহাম্মদী পত্রিকায় ১৯৩৫ সালে মিশরের শিক্ষায়তন বিষয়ে একটি প্রবন্ধের প্রকাশই সম্ভবত তাঁর প্রথম লিখিত লেখা হিসেবে সর্ব্বলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারপরই দ্রুত তিনি লেখার জগতে পরিচিত হয়ে ওঠেন তাঁর সরস প্রবন্ধ জাতীয় রচনাগুলির জন্য। সিলেট শহরে মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাঁর লেখার মধ্যে উচ্চমানের ফিচারের সমস্ত গুণ বর্তমান থাকায় দৈনিক সংবাদপত্রে ‘কলাম’ লেখার আমন্ত্রণ তাঁর কাছে আসে। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় ‘সত্যানীর’ এবং ‘টেকচাঁদ’ নামে তিনি ‘কলাম’ লিখেছেন। ‘রায় লিথেরা’ নামে লিখেছেন ‘হিন্দুস্তান স্টাভার্ড’ পত্রিকায়। ১৯৪৮ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘দেশে-বিদেশে’ লিখতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি।

সুপণ্ডিত এবং বহু ভাষাবিশ্ব সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখক পরিচয়টি সহজে উদ্ঘাটিত করা সম্ভব নয়। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অতি বিরল রসদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি এবং অত্যন্ত বিরল ধরনের জীবন-রসবোধের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চিন্তে। তিনি লিখতেন প্রধানত ফিচার জাতীয় লেখা। কিন্তু সে লেখার মনীষা এবং সাহিত্যগুণ এত স্বতন্ত্র, এত ব্যতিক্রমী এবং এত দূরপ্রসারী যে সেগুলিকে কোনো নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব। তাঁর গল্প আর ফিচার প্রায়শই একত্রে মিলে যায়; তাঁর ভ্রমণ কাহিনী আর উপন্যাসকে আলাদা করা দুঃস্থ। তাঁর ফিচারগুলি একই সঙ্গে ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, বিদেশ-বিবরণ আর জীবনের হাসি অশ্রুকে সংশ্লেষিত করা কাব্য। প্রতিটি লেখাতেই তিনি যয়ং নায়ক। তাঁর চোখ দিয়ে না দেখলে, তাঁর মন দিয়ে না বুঝলে সেই সব দেশ, সমাজ, মানুষকে বোঝা যাবে না। তিনি একজন নিরবচ্ছিন্ন গবেষক। তাঁর গবেষণার বিষয় হতে পারে জার্মান ভাষার ব্যাকরণ, স্যালাড সাম্রাজ্যের কৌশল, জাহাজি মণি-মাল্লা সারেং-ক্যান্টেনের জীবন অথবা রবীন্দ্রনাথের গান। বিশ্ব-সংস্কৃতির হেন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি না লিখতে পারেন এবং তাঁর কোনো একটি লেখাও এমন নয়— যাকে না বলতে পারি বিশ্ব-সংস্কৃতির মণি।

তিনি লিখেছেন ভ্রমণ-বিষয়ক অনেকগুলি লেখা ‘দেশে-বিদেশে’, ‘ডব্বুরে’, ‘জলে-

ভাঙায়' ইত্যাদি। এগুলির মনোই মিশে আছে এক-একটি ছোটো গল্প। বৈঠকি রীতির ছোটো গল্প 'চাচা কাহিনী' তাঁর অন্যতম পরিচিত সংকলন। 'দু-হাফা', 'শবনম', 'শহর-ইয়ার' ইত্যাদি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। লিখেছেন 'পঞ্চতন্ত্র' নামের গবেষণা-কিচাচ। এছাড়া লিখেছেন এই ধরনের বহু সংমিশ্রিত লেখা; তাদের সংরূপ-সংকলকে এখনও কোনো সমালোচক নির্দিষ্ট করেননি। তাঁর লেখায় বৈঠকি খোস গল্পের ধরনটি সর্বদাই যেন জীবন্ত হয়ে, হাত-পা নেড়ে, অথবা তামাক বা চুরট টানতে টানতে আমাদের সামনে তার বাচনকে মূর্ত করে তোলে। কোনো একটি লেখায় — যদি সে লেখা সাময়িক পত্রের জন্য একটি পরিমিত প্রবন্ধ হয়, তার মধ্যে দিয়ে তাঁকে হাকির করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুবিধে এই — তা করবার দরকার ও পড়ে না। কোন শিক্ষিত বাঙালি না পড়েছেন 'দেশে-বিদেশে' আর 'পঞ্চতন্ত্র' ? আমরা এই লেখায় তুলে ধরব তাঁর একটি মাত্র রচনাকে। সে লেখাটি মনে হয় বহুল পরিচিত নয়। সে লেখাটির নাম 'হিটলার'।

প্রসঙ্গত একটি কথা মনে এসে। হিটলারকে অবসন্ন করে সম্পূর্ণ একটি বই লিখে উঠেছেন বলে কারও কারও মুখে এমন কথাও শুনেছি— হিটলারের সমর্থক ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। হিটলারের প্রতি সমর্থন কোনো স্বাভাবিক মানুষ জানাতে পারেন না — কাজেই এই অসম্ভব অভিযোগের উত্তর দেবার চেষ্টা না করে বরং ভাবা যাক সত্যিই কেন হিটলারকে নিয়ে সম্পূর্ণ একটি বই লেখা ? এরকম কাজ কোনো বাঙালি লেখককে করতে দেখিনি আমরা, তা হলে কেন তা করলেন সৈয়দ মুজতবা আলী ? এর কারণ কেবল অনুমানই করা যায়। আমাদের অনুমান ব্যস্ত করছি এখানে। এই কাজটি তাঁকে করতেই হল কারণ তিনি বিশ্বের মানুষ। নিজের ঘোষণার জোরে নয়; স্বাবক-বন্ধুদের প্রচারের জোরে নয়, অন্তরের ধর্ম্যে। আর বিংশ শতাব্দির বিশ্বের এক ভয়ংকর, আন্তর্জাতিক ঘটনার নাম অ্যাডল্ফ হিটলার।

সৈয়দ মুজতবা আলীর মনের রসায়নে স্বচ্ছ মনীষার বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা আর হৃদয়বেগের সজল তারল্য মিশে আছে। যদি ব্যক্তিগতভাবে আমার মত জানতে চাওয়া হয়, আমি সেলাম দেব ওই মনীষার মননদীপ্ত চিন্তকরে। তাঁর নব্বু দর্পণে ছিল বিশ শতাব্দীর সভ্যতার সমস্ত দিক— রাজনীতি, সমাজনীতি, শোষণনীতি, দমননীতি, বাণিজ্যনীতি আর হৃদয়নীতি— সব কিছু সহ। এই বিশ শতকে তিনি চিরে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর প্রতিটি লেখায়। দেশ-গাঁয়ের পুকুরঘাটের কথা যখন লিখেছেন তখন বলতে ডোলেননি যে, সেই ঘাট বঁধানোর পরশা এসেছে দেশের ছেলেটির বিদেশে থাকা রোজগারের অংশ থেকে। যখন জার্মানির রেস্টুরেট ও জার্মানির ক্লাবের কথা লিখেছেন, সেখানে তাঁর দেশ-ঘরের মানুষ কেমন করে আড্ডা জমায়, আর কেমন করে, প্রবাসী বাঙালি জার্মান পরিবারের গৃহকর্তার মুখে খুঁজে পায় নিজের মায়ের মুখের প্রতিচ্ছায়া তা-ও দেখিয়েছেন। কিন্তু বিশ শতকের চরিত্র যে এই আন্তঃরাষ্ট্রিকতা তার মূলে আছে বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি ঘটনা আর কয়েকজন মানুষ। সেই ঘটনাগুলির মধ্যে প্রধান দুটি ঘটনা অবশ্যই দুটি বিশ্বযুদ্ধ। দুই বিশ্বযুদ্ধেই অপরিহার্য নাম জার্মানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই জার্মানি আর হিটলার অবিচ্ছেদ্য। হিটলার কে না জানলে কি জানা যাবে বিশ শতকের বিশ্বকে ? এ কোনো ব্যক্তিগত ভালো-সাগা মন্দ-সাগার ব্যাপার নয়। হিটলারের চরিত্রের উপাদানগুলির মধ্যে নিহিত আছে বিংশ

শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ভাবনার সমস্ত বিব, সমস্ত অহংকার, সমস্ত ভ্রান্তি। বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী, পণ্যবাদী, দস্ত-শব্দীত, আত্মসর্ব্ব রাষ্ট্র ও সমাত্র বিন্যাসের অনু-পরমাপুতলি কমবেশি মিশে আছে প্রতিটি রাষ্ট্রযন্ত্রের চালকদের চরিত্রে। হিটলারের চরিত্রে জন্মে উঠেছিল প্রতিটি উপাদানের সর্বাধিক ঘনত্বের নির্ধারক। সেই অর্থে হিটলার আধুনিক সভ্যতার অতন্ত শক্তির, অতন্ত ভাবনার ঘোলাটে বিষয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। তাই বিংশ শতাব্দীর বিশ্বকে যারা জানতে চাইবেন তাঁদের জানতে হবে হিটলারকে। সেই সঙ্গে লেনিন, স্তালিন, মুসোলিনি, চার্চিল, রুজভেল্ট, গান্ধি, শিকাসো, ইদি আমিন, মাও-সে তুঙ, হো চি মিন, ম্যাডেলাকে। এই মিশ্রণটাই বিংশ শতাব্দী।

সেই জার্মানিতে, যখন একবার নয়, বার বার যাবার সুযোগ ঘটল সৈয়দ মুজতবা আলীর, হিটলারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার ঠিক প্রাক-কালে, তাঁর ক্ষমতা দখলের ঠিক পরের বছর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগের বছর যখন জার্মানিতে যাবার সুযোগ ঘটলই তাঁর—তখন কেন তিনি সেই সুযোগকে কাজে লাগাবেন না? এভাবেই হিটলার সম্পর্কিত বই লেখা। বিশ্বচেতনার দাবিতে; ইতিহাসের অসুগি-হেলনকে বুকে নেবার চানে। ইতিহাসকে কেবল তার সুফল দিয়ে নয়, কুফল দিয়েও চিনতে হয়।

মুজতবা আলী প্রথম বার জার্মানি গিয়েছিলেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে — হিটলার তখনও জার্মানিতে সুপরিচিত নন। তিনি দেশে ফিরলেন ১৯৩২-এ, ১৯৩৩-এ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলার হলেন। এক বছরের জন্য ১৯৩৪ সালে আবার তিনি জার্মানি গেলেন। মুজতবা আলী লিখেছেন — “তখন হিটলার কিভাবে রাজ্য শাসন করেন সেটি পুরোপুরি দেখলুম।” আবার ১৯৩৮ সালে চার মাসের জন্য তাঁর জার্মানি যাওয়া। যুদ্ধের পরেও তিনি দুবার জার্মানি গিয়েছিলেন। কোন্ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি এই পরিস্থিতিতে নিজের অভিজ্ঞতাকে লিখিত রূপে স্থায়ী করে দিতে না চাইবেন! মুজতবা আলী লিখেছেন — বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি হিটলার সম্পর্কে ‘শত শত বই’ কিনেছিলেন।

ইতিহাসের পাঠক মাঝেই জানেন এমন গবেষক মাঝে মাঝেই দেখা দেন যারা কোনো এক জন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। আলেকজান্ডারকে নিয়ে, নেপোলিয়নকে নিয়ে, আকবরকে নিয়ে, রবীন্দ্রনাথ বা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এমন ছোট ও বড় গবেষকের সন্ধান আমরা পেয়েছি। হিটলারকে নিয়েও বহু অনুসন্ধান, বহু গবেষণা হয়েছে। লেখা হয়েছে বহু স্মৃতিকথা, বহু গ্রন্থ। সৈয়দ মুজতবা আলী হিটলার সম্পর্কিত কোনো তথ্যই নিজে আবিষ্কার করেননি। বস সত্যানের পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু তিনি বহু গ্রামাণ্য গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন সংস্কৃতির এক ঔপনিবেশিক দেশের মানুষের চোখ দিয়ে সেই আশ্চর্য মানুষটিকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালি পাঠকের জন্য তিনি রেখে গেছেন তাঁর নিজস্ব ধারণার নিদর্শিত ফসল।

পাঠক মাঝেই লক্ষ করবেন মুজতবা আলীর ভাষার অনবদ্য সরসতা এই লেখাটিতে ততটা অনুভূত নয়। আবার সাধারণ বাঙালি লেখকদের মতো প্রতি পদে ‘ফ্যানসিষ্ট হিটলার’, ‘নয়দানব হিটলার’ ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করে বালবিল্যি উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টাও তিনি করেননি। তাঁর ভাষা অনুশ্লিষ্ট, শান্ত, ঈষৎ পাপুরে এবং পক্ষপাত-বিহীন। যেন অনেকটা

যন্ত্রের চোখ, যেন যন্ত্রের নখি করণ। তাঁর ভাষা থেকে এটাও উঠে আসে— যে কথা ১৯৪০ সালে লিখিত ‘সংবর্ত’, কবিতায় লিখেছিলেন সুধীশ্রনাথ দত্ত—

“অচর প্রত্যহ ওনি চার্চিলের বেচ্ছাচার বিনা
অসাধ্য সাপ্রাজারক্ষা, অবার্থ প্রলয়,
এবং যে-যাক্ষিবত্ত সভ্যতার সম্মত আশ্রয়,
তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে
একা হিটলারের নিন্দা সাথে আত্ম বাধে কি বিবেকে?”

বিশ শতাব্দের সভ্যতায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে স্বরূপ ছিল তা অনেকটা উন্মোচিত হয়ে যায় হিটলারের জীবন ও কর্মের প্রতিবেদন থেকে। সেই কাজটাই করেছিলেন মুক্ততবা আলী।

উৎস-গ্রন্থ হিসেবে কয়েকটি বইয়ের নাম তিনি বিশেষভাবে করেছেন। তার মধ্যে প্রধান হল ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত ‘লাস্ট ডেজ অফ হিটলার’। ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক অনেক গভীর নীচে পঞ্চাশ ফুট কংক্রিটের ছাতের তলায় তৈরি হয় বাংকোর যেখানে কামান বা এরোপ্লেন থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা পৌঁছাতে পারে না। সেইখানে হিটলার শিশুদের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। পাশে ছিলেন তিন দিন আগে পরিণীতা, কিন্তু পনেরো বছরের বান্ধবী এফা ব্রাউন। তিনি আত্মহত্যা করেন বিধি বেয়ে। কিন্তু হিটলারের মৃত্যু নিয়ে শোনা গিয়েছিল কিছু পরস্পর-বিরোধী কথা। তাই হিটলারের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করার ভার দেওয়া হয় ইতিহাসের অধ্যাপক এবং যুদ্ধকালীন গুপ্তচর বিভাগের উচ্চ পদাধিকারী কর্মী ট্রেভার রোপার-কে। তিনি হিটলারের শেষ মুহূর্তের সঙ্গে যারা ছিলেন যারা তাঁকে শেষ মুহূর্তেও এক কলক দেখেছিলেন— যেমন বাগানের মালি, রাঁধুনি, কোনো কোনো প্রহরী, তাঁর অনুচরদের পঙ্কীরা— যত জনের সঙ্গে সম্ভব কথা বলে সাত মাস পরে তাঁর প্রতিবেদন জমা দেন। সেই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তারপর আরও কিছু কিছু তথ্য উদঘাটিত হয়। এইসব মিলিয়েই রচিত হয় রোপার-এর ওই গ্রন্থ ‘লাস্ট ডেজ অফ হিটলার’। তারপরে আরও অনেক লেখাই বেরিয়েছে এই বিষয়ে। কিন্তু অধ্যাপক রোপার-এর রচনার সঙ্গে মূলগত পার্থক্য তেমনভাবে কোথাও দেখা যায়নি। যুদ্ধের পর দশ বছর কারাবাস করে ১৯৫৫ সালে রাশিয়ার জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন হিটলারের কয়েক জন সঙ্গী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর নিজস্ব পরিচারক বা ডায়েল এবং নিজস্ব পার্শ্বচর। তাঁরাও এ বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যেও পরস্পর বিরোধিতা কম। কাজেই মুক্ততবা আলী কোথা থেকে তাঁর রচনার উপাদান পেয়েছিলেন তা তিনি স্পষ্ট করেই লিখে রেখে গেছেন আমাদের জন্য।

সৈয়দ মুক্ততবা আলীর লিখন-শৈলীর সুর থেকেই তাঁর একদিকে নিরপেক্ষ, অন্য দিকে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর অতি পরিভার ধারণার ছবি উঠে আসে। আমরা সেই লেখা থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করব। তিনি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এক বছর আগে ইউরোপের পরিস্থিতি কয়েকটি মাত্র ছত্রে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন—

“১৯৩৩-এ হিটলার চ্যানসেলর হলেন। ১৯৩৪-এ জার্মানির প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ মারা গেলে তিনি সে আসনটিও দখল করে দেশের ‘ফ্যুরার’ বা একচ্ছত্রাধিপতি ‘নেতা’ হন। পার্লামেন্টের আর কোনো স্বাধীনতা রইল না। ১৯৩৮-এ হিটলার স্বাধীন অস্ট্রিয়া রাজ্য (তাঁর আপন জন্মভূমি ওই দেশেই) দখল করে ‘বৃহত্তর রাইখের’ অংশ করে নিলেন। ওই বছরের

সেস্টে হয়েই তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মান-ভাষাভাষী অঞ্চল গ্রাস করতে চাইলে শান্তি ভঙ্গের ভয়ে ভীত ইংলন্ডের চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের দালাদিয়ে সে অঞ্চলটুকু তাঁকে লিখিত-পঠিত ভাবে দান করলেন। কয়েক মাস পরে হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার যে অঞ্চল তিনি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সেই টুকুও কাউকে কিছু না বলে-কয়ে গ্রাস করলেন। তখন চেম্বারলেনের কানে জল গেল— সেও পূর্ণমাত্রায় নয়। ১৯৩৯-এ হিটলার পোল্যান্ডের ভিতর দিয়ে জার্মান পূর্ব প্রাণা সংযুক্ত করার মানসে পোল্যান্ড রাজ্যের কাছে করিডর এবং অন্যান্য এটা সেটা দাবী করলেন। ইতিপূর্বেই জার্মান তথা বিশ্ববাসীকে সচকিত শঙ্কিত করে তিনি তাঁর জাত শত্রু জাতিদের সঙ্গে চুক্তি করে পোল্যান্ড ভাগ্যভাগি করে নিয়েছিলেন।”

এই অংশটি থেকে বোঝা যায় যে হিটলারের ভিন্ন দেশ গ্রাস করে নেবার অসংগত বাসনাকে যেমন যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন লেখক, তেমনই দেখিয়ে দিয়েছেন যে যতক্ষণ না নিজেদের স্বার্থে বড় রকমের আঘাত দেখা দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স হিটলারের এই ভিন্ন রাজ্যগ্রাসের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করতেই চেয়েছিল।

হিটলারের চরিত্রের গভীরে যতই প্রবেশ করা যায় ততই দেখা যায় যে তিনি খুব সুস্থ ও স্বাভাবিক মস্তিষ্কের মানুষ ছিলেন না। তাঁর আত্মপ্রাধান্য বোধের যে মাত্রা ছিল, জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে যে ধরনের বিশ্বাস ছিল — তাকে বাস্তববোধবিচ্ছিন্ন এবং উদ্ভ্রান্ত বলাটা ভুল নয়। হিটলারের পাশাপাশি যে মন্ত্রী-সেনাপতিরা ছিলেন তাঁরা ফ্যাসিবাদের নীতিতে বিশ্বাস করতেন একথাও যেমন সত্য — তেমনই সত্য যে কচিং কখনও তাঁরা বাস্তবোচিত পরামর্শ দিলেও হিটলার তা গ্রাহ্য করতেন না। অধিক পরামর্শ দিতে গেলে পরামর্শদাতার গ্রানডের আদেশ দিতে তাঁর মুহূর্ত মাত্র দেরি হত না। হিটলারের জীবনী-লেখকদের অনুসরণে মুক্তভাবে আলী লিখেছেন—“হিটলারের মেজাজটি ছিল আগুন গড়া। দুঃসংবাদ পেলেই চিংকার করে উঠতেন কর্কশ কণ্ঠে, চিংকারে চিংকারে তাঁর গলা ফেটে যেত, পাইচারি না — ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সবোৎসাহে ছুটোছুটি আরম্ভ করতেন, মুখ দিয়ে ফেনা বেরতে আরম্ভ করত এবং চোখ দুটো যেন কোটার থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইত।”

হিটলারকে তাঁর অনুচররা মিথ্যা সংবাদ দিতেন। কারণ “যাঁরা সত্য গোপন করেননি, তাঁদের মধ্যে যারা অশেষ ভাগ্যবান, তাঁরা সুদূর অপমানিত লালিত হয়ে বরখাস্ত হয়েছেন, অন্যরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, কারাগারে ফাঁসি যাচ্ছেন বা হিটলারের বাসসেনানীর চাবুকে চাবুকে জর্জরিত হচ্ছেন।”

মুক্তভাবে আলী বলতে ভোলেননি যে যখন মার্কিন-ইংরেজ বোমারু বিমান বার্লিন শহরকে ধ্বংসস্থলে পরিণত করছিল, তখন হিটলার কোনোদিন এক ঘণ্টার জন্যও বেরিয়ে এসে তাঁর কেশবাসীর পাশে দাঁড়াননি, “পক্ষান্তরে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মান বোমারু যখন লন্ডন লন্ডন করছিল তখন প্রায়ই দেখা যেত বিরাট সিগার মুখে চার্চিল সে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর জনসাধারণকে দুঃখের দিনে উৎসাহ দিচ্ছেন— আর তারাও বলছে, ‘আসুক না তারা। আমরাও আছি— শুড় ওশ্ড উইনি।’

মুক্তভাবে আলীর এইসব বিবরণ কখনই তাঁকে হিটলারের পক্ষপাতী রূপে নির্দেশ করে

না। কিন্তু সর্ব অর্থেই অ-পক্ষপাতী ছিলেন মুক্ততবা আলী। সে জনাই তিনি স্পষ্ট লিখে গেছেন যে হিটলার প্রকৃতিই মানুষ ছিলেন না। মানসিক অস্বাভাবিকতার সব লক্ষণই তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর মানসিক অবস্থাকে আরও খারাপের দিকে ঠেলে দেবার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মরেল-এর দায়িত্বও কম ছিল না। মরেল ছাড়া আরও কোনো কোনো চিকিৎসক হিটলারের সঙ্গে বাংকারে বিদ্যুৎকাল কাটিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই এবং আরও কেউ কেউ যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা থেকে যা জানা যায় তা লিখে গেছেন মুক্ততবা আলী— ‘হিটলার কার্যক্রম থাকার জন্যে— সামান্যতম সর্দিকানিতে পর্যন্ত তিনি ভয় পেতেন, এবং আসার লক্ষণ দেখতে পেলেই অবিচারে ইনজেকশন নিতেন— মরেলের কাছ থেকে উদ্ভেদনাদায়ক ওষুধ চাইতেন। মরেলও অবিচারে এমন সব ওষুধ আর ইনজেকশন দিতেন যেগুলো দিত সাময়িক উত্তেজনা কিন্তু আখেরে করত স্বাস্থ্যের অশেষ ক্ষতি। বুদ্ধির সাময়িকভাবে থাকাকালীন অন্য এক ডাক্তার টে. ম্যাগে হিটলারের চাকর লিডের ড্রয়ারে এসব ওষুধ শ্রু. রিমানসে’ পান ও বিশ্লেষণ করে দেখেন যে ওগুলোতে মারাত্মক বিষ রয়েছে, যেগুলো অতি অল্প ডোজে কঠিন ব্যামোতে দেওয়া হয়। অথচ মরেল ওগুলো লিডেকে দিয়ে রেখেছিলেন, হজুর যাতে যখন খুশী, যত খুশী এসব ট্যাবলেট খেতে পারেন।

আর ইনজেকশনের ভো কথাই নেই : লেকচার দিতে হলে পূর্বে ইনজেকশন, পরে ইনজেকশন। প্রকৃতি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করে, মরেল বা হিটলার সে সাহায্য নিতে চাইতেন না। ফলে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ও শেষ বয়সে নির্মমভাবে তার প্রাণ্য নেয়।

ডাক্তাররা যখন হিটলারকে এ তথ্যটি বললেন তখন তিনি রেগে টং। মরেলের উপর না, ডাক্তারদের উপর।

হিটলার তাঁদের অকথ্য অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য, মরেলের কড়ে আঙুলের যত এলুম এঁদের গুটির সব কটার মগজেরও তা নেই।”

হিটলারের চিন্তাধারা যদি অনুসরণ করা যায় তা হলে তিনি যে উদ্ভ্রাস ছিলেন তাতে বোধ হয় সন্দেহ থাকে না। কারণ নিজের ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনড় ধারণা, নির্বিকারে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে কেবল ভিন্ন সম্প্রদায়ের বলেই হত্যা করা, চতুর্দিকে শত্রু এবং বিশ্বাসঘাতক প্রত্যেক করা, অপরকে হত্যা করবার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা এবং আত্মহনন প্রবৃত্তি— এসবই উদ্ভ্রাসের লক্ষণ। আত্মহত্যার কয়েক দিন পূর্বে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন শত্রু সৈন্য দেখা দেওয়া মাত্র নদীর জল আটকাবার গেট যেন খুলে দেওয়া হয়। তাতে শত্রু সৈন্য মরত, সেই সঙ্গে মরত হাজার হাজার আহত জার্মান সৈনিক। কিন্তু তাতে মুস্কপ ছিল না হিটলারের। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন সামনে শত্রু সৈন্য দেখা দিলে শহরের যাবতীয় কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেতু— সব যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁর সরবরাহ-মন্ত্রী আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন— তাহলে যুদ্ধ শেষে জার্মান জাতি আবার নতুন করে দেশ গড়বে কেমন করে? বাঁচবে কী নিয়ে? হিটলারের জবাব ছিল— যুদ্ধে যখন জার্মানরা কৃশ সেনার কাছে হেরেছে তখন তাদের আর বাঁচবার অধিকার নেই। মন্ত্রী কিন্তু এ আদেশ পালন করেননি। হিটলার আদেশ দিয়েছিলেন চারিদিক থেকে অবশিষ্ট জার্মানদের সগিন এবং গুলির মুখে মর্দন করিয়ে জড়ো হতে বাধ্য করা হোক মধ্য-জার্মানির একটি অঞ্চলে। সেই

হানে বা যাওয়া আসার রাস্তায় থাকবে না কোনো ভুল বা খাবারের ব্যবস্থা। এ আদেশও পালিত হয়নি। হিটলারের জীবনীলেখকরা বলেছেন— তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গেই বিনষ্ট হয়ে যাক সমগ্র জার্মান জাতি। উন্মত্ততার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী হতে পারে?

এসবের পরে নিজের আত্মহত্যার অভিশ্রুতি এবং সম্পাদন খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু হিটলারের জাতি ধ্বংসের বাসনাটি আমাদের কাছে—বাঙালির কাছে খুব অচেনা লাগে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কেন ঘটেছিল মঘতর? জাপানিরা যদি আসে তা হলে তাদের বিপদে ফেলবার জন্য বাঙালার গ্রামে গ্রামে সব সেতু, সব নৌকো ভেঙে দেওয়া, বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া সঙ্কিত খাদ্য ভান্ডার— বাঙালার গ্রামের কৃষকদের জীবনধারণের এককিন্তুও না ভেবে সে আদেশ দিয়েছিল যে বা যারা সে তো— হিটলার নয়। সুসভা ইংরেজ! ব্যাসি বিরোধী মিত্র শক্তি। একথা দাগিয়ে দেননি মুক্তবা আসী। এই সমান্তরাল তুলনা এনে দেননি বাঙালির চোখের সামনে। কিন্তু যার ইতিহাস পড়া আছে তারই মনে পড়বে এই সমান্তরাল ঘটনা। অথবা আমরা কি বলব হিটলার স্বজাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। আর ব্রিটিশ প্রভু অনাহারে মারতে চেয়েছিল উপনিবেশের কালা আদমিদের! তাই হিটলার অ-মানব আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্র শক্তি মানব-সভ্যতার ভ্রাণকর্তা? এজন্যই সৈয়দ মুজতবা আসীকে বিশ্বের মানুষ এবং দেশের মানুষ বলে অভিহিত করেছি। তিনি বিশ্বদর্পণে স্বদেশকে হারিয়ে কেলেসেননি। দেশকে দেখেছেন আরও গভীরভাবে অনুভব করেছেন প্রকৃত নিরপেক্ষ সহর্মমিতায়।

বার বার সৈয়দ মুজতবা আসীর লেখায় এই প্রতিভা দেখতে পাই। জাহাজের খাপসি আর সারেঙদের মধ্যে তিনি দেশের মানুষকে খুঁজে পান বার বার। কয়েকবার চা-ব্যবসায়ী কুর্গ প্রদেশের কোদও মুখহানা হয়ে যান সিসেটি বাঙাল মুজতবার বড়ো ভাই। জার্মান পরিবারের জননীর মধ্যে নিজের মাকে খুঁজে পান তিনি। 'চাচা কাহিনী'-র গল্পগুলিতে জার্মানির 'ইণ্ডিয়া হৌস'-এ দেশের 'বসন্ত কেবিন' বারবার মুদ্রিত হয়ে যায়।

একবিংশ শতাব্দীতে দেশের মানুষ আর বিশ্বের মানুষের একদিক থেকে যেমন ভেদ থাকবে না, অন্যদিকে রাষ্ট্রিক বৈরিতার বেড়াওলি থাকবে একই রকম কাঁটা উঁচিয়ে। এক দেশ আর এক দেশের উপর বোমা ফেলবে; এক দেশ গুঁড়িয়ে দেবে আর এক দেশের প্রাসাদ। এবং দুই প্রতিবেশী দেশ সূচিরকাল চালিয়ে যাবে সীমান্তযুদ্ধ। মানুষের প্রাণ ক্রমশই মূল্যবাহীন হয়ে যাবে রক্তশক্তি বৃদ্ধির নেশায়। হিটলার ছড়িয়ে যাবে দেশে দেশে, কই মানুষের অধিকার আর শক্তিবৃদ্ধির অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষায়। হিটলারের জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করে এভাবেই হয়ত সৈয়দ মুজতবা আসী দেশ আর বিশ্বের মধ্যে মিল দেখেছিলেন।

সৈয়দ মুজতবা আসীর অনেক রমা রচনা পড়েছি আমরা। তাঁর এই 'হিটলার' নামের অ-রমা রচনাটিও তাঁকে চেনবার জন্য অপরিহার্য। □

প্রেমেন্দ্র মিত্র : সাহিত্যের সব্যসাচী

তরুণ সান্যাল

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গ আমার কাকিগত পরিচয় সম্ভবত ১৯৫৬ বা ১৯৫৭ সালে। তবে খুব ছেসেবেলা থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা পড়েছি। একসময় তো ঘনাদার গল্প পড়ে বিশ্বভ্রমণ করেছি। বরং বলব কবিতা পড়েছি একটু পরে, ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে। সেও ছিল 'ফেরারী ফৌজ' দিয়ে শুরু (১৯৪৮)। তারপরেই পড়ি 'প্রথমা' (১৯৩২)। পড়ি 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬) 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৫৯) এবং 'সম্রাট' (১৯৫০)। এলোমেলো ভাবে মনে পড়ছে দেশপ্রিয় পার্কে কাছে কোনো এক সভা ঘরে কবিতা পাঠের আসর। প্রেমেন্দ্র মিত্র সভাপতি। সদা প্রকাশিত 'চতুরঙ্গ' থেকে আমার কবিতা 'মুষ্টি' পাঠ করেছিলাম। তখনতো এত ছোট পত্রিকার রমরমা ছিল না, কবিদেরও রক্তবীজ বাঁধ দেখা যায়নি। প্রেমেন্দ্র বসলেন, 'এটাতো চতুরঙ্গ লিখেছ।' বোঝা গেল উনি নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা টিভিতা পড়েন। এমনি দূর থেকে সম্ভ্রম করতাম। উনি যে তরুণ কবিদের লেখা পড়েন, তা তেমন ধাক্কা ছিল না। অবশ্য এই কাছাকাছি সময়ে 'সাগর থেকে ফেরা' কবিতা বইটির জন্য উনি আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তখন আবার দলবাজিও ছিল না। এবং ছোট বড় নানা পুরস্কার দিয়ে সেখক কবিদের দলে টানার ব্যবস্থাটাও গড়ে ওঠেনি। তবে অবশ্য মনে পড়ছে রবীন্দ্র পুরস্কার সতীকান্ত ওহকে দেওয়ায় যার মধ্যে বিচারকওসীতে ছিলেন প্রেমেন্দ্র দাও, খুব হৈ চৈ হয়েছিল, অন্নদাশঙ্কর ও প্রেমেন্দ্র মিত্র খুব হেনস্থা হয়েছিল। মনে পড়ছে প্রবোধ কুমার সান্যাল বনম্পতির বৈঠক নামে একটি ক্রমশ প্রকাশ্য রচনায় প্রেমেন্দ্রকে, প্রেমেন্দ্র হরি মিত্র বলে জানাতেন বলে লেখায়, প্রেমেন্দ্র খুবই চটেছিলেন। আর একটা গোপন কথা বলি। উন্টেরখ কবিতা পুরস্কার দেওয়ার মূল বিচারক ছিলেন নাকি প্রেমেন্দ্রই। ১৯৭০ বা ৭১ সালে ওই পুরস্কারটা দিয়েছিলেন তিনি তরুণ সান্যালকে। তখন তো আনন্দ পুরস্কার ছিল না আলাদা করে। একই মঞ্চ থেকে আনন্দ-উন্টেরখ-মোচাক পুরস্কার দেওয়া হত।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিকাশের ইতিহাসটা একটু জটিল। জন্মেছিলেন ১৯০৪ সালে কশিতে। বাবা ছিলেন রেলের চাকুরে, পড়াশোনা কলকাতা ও ঢাকায়।

বিজ্ঞানের ছাত্র। কিছু দিন শিক্ষকতাও করেছিলেন। বালক বয়সে ক্লাসের বাইরে নিল ডাউন হয়ে আটকে ছিলেন নাকি একটি শিশু কবিতা লেখার দাক্ষিণ্যে। রচনার বিষয় ছিল নদী ও নৌকা। তারপর দীর্ঘকাল কবিতা টিভিতা লেখেন নি। কিন্তু ছুস জীবনে খাতা ভরে ফেলেছিলেন গল্প লিখে লিখে। খুব তরুণ বয়সেই ফোর আর্টস বলে যে সংস্থাটি ছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথম দিকে গল্প পাঠ করতেন, শেষে মুরলীধর বসুর সহযোগিতায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলিকতায় পত্রিকাটি বের করেছিলেন। মুরলীধরবাবুর আগ্রহে কলকাতা পত্রিকাটিতে লিখতে শুরু করেন এবং 'একটি কেরানী জীবনের' সহজ সরল অভিব্যক্তির

পাশাপাশি কবিতা লিখেছেন তিনি কল্লোলে। একটি বিষয় সম্ভবত উল্লেখ করার মতো, তাঁর কবিতার প্রথম গুণগ্রাহী কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলামই তাঁর কবিতার অক্ষর পংক্তি বিন্যাস ও কবিতার গঠন রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম দিকের আধুনিক কবি বলে যারা পরিচিত এখন তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দের ঝরাপালকে নজরুল ইসলামের ছাপ আছে, অন্যান্যরা তাঁর বিষয়ে তখন খুব আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার তো মনে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্র ছইটমানের মতো বিশ্ব নাগরিকতার অভিব্যক্তিটি পেয়েছিলেন নজরুল ইসলাম থেকেই।

প্রথম মহামুগ্ধের পর এদেশে জাতীয় জীবনে যে সংকট বিঘ্নিত দেখা দেয় ও নতুন নতুন চিন্তা পাশাপাশি ইয়োরোপ থেকে আসতে থাকে সব কিছু মাথাচাড়া দিয়ে যায় আমাদের দেশের সাহিত্যে কর্মে। প্রেমেন্দ্র মিত্র একই সঙ্গে গ্রহণ করেন গোর্কি ও হামসুনকে, মার্কস ও ফ্রয়েডকে। প্রেমেন্দ্র ছিলেন নিটোল গল্প লেখক। তাঁর স্টোত ও তেলেনাপোতা আবিষ্কারের গল্প বিশ্বসাহিত্যে বিরল। এই জাত কুঁড়ে অবসর বিলাসী মানুষটি মানসভ্রমণ করতেন দেশে বিদেশে। তাঁর পঠন পাঠনের পরিধি ছিল বিশাল। কিন্তু সবইতো পঠন পাঠনকে সৃষ্টিশীলতায় আনতে পারেন না। প্রেমেন্দ্র পেয়েছেন।

বাঙলা কবিতায় প্রথম থেকে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আগেই তো বলেছি শ্রীতি পুরস্কার পেয়েছিলেন নজরুল ইসলামের কাছ থেকে। ১৯৩২ সালে তাঁর কবিতার বই 'প্রথমা' প্রকাশিত হয়। বইটির কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লোহা পেটাই করা ওগের সঙ্গে তুলনা করেন কবিতা ওলির। প্রথমার কবিতাওলির বৈশিষ্ট্য হল একেবারে মুখের ভাবায় ভাঙা পংক্তিতে মাত্রাবৃন্দের অসীম শোষণ ক্ষমতার প্রকাশ। একই সঙ্গে তৎসম সহ তত্ত্ব ও দেশী শব্দের প্রকাশ রয়েছে। ওই কবিতায় 'সুশীতল ধারা নদীটি বহুক মহুর তব ঘিরে/গুহ বলিভূক পারাবতওলি কুজন করুক তীরে' এই সহজ পংক্তি বিন্যাসে যে তৎসম শব্দ অসীকৃত হয়েছে তারই পাশাপাশি দেখছি 'কখন প্রিয়ার কষ্ট বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা শশী' যেন কিছুটা মোহিত লাল মল্লমদার অনুসরণ, তারই সঙ্গে রয়েছে :

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের
বিলাস-বিরল মর্মের
যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হয় নাই।
মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতাল পুরীর বশিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাদিয়া কাটার কাল,
দূরত্বনশী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
সেবারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাই যে হয়।
মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই

কুস্তকারের ঢাকা
 আকাশের ডাকে গড়ি আর মেসি
 দুঃসাহসের পাখা,
 অশ্লিষ্ট মিনার-নক্স তুলি
 বরগীর গুঁড় আশারে দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি

প্রেমেন্দা কবিতার এই রূপরীতিতে যেমন ব্যক্তির প্রামাণ্যতা এনেছেন, নতুন শ্রমজীবী মানুষের পৃথিবী গড়বার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যুগ যুগান্তর ধরে মানুষের ইতিহাস সৃষ্টির জন্য কাজ করা বিশেষভাবে আদর্শায়িত করেছেন। জীবনানন্দ দাশের ইতিহাস বোঝার সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মেরুবিষয়তা এখানে আছে। তিনিও কবিতায় মানবযাত্রা দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে অতীত যুগের অন্তরাল ছাড়িয়ে ইতিহাসের সৈনিকরা অজ্ঞাতবাস শেষ করে যেন তারা ফেরারী যৌদ্ধ, শেষ লড়াই দিতে আসছে, অর্থাৎ সে লড়াই— 'ডের মনীষীর কাজ' নয়, কাজ হল সংস্পর্ক মানুষের, যারা লড়াই না জিতে ফিরবে না। 'সপ্তসাগর কিনারে/ শিঙা বাজে অবিরাম/ সংস্পর্ক সাড়া দাও/ অজ্ঞাতবাস হল শেষ।'

বাঙলা আধুনিক কবিতার প্রথম পত্রিকা 'কবিতা'র প্রথম সম্পাদক তিনি, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যুগ্ম ভাবে। জানা যায় ১৯৩২ সালে পরিচয় পত্রিকাটিতে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রথমা বইটির একটি সমালোচনা লেখেন। তখন পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনা করতেন সূধীন্দ্রনাথ ও হিরণকুমার সান্যাল। অভিজাত সূধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য ভিত্তিসার সঙ্গে রেল কর্মচারীর লেখক পুত্রের কাব্য দৃষ্টিভঙ্গীর কি মিল হয়? গিরিজাপতি বাবুও ছিলেন যথেষ্ট নাক উঁচু। এই আলোচনাটি বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনোমতো হয়নি। ওঁরা আর পরিচয়ের গুপ্তবারের বৈঠকে আসতেন না। তিন বছর পর বের করলেন 'কবিতা'। ওই পত্রিকাতেও প্রেমেন্দ্র মিত্র বেশি দিন থাকেন নি। ১৯৪০ সালে বের করেছিলেন 'নিরুক্ত'। নিরুক্তকে যে আশীর্বাণী রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে, তাতে তিনি ইস্তিত করেছিলেন অতি পশ্চিমমুখী সূর্যোদয় রচনারীতির প্রতি বিরূপতা যেন ভঙ্গী দিয়ে না ভোলায় চোখ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা ছেড়ে গিয়েছিলেন চলচ্চিত্রের নানা দায়িত্ব নেবার জন্য। বহু ছবি উনি পরিচালনা করেছেন। চিত্রনাট্য ও গান লিখেছেন বহু ছবির।

প্রেমেন্দার মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্যের শুধু ক্ষতি হয় নি, হয়েছিল আফ্রো-এশিয়া সাহিত্য আন্দোলনেরও। শেষ জীবনে উনি আফ্রো-এশিয়া লেখক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের লেখক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে রেখা চিত্রমের জ্যোতির্বিকাশ চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন তিনি আমাকে দেখতে চান। অনেকটা বালকের মতো তাঁর কিছু কিছু ইচ্ছা ছিল। যেমন আমাদের এখনকার বসবাসের পাড়ায় দুর্গাপূজার সময় যে সব স্মারক পত্র বেরত, তাতেও তিনি লেখা দিতেন এবং যতদিন না সেই কপি পেতেন ততদিন তিনি খবরাখবর করতেন পত্রিকাটি কবে পাওয়া যাবে।

ওই চাটুজে মশায়ের সঙ্গে এক প্রাক মধ্যাহ্নে, তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে সেই অতি বাঙালি ঘরানার বাড়ির দোতলার বাদিকের বসার ঘরে। শরীর তাঁর ভেঙে পড়েছে তখন, বসলেন 'সবার সঙ্গে দেখা করতে বড় সাধ হয়। হাঁটা চলা তো করতে পারিনা, অন্তত টেলিফোনে মাঝে মাঝে খবর নিও।' তখন তো এখনকার মতো টেলিফোন মুড়ি মুড়কির মতো জোগান ছিল না। উপরন্তু প্রেমেন্দা কাউকে তাঁর টেলিফোন নম্বর দিতেন না। অবশ্য আমার কাছে নম্বরটা ছিল তাঁরই দেওয়া।

প্রসঙ্গত আবারও বলি প্রেমেন্দার সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের মণীন্দ্র রায়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেই সুবাদে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শুই মহাশয়দেরও সঙ্গে অমৃত পত্রিকার লেখক সূচিতে তাঁর নাম ধাক্কত কিন্তু প্রতিযোগী সাপ্তাহিকটিতে তিনি নিজেকে যুক্ত রাখতে চাইতেন না তখন। অসম্ভব শীত কাড়ুরে। সর্বতোভ্রম সুবেশ, বিদ্যাবিশয়ে সম্রাট এবং আপন খ্যাতি ও প্রতিভা বিষয়ে অল্প প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, চরচ্চিত্রে গীত রচনায়, চিত্রনাট্য এবং নাটক রচনায় ছিলেন সবসামান্য। যে কোনও সামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে আমাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে গেছেন। □

স্রুতি সিংহ : মহাশয় কৃত

With best compliments from

DISCOUNT UPTO 80%

on

TITAN WATCHES

**All Watches are Export Surplus Models :
Available only at**

Titan Value Mart

Open all days except Mondays.

Ph : 2474-6899

বইমেলা : অন্যদেশে

সাগর বিশ্বাস

কলকাতা বইমেলা দেশের বৃহত্তম বইমেলা তো বটেই, পৃথিবীর সমস্ত বইমেলায় মনোহর সে অন্যতম বৃহৎ মেলা। কোনও কোনও দিক থেকে সে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিও করতে পারে। বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বড় শহরেই বইয়ের মেলা বা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান পুরোভাগে। এ রাজ্যে বইমেলা শুধু রাজধানী শহরেই সীমাবদ্ধ নেই। পশ্চিমবঙ্গের জেলা শহরে, মহকুনা, পৌর এলাকা এমন কী পঞ্চায়েত স্তরেও সারা বছর অসংখ্য বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ চিত্র দেশের অন্য কোনও রাজ্যে দেখা যায় না। তথাপি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জনুয়ারির শেষ ও ফেব্রুয়ারির শুরুতে অনুষ্ঠিত কলকাতা বইমেলায় দিকে তাকিয়ে দিন গোনে। এ যেন এক মহোৎসব। মেলায় দিনগুলিতে সংবাদপত্র ও সূর্যদর্শন মাধ্যমে সে উৎসবের যে প্রতিফলন দেখা যায় তাও কাছের দূরের হাজার হাজার পাঠক ও উৎসবপ্রেমী মানুষকে উজ্জীবিত করে, উদ্দীপিত করে। হয়তো প্রাণিতও করে। এই পাঠক-স্রোতে ভাঁটার চানের দিনেও। কলকাতা বইমেলাকে আমরা কাছে থেকে দেখি, সে আমাদের ঘরের মেলা। কিন্তু দেশের বাইরেও তো মেলা হয়। কেমন সে মেলাগুলি? এ অবকাশে বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইমেলায় প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করে নিতে পারি।

জাপান

পরিশ্রমী জাতি হিসেবে জাপানীদের খ্যাতি আছে। শ্রমের সাথে সাথে তাদের শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্মতা, সর্বোপরি যাকে বলে ‘মেকিউলসানেন্স’ যুক্ত হয়ে বর্তমান বিশ্বে তারা এক অনন্য সাম্ভারণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জাতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাদের বইমেলাতেও পরিশ্রুত হয়। টোকিওতে আয়োজিত বইমেলা যেমন একদিকে পরিপাটি আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শে নিমিত্ত পায়, অন্যদিকে জাপানের চিরাচরিত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যেরও পরিচয়বাহী হয়ে ওঠে। তাই দেখা যায়, তাদের বনসাই শিল্প, চায়ের উৎসব, ইকুবানা, হানামি, এমনকী জেনাকি শিকারও মেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠে। এদিক থেকে কলকাতা বই মেলায় সঙ্গে টোকিওর সম্ভবত কিছু মেজাজী মিস খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব নয়। ২০০১ সালের এপ্রিলে টোকিওতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বইমেলা থেকে ফিরে ড. সিতাকান্ত মহাপাত্র যথাার্থই বলেছিলেন Japan would perhaps always remain a strange amalgam of the lotus and the robot.

সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুরের বইমেলাটা আবার, অন্যরকম। অনেকটা ফ্রান্সফুর্টের মতো। এশিয়ার অন্যতম বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিনিময়ের কেন্দ্র হিসেবে সিঙ্গাপুরের একটা বাড়তি গুরুত্ব আছে। সেটা তাঁর বইমেলাটিতেও প্রতিফলিত হয়। যেমন, বছর দুয়েক আগে (২৫-২৭ এপ্রিল ২০০১) এশিয়া ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার অ্যান্ড সি ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরি এক্সপো আয়োজিত হল সিঙ্গাপুরে। বেশ আশ্চর্য হয়ে দেখা গেল এই মহাদেশের ৩৭টি দেশ থেকে দেড়হাজার প্রতিনিধি এসেছেন যাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছাড়াও রয়েছেন গ্রন্থাগারিক, প্রকাশক, পুস্তকবিক্রেতা, শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী শ্রেণির মানুষ। এই যে ব্যাপক সমাবেশ এর

পেছনে উদ্দেশ্য একটাই— বই প্রকাশনা ও বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্য মত বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন নতুন পথের সন্ধান। আর এই লক্ষ্য থেকে উদ্যোক্তারা মেলায় মধ্য আয়োজন রাখেন প্রকাশনা, সম্পাদনা, পুনর্মুদ্রণ, অনুবাদ এমনকি DRM (digital right management) পদ্ধতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চক্র।

মুদ্রণ শিল্প বা ছাপা বই ছাড়াও এখানে অভ্যাবনিক সি. ডি. এবং ডিজিটাল উপকরণের ব্যবহার, সরবরাহ ও প্রয়োগপদ্ধতির ব্যাপক প্রদর্শন থাকে। সিন্সাপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি বোর্ড এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, বিশেষত সিন্সাপুর মালয়েশিয়া, মায়ানমার, তাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের বাণিজ্যিক পরিদর্শকরা এ জাতীয় মেলা থেকেই পুস্তক প্রকাশনা ও ব্যবসায়ের নেটওয়ার্ক বিষয়ে প্রভূত উপকার লাভ করেন।

জিহ্বাবোয়ে

আরওগে, পরিসরে অনেক ছোট হলেও হারারে স্বালপচার গার্ডেনে আয়োজিত জিহ্বাবোয়ে ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার কে বলা হয় ‘মিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট’ বইমেলা। ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলার মতোই এ মেলা বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে আয়োজিত হয় এবং পুস্তকজগতের পেশাদার প্রকাশক বিক্রেতা ক্রেতাদের আকর্ষণ করে। পাঁচ দিনের মেলার প্রথম তিনদিন সাধারণ দর্শকের প্রবেশাধিকার থাকে না। তবে ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশাল মেলার যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে হাজার হাজার বই ব্যবসায়ীরা সমবেত হন জিহ্বাবোয়েতে তেমনটা হয়না। মূলত অফ্রিকার প্রকাশনা জগতের দর্শন অলিম্ব হিসেবে এ মেলায় উপস্থিতি দেখা যায় কয়েকশো অফ্রিকান পুস্তক ব্যবসায়ী/প্রকাশক এবং অল্প কিছু ইউরোপ আমেরিকা ও ভারত উপমহাদেশের প্রকাশক/ বিক্রেতা সংস্থার প্রতিনিধিদের।

ইদানীং জিহ্বাবোয়ে বইমেলায় প্রতিনিধি সমাগম এবং সাধারণ পুস্তকপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি আগের চেয়ে কিছুটা কমছে। তার প্রধান কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়। ৫০ মার্কিন ডলার খরচ করে খুব কম লোকই মেলার প্রবেশ পত্র কিনতে পারে। আর সে দেশের অর্থমূল্যে ২৫০ গ্রিম ডলার = ১ মার্কিন ডলার। তবে দর্শন ও প্রদর্শনের মানকাঠিতে জিহ্বাবোয়ে বইমেলা খুব বিরাট না হলেও গ্রাণসম্পদে ভরপুর থাকে। এখানে ভারতীয় বইয়ের প্রতি মোটামুটি আগ্রহ দেখা গেলেও আঞ্চলিক ভাবার বইয়ের কোনও বাজার নেই। আর বাঙলা বই? সে কথা না বলাই ভালো।

জেরুজালেম

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি ইসরায়েলের জন্মলগ্ন থেকেই তাকে গ্রাস করে রেখেছে। তবুও পশ্চিমী সভ্যতা ও পৃথিবীর তিন তিনটি বৃহৎ ধর্মের জন্মভূমি ও লালনক্ষেত্র জেরুজালেমকে আজও বলা হয় হোলি ল্যান্ড বা পবিত্র দেশ। জুডাইজম, খ্রিস্টানিতি ও ইসলামের উদ্দেশ্য ও বিকাশক্ষেত্র হিসেবে জেরুজালেম আজও বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর ধর্মীয় তীর্থভূমি। আধুনিক সভ্যতার সংকেত ও অস্থিরতার আবর্তলাহিত এই ভূখণ্ডে ১৯৬৩ সাল থেকে প্রতি দু’বছরে একবার প্রায় নিয়মিত ভাবে আন্তর্জাতিক বইমেলা সংঘটিত হয় এও রীতিমতো তাৎপর্যময় ঘটনা। ২০০১ সালের মেলাতেও দেখা গেছে পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশ থেকে সাতশো প্রকাশনা সংস্থা এখানে অংশগ্রহণ করেছে। সেবার এই মেলাতেই আমেরিকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক শ্রীমতী সুসান সোনতাগকে জেরুজালেম পুরস্কারে ভূষিত

করা হয় তাঁর মানবাধিকার বিষয়ক রচনার জন্য। তিনি দ্বিতীয় নারী যিনি এ পুরস্কার পেলেন; ১৯৭৫ সালে পেয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত নারীবাদী লেখিকা সীমন দ্য বোভয়া। সমকালীন মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম স্বাধীনচেতা ও বিতর্কিত লেখিকা সুসানের বিখ্যাত বই 'Against Interpretation and other Essays.' অনেকে সুসানকে সভ্যতার প্রতিমূর্তি বলে মনে করেন। Gremlins-2 নামক একটি হলিউড-চলচ্চিত্রে একটি চরিত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলে 'The Geneva Convention, chamber music, Susan Sontag--in short, civilisation.'

সম্প্রদায় যে, জেক্সজালেম বইমেলায় পুরস্কার নিয়েও সুসান স্পষ্ট ভাবায় সেদিন জানিয়েছিলেন, যতদিন না ইজরায়েল তার উপনিবেশবাদী কার্যকলাপ ত্যাগ করবে ততদিন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে অনেকে সেদিন সভাকক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। হাতাতালিও কম পড়েনি।

এ বছর মেলা শুরু হয়েছিল ২৩ জুন ২০০৬। ভারতীয় বই ও প্রকাশক সম্পর্কে অনেকেই অভিযোগ যে একটি দুটি বইয়ের জন্য ব্যক্তিগত আগ্রহের প্রতি ভারতীয় প্রকাশকেরা কর্পাতই করেন না। আবার মেলাতেও তাদের বই কিনতে পাওয়া যায়না।

চীন

যত দিন যাচ্ছে বেজিং আন্তর্জাতিক বই মেলা ততই গ্রন্থজগতের নজর কেড়ে নিচ্ছে। গত বছর ২৪ থেকে ২৮ এপ্রিল পাঁচদিনব্যাপী এই মেলা ছিল যেমন সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল তেমনি আদর্শগতভাবে চমৎকারিষ্ঠে পূর্ণ। কমিউনিস্ট চীনে অনুষ্ঠিত এ ধরনের একটি মেলার প্রকল্প যে আর পাঁচটা বিষয়ের মতোই অন্যদের থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা হবে সেতো প্রত্যাশিতই।

W.T.O.-র অন্তর্ভুক্ত হবার পর সে দেশের বারোটি প্রধান প্রকাশনা ও পরিবেশক সংস্থা মিলে সি.পি.জি. বা চায়না পাবলিশিং গ্রুপ গঠন করে। পিপলস পাবলিশিং হাউস, পিপলস লিটারেচার পাবলিশিং হাউস, দি কমার্সিয়াল প্রেসের মতো নামকরা সংস্থাগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। সাংহাই, গুয়াংডং ও গিয়াংনিঙে দশটা অগ্রণী সংস্থাও একত্রে কাজ করতে এগিয়ে আসে। এন্টারনাল কো-অপারেশন ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর এবং কমার্সিয়াল প্রেসের সভাপতি ইয়াং সেয়ান, পিপলস পাবলিশিং হাউসের সহ সভাপতি গুয়ান শিওয়াং, চায়না ন্যাশনাল পাবলিকেশন এন্ডপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানির ডাইরেক্টর (এন্ডপোর্ট) লিয়াং জিয়ানফুই গ্রন্থ বিলিষ্ট পদাধিকারীরাই এই কর্মসূচির মুখ্য রূপকার। পুস্তক প্রকাশনা, পরিবেশনা ও ব্যবসায় তারা এই মুহুর্তে বিশ্বপ্রতিযোগিতায় প্রস্তুত। এখানে জিনজিয়া কুক স্টোর যেমন মূল ভূখণ্ডের খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি চায়না ন্যাশনাল পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রি ট্রাডিং বইয়ের রপ্তানী বাজারের একচ্ছত্র নিয়ামক। পাশাপাশি রয়েছে বই আমদানীর সোল এজেন্ট হিসেবে চায়না ন্যাশনাল পাবলিকেশন এন্ডপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট। সি.পি.জি. মনে করে বর্তমানে বছরে যে প্রায় আটত্রিশ বিলিয়ন ইউয়ানের বই বিক্রী হয় তা অচিরেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যাবে। জাতীয় স্তরে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম কেবল স্বদেশের বই ব্যবসায় সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নয়, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার বইয়ের মূল ও অনুবাদেরও প্রবেশ ঘটানো। ভারতীয় প্রকাশনার প্রতিও তাদের আগ্রহ রয়েছে।

ফ্রান্সফোর্ট (জার্মানি)

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বইমেলা। পৃথিবীর তাবৎ গ্রন্থজগতের 'মকা' মূলত 'Rights Fair'। প্রকাশনা, পুনঃ প্রকাশনা, অনুবাদ, কপিরাইট ইত্যাদি গ্রন্থবিষয়ক যাবতীয় ব্যবস্থার বৈষয়িক বিনিময় এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ যে কারণে সারা পৃথিবী প্রতিবছর একবার এই মেলার প্রতীক্ষায় থাকে। এখানে প্রকাশক, লেখক, পরিবেশক, একে অন্যের সাথে মত বিনিময়ের সুযোগ সন্ধান করে। এ বছর গেল ফ্রান্সফোর্টের পঞ্চদশতম বইমেলা।

এ মেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল দেশে দেশে আন্তর্জাতিক বইমেলাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা (Promoting)। প্রকাশকেরা এখানে অনুবাদ ও পুণর্মুদ্রনের সত্তা বেচাকেনা ছাড়াও নতুন চুক্তি ও পুরনো চুক্তির নবীকরণ করতে পারেন। এমন অনেক প্রকাশক/বিক্রেতা আছেন যারা মেলায় অংশগ্রহণ না করেও শুধু বই কেনার জন্য প্রতিবছর ফ্রান্সফোর্ট গিয়ে থাকেন। ভারত থেকে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রায় দুই দশক ধরে নিয়মিত এ মেলায় যোগদান করে আসছে।

নাইজেরিয়া

৮ থেকে ১২ মে ২০০৩ লাগোসে দ্বিতীয় নাইজেরিয়া আন্তর্জাতিক বই মেলা অনুষ্ঠিত হল। তবে বই-বাণিজ্যে আফ্রিকার এই নব্যগত দেশটি আগ্রহী হলেও এ ব্যাপারে এখনও অনেকটা পথ তাকে হাটতে হবে। মেলার শিরোনামে 'আন্তর্জাতিক' কথাটা ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ মেলা এখনও স্বদেশিয়ানার গতি অতিক্রম করতে পারেনি। সাকুলো ৭০টি যোগদানকারী প্রকাশনা/বিক্রেতা সংস্থার মধ্যে ইংল্যান্ডের পাঁচটি, ভারতের ছয়টি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা ও জিম্বাবোয়ের একটি করে সংস্থা ছাড়া বাকি সবই নাইজেরিয়ার। এখানে ভারতীয় বইয়ের বাজার ভালো। তবে আশ্চর্যের হলেও সত্য, ভারতবর্ষের যোগ, আয়ুর্বেদ, প্রাকৃতিক চিকিৎসা ও রন্ধন বিষয়ক বইয়ের যা চাহিদা, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিষয়ক বইয়ের চাহিদা আদৌ তেমন নয়। □

With best compliments from :

Mr. Aloke Mukherjee



Birati, Kolkata-700051

মনিব এলেন নৈশভোজে

ভীষ্ম সাহানি

অনুবাদ : প্রবীর মণ্ডল

মিঃ সামনাথ তাঁর মনিবকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি ও তার স্ত্রী তাঁদের মুখের ঘাম মুছবারও সময় পাচ্ছিলেন না। স্ত্রীর পরনে ছিল গাউন, চুল খোঁপা করে বাঁধা, আর প্রসাধন গিয়েছিল সেকেন্ডে। একের পর এক মুখে সিগারেট রেখে মিঃ সামনাথ কাগজ পেন্সিল হাতে নিয়ে এ-ঘর সে-ঘর করছিলেন। আর হাতের কাগজের লম্বা তালিকায় টিক চিহ্ন দিচ্ছিলেন।

বিকাল পাঁচটায় প্রায় সকল আরোহণ সম্পন্ন হল। বারান্দার চেয়ার-টেবিল, ন্যাপকিন, ফুল ইত্যাদি সুন্দর ভাবে সাজানো হল। তৈরি হল বসার ঘরে একটি সাময়িক ‘বার’। আলমারির পিছনে রাখা হল কিছু জিনিসপত্র। কিছু ঠেলে ঢুকানো হল খাটের তলার। সামনাথ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মার ব্যবস্থা কী হবে?’

স্ত্রী কাজ থামিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ। তারপরে বললেন, ‘মাকে আর রাতের জন্যে প্রতিবেশী কারো বাড়িতে পাঠানো যেতে পারে। সকালে আবার নিয়ে আসব।’ সামনাথের ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট। তিনি ঝুঁকুচে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বললেন, ‘সে হবে না। আমি প্রতিবেশীকে সেই সুযোগ দেব না। মা যদি কারো বাড়িতে থাকেন, তবে সেও (প্রতিবেশী) আমাদের বাড়িতে বখন-তখন...। কী করব আমি বলছি। মাকে বলব তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে, তার ঘরে শুয়ে পড়তে। আমাদের অতিথিরা রাত আটটার আগে আসবেন না।’

‘কিন্তু মা ঘুমিয়ে যদি নাক ডাকাতে শুরু করেন, তখন? পাশেই তো মার ঘর।’

‘মাকে বলব দরজা বন্ধ রাখতে। তাছাড়া আমি বহিরে থেকে তাল্লা লাগিয়ে দেব। অথবা ভালো হয়, আমি যদি মাকে ঘুমিয়ে পড়তে না বলি। মা জেগে বসে থাকবেন।’

‘কিন্তু ধর, তিনি ঘুমালেন। আমরা তো জানি না ডিনার কতক্ষণ চলবে। যাই হোক, তুমি তো এগারোটার আগে ‘বার’-এর কাছ থেকে সরছ না।’

সামনাথ হাত ছড়িয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। বললেন, ‘মা তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চেয়েছিলেন। আর তুমি নাক গলালে। বাহাদুরি দেখাতে চাইলে বন্ধুদের কাছে। এখন তুমি বোঝ।’

—মা ও ছেলের মাঝে আমি নাক গলাতে চাই না। ডোমার যা ইচ্ছে হয় তাই কর।’

মিঃ সামনাথ শান্ত হলেন। এ সময়ে কথা কাটাকাটিতে লাভ নেই। ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। তিনি মার ঘরের দিকে তাকালেন। মায়ের ঘরের দরজা বারান্দার দিকে। বারান্দা দেখে তাঁর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। লম্বা-পা ফেলে তিনি মার ঘরের দিকে গেলেন। মা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন টোকিতে। মুখ দোপটায় ঢাকা। মালা জপছিলেন। সকাল হতে বাড়িতে যা চলছে তাতে তিনি যাবড়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছেলের অফিসের বড়

সাহেব আসছেন। উৎকণ্ঠিত মনে ভাবছিলেন, সব কিছু যেন ভালোভাবে মেটে। মা মুখের ঢাকা সরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন, 'বাছা, আনি আজ কিছু খাব না। তুমি জানো, বাড়িতে মাংস রান্না হলে আমি সেদিন খাইনা।'

'সে বাই হোক তুমি শীঘ্র শুয়ে পড়ো।'

'আজ্ঞা বাছা।' মা বললেন।

'যখন ড্রইংরুমে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাব, তুমি তখন বারান্দায় থাকবে। যখন আমরা বারান্দায় আসব, তুমি গোপনে বাথরুম দিয়ে ড্রইংরুমে চলে যেয়ো।'

মা মুহূর্ত কয়েক ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর কীপকণ্ঠে বললেন, 'তাই হবে।'

'মা আর একটা কথা, তুমি যেন আজ সকাল সকাল ঘুমিয়ে না। তোমার নাকডাকার শব্দ অনেক দূর হতে শোনা যায়।'

লজ্জিতভাবে মা বললেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই। গতবার অসুখের পর থেকে শ্বাস নিতে আমার কষ্ট হয়।'

মিঃ সামনাথ সবকিছু ঠিকঠাক শুধিয়ে ফেলালেও মনের মধ্যে যেন অসুস্থি বোধ হচ্ছিল। যেন গোছগাছ নিখুঁত হয়নি। সাহেবের যদি ইস্টে হয়, বারান্দায় যাবেন, তখন কী হবে? সব মিলিয়ে অতিথির সংখ্যা দশ, তাঁদের অধিকাংশই ভারতীয় সহকর্মী ও তাঁদের স্ত্রীরা। তাঁদের মধ্যে কারো বাথরুমের প্রয়োজন হতে পারে। ওঃ, কী বিস্ত্রী যে হবে। একখানা চেয়ার এনে সামনাথ দরজার পাশে রাখলেন। তারপর বললেন, 'মা ঐ চেয়ারটার বসতো, দেখি তোমাকে কেমন লাগে।'

মা বিব্রতভঙ্গিতে মালা জপছিলেন। মাথার মোপাট্টা ঠিক করে চেয়ারে গিয়ে বসলেন এবং পা দুটি দোলাতে লাগলেন।

'মা, দ্রীজ! দয়া করে খালি পায়ে হেঁটো না। তোমার ওই ঝড়ম ঝোড়াটা আর পরো না। একদিন আমি ও-দুটো ছুড়ে ফেলে দেব।'

'মা তুমি তবে কী পরবে?'

'আমার যা আছে তাই পরবে। অথবা তুমি যা বলবে।' সামনাথের ঠোঁটের ফাঁকে তখনও সিগারেট কুলছিল। ভাবছিলেন, আজ এই বিশেষ দিনে মায়ের কী পরা উচিত। তিনি বাড়িতে অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। বাড়ির সব ব্যাপারে তার কথাই শেষ কথা। কোথায় সেখানে পেরেক পোঁতা হবে, ঘরের কোন কোণে খাট রাখা হবে, পর্দার রঙ কী হবে, স্ত্রী কোন শাড়ি পরবেন, টেবিলের নক্সা কেমন হবে ছোট-খাটো ব্যাপারেও তিনি নিখুঁত থাকতে চান। তিনি মায়ের আপাদমস্তক ভালোভাবে লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, 'সাদা কানিজ ও সালোয়ারই পরো। যাও ফ্রুট পোশাক বদলে এস দেখি, তোমাকে ওই পোশাকে কেমন দেখায়।' মা ধীরে ধীরে উঠে নিজের ঘরে গেলেন।

সামনাথ স্ত্রীর দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বললেন, 'নাকে নিয়েই যতো খামেলা। ওঁর অদ্ভুত আচরণে যদি বসু স্ক্র হন। তুমি ভাবতে পারছ কী হবে তাহলে?'

মা কানিজ ও সালোয়ার পরে এলেন। বেঁটে-খাটো, এলোমেলো, দীপ্তিহীন দুটি চোখ, পাতলা চুল, মাথা দোপাট্টায় ঢাকা। তাঁকে আগের চেয়ে একটু ভালো দেখাচ্ছে।

'ঠ্যা এভেই চলবে। তোমার চুড়ি থাকলে হাতে পরে নাও।'

‘তুমি জানো, আমার কোনও চুড়ি নেই। তোমার লেখা-পড়ার খরচ জোগাতে আমার সমস্ত গয়না বিক্রি করেছিলাম।’

‘ঠিক আছে। ওসব কথা নিয়ে আর— সোজা কথায় বল তোমার চুড়ি নেই। আমার শিক্ষা প্রসঙ্গ তুপছ— তোমার গয়নাগুলো তো একটা ভালো কাজের জন্যে বিক্রি করেছ, তাই না? তুমি বল, আমি কি প্রতারণা? আমার জন্যে যা বায় করেছে তার দ্বিগুণ তোমাকে ফিরিয়ে দেব।’

‘বাছা, আমার মুখে ছাই পড়ুক। কোনও মা কি সন্তানের কাছে ঋণ পরিশোধ চায়? আমি তা বলতে চাইনি। তুল বুঝ না আমাকে। আমার চুড়ি থাকলে আমি তা সবসময় পরে থাকতাম। কিন্তু আমার তো সে সব নেই।’

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। এবার মিঃ সামনাথকে হান করে ডিনার-সুট পরে নিতে হবে। তাঁর স্ত্রী তাঁর ঘরে তৈরি হচ্ছেন। চলে আসার আগে মিঃ সামনাথ মাকে আবার নির্দেশ দিলেন, ‘মা, তুমি সবসময় চুপচাপ বসে থাকবে না। সাহেব যদি তোমার সঙ্গে দেখা করেন যথা উপযুক্ত উত্তর দিও। কী বলতে হবে আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।’

‘বাছা, আমি লেখা-পড়া জানি না। পড়তেও পারি না, লিখতেও জানি না। যদি তোমার অসুবিধা হয়, তবে তাঁদের বলে দিও তোমার মা অনিচ্ছিত।’

যতই সময় কাছে আসতে থাকল, মায়ের বুক জোরে ধড়ফড় করে কাঁপতে থাকল। সাহেব যদি তাঁর কাছে আসেন এবং কিছু প্রশ্ন যদি করেন তবে তিনি কী বলবেন? দূর থেকে ইংরেজ সাহেবদের দেখলেই তিনি ভয় পান। ইনি নাকি আবার আমেরিকান সাহেব। ঈশ্বরই জানেন, আমেরিকান সাহেবরা কেমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর ইচ্ছে করছিল তাঁর এক বিধবা বান্ধবীর কাছে চলে যেতে। অথচ ছেলের আদেশ অমান্য করার সাহস তাঁর ছিল না। তিনি সেখানে চোয়ারে বসে পা দোলাতেই থাকলেন।

মিঃ সামনাথের সাক্ষ্য শীর্ণ কিন্তুতে পৌঁছাল। প্রতিবার পানীয় বদলের সাথে সাথে আলোচনার প্রসঙ্গও বদলাতে থাকল। সবকিছুই জমে উঠল দারুণভাবে। ভারতীয় খাবার সাহেবের বেশ পছন্দ হল। আর মেম সাহেব পর্দা, সোফার ঢাকা এবং গৃহস্থাসীর উচ্চ প্রশংসা করলেন। সাহেব তাঁর ব্যক্তিত্বের গাভীর তুলে মজার গল্প বলে শ্রোতাদের আনন্দ দিচ্ছিলেন। অফিসে তিনি যতটা রাশভারী, এখানে তেমনি ছন্দোভাবাজ। তাঁর স্ত্রীর পরনে কালো গাউন, গলায় মুক্তোর মালা ও দামী সুগন্ধিতে এই মহিলা অতিথিদের নিকট চোখের মণি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি হাসছিলেন, সম্ভ্রান্ত জানাচ্ছিলেন মাথা নেড়ে। তিনি শ্রীমতী সামনাথ ও অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে এমন আন্তরিক যোগাযোগ করছিলেন, মনে হচ্ছিল তারা অনেকদিনের পুরনো বন্ধু।

কেউই বুঝতে পারছিল না সময় কীভাবে কাটল। রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল।

তাঁরা সামনাথের পিছন পিছন বেরিয়ে এলেন ভ্রূয়িঃক্রম থেকে।

বারান্দায় পৌঁছে সামনাথ কিছুক্ষণের জন্যে ধামলেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর পা দুটো অবশ হয়ে গেল। মাকে যেখানে বসিয়ে রেখেছিলেন, ঠিক সেখানেই বসে আছেন মা। কিন্তু দুটি পা-ই চোয়ারের উপরে। মাথা দুলাচ্ছে এদিক ওদিক। নাক ডাকছে জোর শব্দে। যখন মাথা একদিকে হেলে যাচ্ছিল, নাক ডাকার শব্দ হচ্ছিল আরও প্রবল। আবার হঠাৎ জেগে গিয়ে

মাথাটা এদিক-ওদিক করছিলেন। দোপাটার শ্রান্ত খসে পড়ছিল মাথা হতে। মাথার চুলইীন জায়গায় পাতঙ্গা চুলগুলি ছড়িয়েছিল।

মিঃ সামনাথ রাগে টগবগ ফুটছিলেন। ইচ্ছে হচ্ছিল জোর ধাক্কা মাকে জাণিয়ে ঘরের ভেতরে ঠেলে নেন। কিন্তু বস্ ও অতিথিরা দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। এবার কী করবেন তিনি?

নিশ্চেষ্ট হাসছিলেন অতিথিদের দ্বীরা। আর সাহেব 'বেচারী মা।' বলতেই মা জেগে উঠলেন চমকে। তাঁর পাশে অনেক স্নোক দেখে তিনি হতবুদ্ধি হলেন। মুখ হতে কথা বেরুল না। দোপাটায় মাথা আবৃত করে বিব্রত ঢঙে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ নিচু করে দাঁড়ালেন। তাঁর হাত-পা কাঁপছিল।

'মা ঘুমাতে যান। এত রাত পর্যন্ত আপনি জেগে আছেন কেন?' লজ্জিত মুখে মা সাহেবের দিকে তাকালেন।

'বস্' বেশ খোশ মেজাজে ছিলেন। তিনি বৃন্দ হেসে বললেন, 'নমস্তে'। মা সংকোচে নিজের মধ্যে যেন গুটিয়ে গেলেন। ইতস্ততঃ হাত দুটি জোড় করে অভিযান জানাতে চাইলেন। কিন্তু দুপাটার ভিতর একটি হাত ঢুকিয়ে মালা জপার কারণে তাঁর প্রয়াসটা খুব বিতী পেখান। সামনাথ বিরক্ত হলেন।

'বস' তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। মা ভয়ে তাঁর হাতের দিকে চেয়ে রইলেন।

'মা, সাহেবের সঙ্গে শেকহ্যান্ড কর।'

কিন্তু তিনি তা কীভাবে করবেন? ডান হাতে জপের মালা। কী করবেন কখনো না পেরে বসের ডান হাতের উপর তাঁর বাঁ হাত রাখলেন। কেউ যেন খিলখিল হেসে উঠলেন। সামনাথ রেগে আঙন হলেন।

'মা এভাবে নয়। তুমি করমর্শন করতে জানো না? দয়া করে ডানহাতটা দাও।'

কিন্তু ততক্ষণে বস্ মায়ের বাঁ হাতে সামনা চাপ দিয়ে, 'আপনি কেমন আছেন?'

'মা, তুমি বল ভালো আছি, ধন্যবাদ।'

মা ঝিড়ঝিড় করলেন। আবার কেউ যেন সশব্দে হেসে উঠল। কিন্তু বিপদ অতিক্রান্ত হল, সাহেব অবস্থা সামাল দিলেন। সামনাথের রাগ কমল। সাহেব তখনও মার হাত ধরেছিলেন। মা নীরবে অত্যন্ত বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন।

সামনাথ : 'সাহেব, আমার মা গ্রামের মেয়ে। সারা জীবন গ্রামে বাস করেছেন। সেই জন্যেই এত লজ্জা। সাহেব উৎফুল্ল হয়ে বললেন 'তাই। আমি গায়ের মানুষদের খুব পছন্দ করি। আমার মনে হয় তোমার মা অবশ্যই লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত জানেন।'

'বস্' মায়ের দিকে প্রত্যাশিত চোখে তাকালেন।

'মা, সাহেব তোমাকে একটি গান গাইতে বলছেন, একখানা পুরনো গান। যে কোনও পুরনো গান। তুমি তো অনেক গান জান মা।'

মা ক্ষীণ সুরে : 'আমি জানি না।' তুমি কি আমাকে কখনও গান গাইতে শুনেছ?'

সামনাথ বললেন, 'অতিথিদের অনুরোধ প্রত্যাখান করতে নেই। তুমি না গাইলে সাহেব অপমানিত হবেন। তিনি শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'কিন্তু আমি কোনো গানই জানি না।'

'মা আরম্ভ কর। একটি দুটি সাহিন অন্ততঃ। যেমন ঘর, সেই ডালিমগাছের গানটা।'

ভারতীয় সহকর্মীরাও ঐ গানটার উল্লেখ করলেন। তাঁরা সমবেত ভাবে হাত তালি দিতে লাগলেন। মা অনুনয়ের দৃষ্টিতে প্রথমে ছেলের দিকে, পরে ছেলের বোয়ের দিকে তাকালেন।

‘মা!’ ছেলে ক্রমশ অঁধার হয়ে উঠছিলেন। তাঁর কণ্ঠে রুদ্ধতার আভাস। বাঁচার কোনও উপায় নেই। চেয়ারে বসলেন মা। তিনি পুরনো দিনের একটি বিয়ের গান, দুর্বল ভাস্কর পলায় শুরু করলেন। মহিলারা সম্মলে হেসে উঠল। দু’পঙক্তি গেয়েই করুণভাবে তিনি নীরব হলেন।

গোটা বারান্দা প্রশংসাক্ষরনিতে মুখর। সাহেবের হাততালি আর থানে না। সামনাথের ক্রোধ হঠাৎ পরিণত হল আনন্দে। পাটিতে মা একটি নতুন সুর যোগ করলেন।

হাততালি থামল। তারপর পাঞ্জাবের গ্রামীণ-শিল্প সবন্ধে ‘বস’ কিছু জ্ঞানতে চাইলেন।

সামনাথের মনে আনন্দের ঢেউ। হাততালির আওয়াজ যেন তখনও তাঁর কানে। উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ‘আমাদের গ্রামীণ শিল্প অনেক আছে। আমি আপনার জন্যে পুরো এক সেট শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে আনব। আমি অফিসেই নিয়ে আসব স্যার। আমি জানি, আপনার খুব পছন্দ হবে।’

‘না-না, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বাজার চলতি ওই সব শিল্পের কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি সেই সব শিল্প দ্রব্যের কথা, যেগুলি পাঞ্জাবি পরিবারে তৈরি করা হয়। মহিলারা নিজেরা তৈরি করেন।’

মিঃ সামনাথ কক্ষকাল চিন্তা করলেন। ‘অল্পবয়সী মেয়েরা পুতুল তৈরি করে স্যার। আর— আর— মহিলারা তৈরি করে ফুলকারি।’

মিঃ সামনাথ আনাড়ির মতো বোকাতে চাইছিলেন, ফুলকারি হল একখণ্ড কাপড়ের উপর নকশা তৈরি করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে মায়ের দিকে তাকালেন, ‘মা, আমাদের বাড়িতে পুরনো ফুলকারি আছে?’

মা নিজের ঘর থেকে একটি ফুলকারি আনলেন। ‘বস’ খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখলেন। সেটি একটি খুবই পুরনো ফুলকারি। জায়গায় জায়গায় সুতো বেরিয়ে গেছে।

‘মা, তুমি সাহেবের জন্যে একটি বানিয়ে দিও। সেবে না?’

মা চুপ করে রইলেন। কিছু পরে বললেন, ‘আমার চোখের দৃষ্টি আগের মতো নেই। বুড়ো মানুষের চোখে কষ্ট হয়।’

‘আপনার জন্যে অবশ্য একখানি তৈরি করবেন।’ মার কথায় বাধ্য হয়ে সামনাথ বললেন, ‘সেটা নিশ্চয় আপনার পছন্দ হবে।’

সাহেব সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। মাকে ধন্যবাদ দিয়ে ডাইনিং-এর দিকে গেলেন। অতিথিরা তাঁকে অনুসরণ করল।

তাঁরা সবাই যখন নৈশভোজের টেবিলে বসলেন, মা চুপিসারে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকতেই তাঁর দু’চোখ ভরা জল। তিনি দোপট্টা দিয়ে বারবার চোখ মুছছিলেন। চোখের জল ভবু ধামে না। নিজেসঙ্গে সংযত করতে চেষ্টা করলেন। কুন্দের মূর্তির সামনে হাত জোড় করে পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। কিন্তু বর্ষার মতো অক্ষ চোখ থেকে পড়তে থাকল।

মধ্য রাত্রি। অতিথিরা একের পর এক বিদায় নিলেন। তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে একইভাবে বসে রইলেন। সমস্ত উত্তেজনা শেষ। পাড়ার নিরন্তরতা নেমে এল বাড়ির উপরে।

শুধু রাধা ঘরে নানান শব্দ। এমন সময় কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল।

‘মা। দরজা খোল।’

মার বুক আবার কাঁপল। তিনি কি কোনও ভুল করেছেন? তিনি তো সব সময় ভুল করেন। তিনি তখন কেনই বা বারান্দার ঘুমে ঢুলছিলেন? এজন্য ছেলে কি ক্ষমা করেনি? তিনি কাঁপা হাতে দরজা খুললেন।

সামনাথ মাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন, ‘আম্মা, তুমি আজ সবাইকে অবাক করেছ। সাহেব ভীষণ খুশি হয়েছেন তোমার ওপর।’

সামনাথের বিশাল দেহের তুলনায় তাঁর শীর্ণ মেহ আরো ছোট দেখাচ্ছিল। চোখে জল ভরে এল। চোখের জল মুছে বললেন, ‘বাছা, আমাকে হরিদ্বার পাঠিয়ে দাও। তোমাকে একথা অনেকদিন বলেছি।’ সামনাথ ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ হলেন ‘লোকের কাছে তুমি আমাকে ছোট করতে চাও? যাতে লোকেরা বলতে পারে, ছেলেটি মাকে আশ্রয় দিল না।’

‘না বাবা! আমাকে ভুল বুঝ না। তুমি স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দে সুখে থাক। আমি জীবনের শেষ লয়ে। আমি এখানে আর কী করব? যে ক’টা দিন বাঁচি ঈশ্বরের সেবা করে বাঁচতে চাই। আমাকে দয়া করে হরিদ্বার পাঠিয়ে দাও।’

‘মা, তুমি চলে গেলে সাহেবের ‘ফুলকারি’ কে তৈরি করে দেবে? তোমার সামনেই তাঁকে কথা দিয়েছি। তুমি তা জানো।’

‘বাছা! আমার দৃষ্টি শক্তি এখন দুর্বল। তুমি বরং অন্য কারোর থেকে করে নাও অথবা একটি রেডিমেড ফুলকারি কিনে নাও।’

‘দেখ মা, তুমি এ ভাবে আমাকে কষ্ট দিও না। সাহেব খুশি হলে চাকরিতে আমার পদোন্নতি হবে।’

মা মিনিট খানিক চুপ রইলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সাহেব তোমাকে উঁচু পদে বসাবেন? সত্যি তিনি একথা বলেছেন?’

‘না, তা কিছু বলেননি। কিন্তু তুমি কি দেখনি, তিনি আমার উপর কত খুশি? তুমি যখন ‘ফুলকারি’ তৈরি করবে তিনি নিজে এসে সেবে যাবেন বলেছেন কীভাবে সেটা তৈরি হয়। মনিব সন্তুষ্ট হলে তিনি আমাকে আরও উঁচু পদে বসাবেন। আমি বেশ বড় অফিসার হয়ে যেতে পারি।’

মায়ের মুখের রঙ যেন বদলাতে শুরু করল। তাঁর শীর্ণ কুঞ্চিত মুখে চাপা আনন্দের আভাস ফুটে উঠল।

‘বাছা, তুমি তবে অফিসের উঁচু পদ লাভ করতে যাচ্ছ?’

‘না মা, বিষয়টা অতো সহজ নয়। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। যদি আমি শুধু সাহেবকে খুশি করতে পারি...। আরো তো অনেকে আছে, সবাই প্রমোশন পেতে চায়। মা, এ হল একটি ইন্দুর দৌড় প্রতিযোগিতা। কিন্তু আমার সুযোগ লাভের সম্ভাবনাটা বেশি।’

‘তবে তাঁর জন্যে আমি অকশাই একটি তৈরি করে দেব। আমি ক’রে দেব... কষ্ট করে হলেও...।’ তিনি নীরবে পুত্রের জন্যে প্রার্থনা করলেন।

দরজার দিকে যেতে যেতে সামনাথ: ‘মা, এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়।’ □

গল্পটি ইংরেজি শীর্ষনাম ‘The Boss comes to dinner’ থেকে অনুদিত।

তার তোমার আমার উচ্চ আশা

অভিজিত ঘোষ

এক

তুমি বড় হতে চাইলে।

সবার চেয়ে অন্যরকম, সবার চেয়ে আগাধা হয়ে উঠতে চাইলে।

উচ্ছ্বাসভরা হল, মানে সবার চেয়ে ওপরে উঠতে চাইল। সবাই মানবে তোমায়, শুনবে তোমার কথা, এই হচ্ছে হল।

তখন চেয়ারের ওপর চেয়ার বসিয়ে তার ওপরে উঠে দাঁড়ালে।

বললে, 'এই শোন, আমি কী বলছি শোনো। আমি বড়। তোমাদের সকলের চেয়ে বড়। তোমরা ছোট। আমার চেয়ে অনেক ছোট।'

আমরা তোমার দিকে তাকালাম। তারপর এদিক-ওদিক এপাশ-ওপাশ চারদিক তাকিয়ে দেখলাম। আর কাউকে তোমার মতো চোখে পড়ল না। তা ছাড়া আশেপাশে উঠে দাঁড়াবার মতো অন্য কোনো চেয়ার বা চেয়ারের ওপরে লাগাবার মতো আরো একটা চেয়ার— না! কিছুই চোখে পড়ল না। অতঃপর তুমিই যে সবার চেয়ে উঁচুতে উঠতে পেরেছ, সেটা মনিলাম। এমনকী আমরা যে আর ও অতটা উঁচুতে উঠতে পারব না সেটাও মানলাম। আমরা, ওরা, তারা— সবাই মানল।

সবাই, কিন্তু সবাই নয়। প্রথমটায় কেউ লক্ষ্য করে নি, তারপরে সবাই করল। পেছন দিকের পাশে সাইড-এ দাঁড়িয়েছিল এক ব্যাটা চিমড়ে ঠাটা ব্যাটা যত নষ্টের গোড়া— সে কিনা অট্টহাসি হাসল! ঝুঁকে ঝুঁকে, দূলে দূলে, নিজের চাপটা পেট জাপটে ধরে, মাটিতে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে হাসল।

তোমার রাগ হল। তার দিকে মাথা হেলিয়ে ভুত ঝুঁচকে তাকালে। গলা ঝাকারি দিলে বার-দুই।

তাতে ও আরও হাসল! হাসতে হাসতে কাশল, তারপর আরও আরও হাসল।

তোমার রাগ হল। তখন মুখে যা আসে সব বললে।

লোকটা হেসেই চলল। হাসতে হাসতে বসে পড়ল, তারপর সে বসে বসেই হাসল।

মুখে যা আসে তা-তো বলেইছিল, এবার মুখে যা-যা আসে না, বা যা-সব আসে না বলেই জানতে, তা-ও এল—স-অ-ব বললে।

লোকটা কিন্তু হেসেই চলেছে। এত সমস্ত শোনার পরেও লোকটা কুলকুল করে হেসে চলেছে।

আমার গা শিরশির করল। বেদম বিরক্ত হয়ে গটমট করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

বললুম, 'কী হে, এত অপমানেও তোমার টনক নড়ল না? বলি, আত্মঘাতী বলে কি কিছুই নেই নাকি? এখনও হাসছ?'

ও যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'আজ্ঞে, আমি আবার অপমানিত হলুম কই?'
আমি বললুম, 'সে কী! এত অকথা কুকথা বেকথা সব শুনলে, তাতেও অপমান হল না? তুমি কী...'

আমি পুরোটা বলতে পারার আগেই সে জিভ কেটে নিজের দুকান মলে টলে শব্দব্যস্ত হয়ে বলল, 'এহেহে, আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। আমারই দোষ। দাঁড়ান কত্তা, বুঝিয়ে বলি। ধরুন আপনি কাউকে কিছু দিতে চাইলেন— ধরুন কোনো উপহার-টুপহার— কিন্তু ধরুন কোনো না কারণে তিনি সেটা গ্রহণ করলেন না। তখন সেই উপহারের মালটা কার?'

আমি বললুম, 'কার আবার, সেটা আমারই থেকে যাবে।'

লোকটা আবার হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, 'আজ্ঞে সেটাই তো কথা। উনি যা-সব অভিমা উপাধি বিশেষণ-ভূষণ আমাকে দিতে দিতে চাইলেন, আমি তো তার কিছুই গ্রহণ করলুম না। এবার বলুন, সে সব বাছাই টাইটেল কার কাছে রয়ে গেলে?' ..

আমি বোকার মতো তোমার দিকে তাকালুম। আর সেটা দেখে ও হেসে গড়াতে গড়াতে বলল, 'ঠিক ধরেছেন, ওনার কাছেই, ওনার-ই হয়ে রইল।'

তোমার রাগ হল। ভীষণ রাগ হল। রেগে লাল হয়ে গেলো।

তারপর মাঠ ছেড়ে চলে গেলো।

যাচ্ছিলো।

দুই

আমি বড় হতে চাইলাম।

চাইলাম, মহৎ হতে, বৃহৎ হতে।

ইচ্ছে হল আমরা সবাই এক হব। বিচ্ছিন্ন দীপসদৃশ মানবকূলকে ঐক্যবদ্ধ করব, এমন ইচ্ছে হল।

হেঁকে বললাম, 'এই যে তোমরা, ওরা, ওরা আর বাকি সব যারা, ইদিকে এস/আসুন/আসো হোক দিকি। চল, সবাই এক হয়ে যাই। গোল হয়ে দাঁড়াও, সবলে মিলে। হাতে হাত ধর। সত্যি, এক হয়ে যাব— দেখ'।

তোমরা এলে, ওঁরাও এলেন, আর বাকি সব আসি আসি করে। এমন সময়ে ই কি কাণ্ড, ওই যে ওরা, বাকি ওরা, তারা বলে কিনা 'আসব না'। বলে, 'ভালোই আছি, এক হয়ে কাজ নেই কো'!

আমি বললুম, 'ওরা বোকা'।

তুমি বললে, 'নরকের পোকা'।

তুমি বললে, 'ভাছড়া বদ, বজ্রাভ, বদমায়েশ'।

আমি বললুম, 'এদের জন্যেই রসাতলে যাবে দেশ'।

আমি বললুম, 'না এসে যাবি কোথায়, কন্নবি কী?'

তুমি বললে, 'জাহান্নাম ছাড়া জুটবে কী?'

আমার রাগ হল। তোমার রাগ হল। আমি দাঁত কিড়বিড় করলাম। তুমি দাঁত কিড়বিড় করলে। আমি হাঁ করলাম। তুমি হাঁ করলে। দুজনে মিলে ওদের গিলে ফেললুম। হজম করলুম। ওরা সব আমাদের পেটেতে পিলেতে ফকতে ভুঁড়িতে মিলে মিলে গেল।

তারপর দুজনে হাসলুম, টেকুর তুললুম। বাট-টাঃ। এক না হয়ে বাবে কোথা?
 এখন আমি আর তুমি।
 এবার আমি তোমাকে খাব। তোমাতে আনাতে এক দেহে সীন হব।
 শেষ পর্যন্ত তখন সত্তলে এক হব।
 এস না খাই।
 প্রিজ! দুচ্ছাই,
 আশছ না ক্যানো?

তিন

সে-ও বড় হাতে চেয়েছিল।

জীবনটাকে বদলে ফেলবে, উন্নতি করবে প্রচুর, এই চেয়েছিল।

ডিস এক সামান্য কারিগর, সারাদিন ছেনি বাটাসি দিয়ে পাথরের চাণ্ড ডেঙে ডেঙে
 থোরা তৈরি করত। পরিশ্রম ছিল, অর্থকষ্ট ছিল; লোকে যে তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে না, মনে
 মনে তাতে ভারি কোভ ছিল।

একদিন ঠিকেন্দারের অফিসঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে তার মনের ইীনমন্যতা
 জিনিসটা আচমকা এক বাঘা কামড় বসল। তার মনে হল, যদি মজুর না হয়ে খালান মালিক
 হওয়া যেত, তবে কত বোলবোলাও হত, হাঁকডাক, কেমন মোটরবাইক, কত সম্মান,
 কত...। অতএব, ইচ্ছে হল সে আর মজুর থাকবে না, ঠিকেন্দার হবে।

বাস। অমনি সে ঠিকেন্দার হয়ে গেল। দেখে কিনা সেই টিনের চালের পাকা অফিসঘরটার
 ভেতরে রীতিমতো লোহার চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে টেবিলক্যানের
 হাওয়া খাচ্ছে, ওদিকে ফোড়ে গোছের একটা লোক সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে, একটু
 দূরে দু চারজন কেমন শুকনো মুখে বসে আছে, আর ওই দূরে, ফটকের বাইরে তো মনে
 হচ্ছে একটা কে যেন কারিগর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইীনমন্যতা প্রদর্শন করছে! বড় সুখ হল। বহু
 সুখ হল তার। গলা খাঁকারি দিতে না দিতে খিদমতগার এসে হাজির।

'হতুব'!

নিজেই সে নিজেকে বসল, 'ওনলে একবার? উঃ, যা দারুণ লাগছে না।'

কিন্তু মজাটা টিকল না। আরো তো ঠিকেন্দার আছে, ছোটোবড় মিলিয়ে নানারকম।
 ছোটোরা হিংসে করে, আড়ালে অপবাদ দেয়, বলে 'শোষক'। বড়রা পাল্লা দেয় না, আড়ালে
 বলে 'উইইফোড়'। মনে হল সবচেয়ে বড় ঠিকেন্দারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছেটা করলেই
 হত। হয়ে যাচ্ছিল, একেবারে বৃহত্তম ঠিকেন্দারই হয়ে যাচ্ছিল কখাটা ভাবতে না ভাবতে। কিন্তু
 ঠিক সেই সময়ে সামনে এসে দাঁড়াল একটা জিপ, জিপ থেকে নেমে এল পুলিশ-কর্তা,
 এস-পি না ডি-আই-জি কী একটা যেন। ওমনি তো সেই সবচেয়ে বড় ঠিকেন্দারও 'আরে
 সাহেব আপনে এস্ত কব্বটো কোওরে ক্যানো', বলতে বলতে একেবারে নুয়ে পড়ে আর কি।
 ওমনি ইচ্ছে বদল। পুলিশ, না না শুধু পুলিশ নয়, পুলিশ কর্তা-ই হবে সে...

আর কী, হয়ে গেল ডি-আই-জি। জিপে চড়ে ঘুরছে, সামনে সামনে সাহিরেন-বরদার,
 উসু-উসু করে হটার ডাকছে, পেছনে পেছনে সাক্ষী সেপাই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ককুম ঝরে ঝরে
 পড়ছে, জিত-ই লাঠি, চোখই বন্ধুক। সবাই সেগাম তোকে, মাথা নিচু করে থাকে। লোকে

ভয় পাচ্ছে, আর চোখের আড়াল হলেই গালমন্দ করছে। ক্ষমতার উঁচু বাধের ওপরের রাস্তায় একা একা দুপুরের গরমে ঘুরতে ঘুরতে জিপের ভেতরে ভেপসে সেক হয়ে যায় সে। মন মাথা সব শুকিয়ে ছিবড়ে হয়ে যায় যেন। তাই একবার জিপ দাঁড় করিয়ে বাতাস খেতে নামে। সে রোসে বাতাস কোথায়? মাথা তুলে একবার সূর্যের দিকে তাকায় ডি-আই-জি। ওঃ, তেজ বটে সূর্যের! তেমনটা আর কোনো কিছুই হয় না। যদি তার ওইরকম...

বাস, আর কী! হয়ে গেল সে সূর্য। তাপে গগনের চাঁদি ফাটে। অহংকার পড়তে পায় না, তার আগেই শুকিয়ে যায়। নিচে সবাই... মন্ডর, কারিগর, ঠিকেশ্বর, ডি-আই-জি—সবলে পরেশান। শুকিয়ে দাও, জালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও: কিন্তু হঠাৎ কী দুর্ঘোণ! মেঘ এসে গেছে। মেঘ ঢেকে দিয়েছে সূর্যকে। নিচের সবাই বোধহয় বেঁচে গেল, কিন্তু সে তো সেসবও দেখতে পাচ্ছে না। মেঘ তাহলে সূর্যের চেয়েও ক্ষমতাবান? তাহলে তো মেঘ হলেই...

মেঘ হয়ে সে পৃথিবীর ওপর দিয়ে ভাসতে থাকল। বৃষ্টি ঝরাতে থাকল এখানে সেখানে। আর সে কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি। বন্যা নামতে দেরি কিসের। আবারও সবাই নাস্তানুবাদ। যাবে কোথায়। এখন বলে কিনা রোসে সেক! এর চেয়ে ভালো ছিল! নে বোঝ এবার। কিন্তু ঠেলা বুঝল সে-ই। ঠেলা মানে একেবারে যাকে বলে ওঁতো। ঝোড়ো হাওয়ার ওঁতো। ঠেলতে ঠেলতে দেশছাড়া করে দিল যে। বোঝো। তাহলে এবার হাওয়া হওয়াই বেটার।

আর যাবে কোথায়। হাওয়া বলে হাওয়া। ঝড়ের বাপ না ঠারুঁদা। গাছ উপড়ে কেনে, ছাদ উড়িয়ে নিয়ে, সমুদ্রে তুফান নাচিয়ে মানবজীবন-টিবন সমস্ত কিছু বিপন্ন করে তবে না ক্ষমতার টেস্ট পাওয়া যায়। আর সে কী ক্ষমতা, যাকে বলে খ্যান্তা। নিজেকে সবকিছু করতেও হয় না। ঠেলতে ঠেলতে মেঘ এনে দাও: বৃষ্টি থেকে বন্যা অবধি নিশ্চিন্তি। আবার ঠেলতে ঠেলতে মেঘ সরিয়ে দাও, সূর্যের তাপে ঝলসে যাবে সবকিছু।

এইভাবে ওড়তে ওড়তে ওপড়তে ওপড়তে ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ কিসে যেন আটকে গেল মেঘ। আটকেছে তো আটকেই আছে ফৌসফাঁস জসহাস যত চেষ্টাই করে কিছুতেই কিছু হয় না। কে রে বাবা, হাওয়ার বাবা, কে তুমি?

পাথর। পাথরের দেওয়ালের মতো বিশাল এক পাহাড়। হাওয়ায় নড়ে না, রোদে পোড়ে না, বৃষ্টিতে খুয়ে যায় না। এই তবে সবার চেয়ে বড়? রক্তমের রক্তন। তাহলে পাথর হওয়াই ভালো ছিল। যদি আর একবার...

হ্যাঁ, তারপর সে পাথর। পাথরের পাহাড়। কোনো দান্দা নেই, মাথা নোয়ানো নেই, কয় নেই। যাক, এদিনে নিশ্চিন্তি।

হেই, কী একটা আওয়াজ হচ্ছে। ঠং ঠং। পারের কাছটা কেমন কেমন লাগছে যেন। কেমন যেন বদলে যাচ্ছে সে। ছোটো হয়ে যাচ্ছে। পাথরের মাথা তো, তাই ঝোকানো যায় না, খুব ব্যারাপ স্পনডিলাইটিসের মতোই অবস্থা। তবু পাহাড় চোখ টেরিয়ে নিচের দিকে দেখে।

অনেক অনেক নিচে, সেই যাকে বলে পাদদেশ, সেখানে এক কারিগর পাথর ভাসছে, ছেনি বাটালি হাতে। □

সুজনবাদিয়ার কড়চা

সুশীল দাস

সুজন বাদিয়া গবেষক নয়। ঐতিহাসিকও নয়। নেহাতই ভবঘুরে ফেরিওয়াল। তাই জায়গার নাম সোনাগাছি না সোনাগাজি হবে— তার রিসার্চ বিষয় যেনন সুজন বাদিয়ার নয় তেমনি কীভাবে দেহ পসারিনীদের বাড়ি বাড়ি হতে হতে বাবুদের ভাবায় নিষিদ্ধ পন্নির পীঠস্থান হয়ে উঠল তার হৃদিস করাও বাদিয়ার কাজ নয়। তবে হৃদিসের কথা এসে যখন পড়ল তখন সুজন বাদিয়ার বলতে দ্বিধা নেই এক রাত্রির কিছুটা সময়ের জন্যে সুজন বাদিয়াকে অন্যান্য ভদ্রজনদের মতো মুখ রুমাল চাপা না দিয়ে আপন মুখে সোনাগাছিতে থাকতে হয়েছে। এবং সেই মানুষের গড়া নরকে একটি অকল্পনীয় চরিত্রের হৃদিস পেয়েছে।

দারুণ হাড় কাঁপানো শীতে যখন রাস্তার নেড়ি কুড়াগুলো লাজ গুটিয়ে কুস্তঙ্গী পাকিয়ে বাতাবিসেবু হয়ে আনাচে কানাচে রাত্রি যাপন করে— তখন কলকাতায় যাত্রাদলের গাড়িগুলো ঘন কুয়াশা ভেদ করে উত্তরবঙ্গে ছোটো।

কোচবিহার শহর থেকে তুফান গঙ্গে যাওয়ার পথে চিলাখানা গ্রাম। ছোট হাট বসে চিলাখানায়। প্রধানত পাটের হাট। পাশে কালজিনি নদী। প্রায় মরা। এই মরা নদীর পারে কতবার রাত কাটিয়েছে সুজন বাদিয়া। শরৎ কাল এসেই হোটেল ছেড়ে ছুটে যায় চিলাখানায়। কালজিনি নদীর ও পারে কাশ ফুলের ঢেউ। এ পারে দোতারাজি রাতভোব চলে ডাঙয়ইয়া গান। সুরের লেণায় সুজন বাদিয়া তখন ভুলে যায় বেশতির লাভ লোকসান।

রক্ত বেরঙের পোষ্টার পড়েছে চিলাখানা গ্রামে। কলকাতার যাত্রাদলের সুপার হিট মেগা পাসা 'দামাল শাতড়ি কামাল বউ'। সেলসম্যান প্রতাপ বর্মনের বাড়ি চিলাখানায়। প্রতাপ নাছোড়বান্দা— পাসা দেখতে যেতেই হবে। সুজন রাজি নয়। হাড় কাঁপানো শীতে খোলা মাঠে যাত্রা দেখলে নির্ঝাঁং মানা-ভাঙের হোটেল কয়েকদিনের জন্যে কুপোকাং। প্রতাপও বাধা উঁতুল। নানা কায়দায় বুনো ওল সুজনকে হার মানায়।

ভোরের কুয়াশা তখনও কবল বিছিয়ে শহর দখল করে রেখেছে। গত রাতের টিভির সংবাদ— কোচবিহারের তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রী। সূতরাং দখলকার কুয়াশাকে সহজে সূর্যদেব বশ করতে পারবে বলে মনে হয় না। এহেন জবু খবু শহরে কাক না ডাকতেই 'দামাল শাতড়ি কামাল বউ' এসে হাজির। হোটেলের বেয়ারা হরনাথ কবল মুড়ি দিয়ে বসে বসে ঢুলছিল। গাড়ির হর্ণ বাজতেই তড়িৎড়ি ছোটো দরজা খুলতে।

সুজন বাদিয়ার ভোরে ওঠার অভ্যাস। খেচো খাতা নিয়ে বসে ঘণ্টা দুয়েক। সুজন ও হর্নের সঙ্গে আপাদ মস্তক শাল চাপা দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নামে নায়ক নায়িকা, কিছু প্রবীন শিল্পী— যাদের নামে একদা নায়কদের বুকিং হত। বাকি খুচরো শিল্পী, বেশকার কেশকার, বাজনদার, অলোক শিল্পীদের নিয়ে বাস চলে যায় চিলাখানার দিকে।

বিকেসে সুজন বাদিয়া দিনহাটায় মার্কেট করে ফেরে। হোটেলের নীচে জনতার ভিড়।

মোড়লার বারান্দায়ও ভিড় কিছু কম নয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নায়ক নায়িকা শিনেমার হিরো হিরোইনদের কার্যদায় জনতার দিকে হাত নাড়ছে। সুজন কোনও রকমে এ পাশ ও পাশ করে নিজের রুমের দিকে যাবার চেষ্টা করে।

—“আরে! সুজনদা!”

সুজন দাঁড়ায়, দেখে মুখোমুখি পালার নায়িকা। চোখে বিস্ময়।

—“হ্যাঁ। কিন্তু—” সুজন ভাবে নায়িকা আনার নাম জ্ঞানল কী করে।

—“চিনতে পারছো না?”

—“না।”

—“না? সেবি কেমন চিনতে পার না—” বলে নায়িকা সুজনের হাত ধরে টানতে টানতে নিজের রুমের দিকে যায়।

হতভব নায়ক। কাকে নিয়ে পড়লো বাবা!

রুমে নিয়ে নায়িকা বলে— “এবার বলতো চিনতে পারছো কি না?”

—“পারছি—” সুজন বলে— “বোখের ব্রো-হট নায়িক তনয়া।” তনয়া খিল খিল করে হেসে ফেলে।

—“নিশ্চয় ভাবছ সোনাগাছির রমা মন্ডল হয়ে গেল বোখের ব্রো-হট নায়িকা তনয়া। তাই না?”

—“না। মিথ্যার মোড়কেই তো ব্যবসার চালাকি।”

—“এবার বল কি খাবে?”

—“এক কাপ চা।”

তনয়া ঝুঁক ঝুঁক করে বলে— “তুমি এমন খাদ্য রসিক— ওষু চা?”

সুজন বলে— “ওটা অতীত।”

তনয়া বেয়ারাকে ডাকে— “হরনাথ—”

হরনাথ ব্যস্ত হয়ে ঢোকে— “ডাকলেন?”

—“দু কাপ চা—”

হরনাথ চলে যায়।

তনয়া জাঁকিয়ে বসে— “কি করছ?”

—“ফেরিওয়ালা” সুজন উত্তর দেয়।

—“তুমি হারিয়ে গেলে সুজনদা। তোমার নাটক তোমার ডাইরেকশান”...

—“ওসব অতীত! অতীতকে বোঁচাতে নেই।”

হরনাথ চা দিয়ে যায়। তনয়া সুজনের সামনে চায়ের কাপ ধরে— “চা বাও।”

সুজন বলে, “তোমার কথা বল, ওনি।”

তনয়া চায়ের কাপ ঠোট থেকে নামিয়ে বলে— “ওনলে খুশি হবে আমি নরক থেকে বেরিয়ে এসেছি।”

—“ভালো খবর! তারপর?”

—“পাঁচ বছর আগে পেপারে দেখনি অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে বিধায়ক নির্মল হালদার খুন!”

সুজন বাড়িয়া গভীর হয়ে যায়। বুকের মধ্যে বাহ্যবুরের সর্বভেদি আত্মনাদগুলো— যেন পর্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। নির্মল হালদার, বিজয় ঘোষাল, রাজা মিত্রির, মাটু ঘোষ, সুপ্রিয় মুন্সী এদের নাম কি এত সহজে ভোলা যায়!

সুজন দাঁতে দাঁতে চাপ দেয়। চোয়াল শক্ত হয়। বলে— “তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?”

—“সম্পর্ক”— বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে— “প্রথম যেদিন আমার নরক খানায়— যে লোকটাকে দেখেছিলে সেই-ই তো বিধায়ক নির্মল হালদার।”

সুজন বাড়িয়া তনয়ার মুখের দিকে গ্রন্থবোধক দৃষ্টি রাখে।

পাড়ুয়ার মেয়ে রমা মন্ডল। গুর বাবা বালির খামে ক. করত। সসোরে অনটন নিত্য সঙ্গী। টিউশনি করে মগরা কলেজে পড়ত। কলেজে নাটক করে সুনাম হয়। শেখাও ঘরে। এখানে ওখানে অভিনয় করে টাকা দেয় সসোরে। শেষে ফাঁসে পড়ে নির্মল হালদারের। কলকাতায় আরও বেশি টাকার স্বপ্ন দেখিয়ে নরকে ঘর ভাড়া করার রক্ষিতা রাখে। সেটাকে ছিঁবড়ে করে শেষে একদিন অভিনয়ের ছাড়পত্র দেয়। ছাড়পত্র ছিল একটা শর্তে নাটকের শেষে নরকে ফিরতে হবে।

তনয়া খামে। চোখে জল।

সুজন জিজ্ঞেস করে “আহলে হলো ঘোষ কে?”

—“নির্মল হালদারের চামচা।”

পর্দা সরিয়ে নায়ক ঘরে ঢোকে।

—“টাইম হয়ে গেছে তৈরি হয়ে নাও— গাড়ি এসে যাবে।” বলে নায়ক পর্দার আড়ালে মুখ সরিয়ে চলে যায়। সুজন মার্কেটিং ব্যাগ তুলে নেয় হাতে।

চোখের জল মুছে তনয়া জিজ্ঞেস করে “আবার কবে দেখা হবে?”

—“হয়তো কোনও একদিন কোনও এক বন্দরে—”

তখন থিয়েটারের রমারমা ব্যবসা। আজকের মতো থিয়েটার হল ওলো দর্শকহীন ভুতুড়ে বাড়ি ছিল না।

শেষ পর্যন্ত সুজন বাড়িয়া পালা গুনতে যায়নি। নিজের ঘরে খেরো খাতা খুলে বসে। মামা ভায়েক হোটেলের বিখ্যাত ছারপোকান কামড় উপেক্ষা করে রমা মন্ডল ওখা ব্লো-হট নায়িকা তনয়ার কথা লিখে চলে।

কয়েকজন বন্ধু মিলে রামমোহন মঞ্চ সুজন বাড়িয়ার নাটক মঞ্চস্থ করে। নির্দেশনাও সুজন বাড়িয়ার। বাড়তি দায়িত্ব মঞ্চের শৃঙ্খলা দেবার। পেশাদার অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ। সব দিকে সতর্ক না থাকলে বিপদ। কিছুদিন যেতে না যেতে অশালীন ঘটনার জন্যে এক অভিনেত্রীকে বাদ দিতে হয়। সেই জায়গায় হলো ঘোষ নিয়ে আসে রমা মন্ডলকে।

চরিত্রটা ছোট হলেও কাজ আছে প্রচুর। তার উপর সুজন বাড়িয়ার সব নাটকেই কাটা

কাটা ডায়ালগ। হাতে মাত্র তিনদিন সময়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যের শো। এর মধ্যে তৈরি করতে হবে রমাকে। সুপরে হলে বসে রমাকে রিহার্সাল করানো— পটলা বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে।

—“কী রে পটলা— বৌদি আজ কী রান্না করেছে?”

—“আমি কী করে বলব।”

—“বটে! এক চাটি খেলেই পেট থেকে বৌদির রান্না—”

—“তোমার প্রিয় খাবার— আলু পোস্ত।”

প্রতিমা পটলাকে না খাইয়ে হামীর খাবার পাঠায় না। আরও কিছুক্ষণ মহড়া দেবার পর সুজন বলে— “আপনার নাম ঠিকানা কোন নাথার সবই আছে। কাল আমি পার্টের খাতা পাঠিয়ে দেব। রমা বলে— “উহ! পার্টের খাতা নিয়ে আপনি যাবেন।”

—“সেখুন, আমি কোনও অভিনেত্রীর বাড়ি ‘ই না।”

—“কেন? অভিনেত্রীরা কি অস্পৃশ্য?”

—“না না, তা নয়। কাল আমি সারাদিন সময় করে উঠতে পারব না।”

—“বেশ তো, রাত্রে যাবেন।”

কাল সারতে সারতে রাত আটটা বেজে যায় রাসবিহারীতে। ওখান থেকে ট্যাক্সি ধরে শোভা বাজার। প্রায় নটা রাত। বহু চেষ্টা করেও ঠিকানা খুঁজে পায় না সুজন বাড়িয়া। বাধ্য হয়ে ফোন করে।

—“কে খায় আছেন?”

—“শোভা বাজার মোড়ে, মিষ্টির দোকানের সামনে।”

—“ওখানেই থাকুন, আমি যাচ্ছি।”

সুজন অস্থির হয়ে পায়চারী করে। রাত হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে হবে। না ফেরা পর্যন্ত প্রতিমা পথ চেয়ে বসে থাকবে। এমন সময় রমা মন্ডল হাজির।

—“আমি জানতাম আপনি আসবেন” রমা হেসে বলে। সুজন ব্যস্ত হয়ে বলে—“আর যাব না। বাড়ি ফিরতে হবে। খাতটা বন্ধন।”

—“কথা দিয়েছেন যেতেই হবে।”

—“কিন্তু—”

সুজনকে ধামিয়ে দিয়ে রমা বলে— “বাড়ি গেমার ট্যাক্সি ভাড়াটা আমিই দিয়ে দেব।”

আবার হার নানে রমা মন্ডলের কাছে। বি. কে. পাল পার করে রবীন্দ্রকাননের দিকে রমাকে অনুসরণ করে হাঁটা শুরু করে সুজন বাড়িয়া। তকলা পটী— ফটো বাঁধাইয়ের দোকান। মাঝখানে কানাগলি। রমা গলির মধ্যে ঢুকতে সুজন ধনকে যায়। এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। এ যে সোনালগছির হাজার দুয়ারীর এক গলি। গলির মধ্যে সারি সারি নিশিপত্রের দল। মুখে রঙ। হাতে বিড়ি। হাসা হাসি। ঢলঢল। সুজনবাড়িয়ার দুকানের ফুটো দিয়ে পরম বাষ্প বের হতে শুরু করেছে।

—“কী হল— দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? আসুন।”

—“না, নানে”—সুজন আমতা আমতা করে।

—“ভয় নেই। এখানে ভদ্রলোকরাও আসে।”

সঙ্গে সঙ্গে নিশিপদ্মদের হাসি— ঠোঙ্গাঠোঙ্গির ডেউ। সুজন রমার পিছু নেয়। গঙ্গির শেষে জব চার্নকের আমসের পলেস্তারা-খসা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। বাড়িটা দোতলা। মাঝে উঠোন। উঠোন থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে চারদিক ঘেরা বারান্দা। উঠোনে পা দিতে সুজনের গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে। শাল পাতা, মাংসের হাড়, মদের বোতল, চায়ের ভাঁড়, সিগারেট বিড়ির প্যাকেট, দোমড়ানো খবরের কাগজ। কী নেই নরক খানায়।

বারান্দায় ওঠার জন্য মুখাপ সিঁড়ি। অনেকগুলো ঘর বারান্দা ঘিরে। কোনও কোনও ঘরের দরজা বন্ধ। কোনও কোনওটায় খন্দরের আশায় নিশিপদ্মরা দাঁড়িয়ে। সুজনকে নিয়ে রমা উপর তলায় যায়। নিচুতলার মতো উপর তলায়ও বড় বড় পাল্লার দরজা। পর্দায় ঢাকা। সামনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। সুজন মনে মনে বলে এই ঘরগুলো বোধ হয় ভি. আই. পি. মের জন্য সংরক্ষিত।

—“আসুন”— বলে রমা পর্দা সরিয়ে একটি ঘরের মধ্যে ঢোকে। ঘরটি বেশ বড় মাপের। সুন্দর সাজানো গোছানো। কী নেই ঘরে? সোফা কাম বেড থেকে কাশার টিভি, ফোন। ঘরের ডান দিকে একটি দামী আধুনিক ডিজাইনের খাট। খাটে এক ভদ্রলোক অর্ধ শায়িত অবস্থায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ম্যাগাজিন পড়ছে।

ঘরে পা দিয়ে রমা বলে— “বড় যে বলেছিলে আসবে না!”

কোন জবাব না দিয়ে ভদ্রলোক ম্যাগাজিনের পাতা ওন্টায়।

—“আরে! তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোস।”

সম্বোধনে সুজন অবাক হয়। আপনি থেকে “তুমি”। ভাবে কোনও ফাঁসকলে ফেঁসে গেলাম না- ভো!

—“না, বসব না। এবার যাই।”

—“যাই মানে? যাওয়ার জন্য ঘরে ডেকে নিয়ে এলাম বুঝি?”

প্রথম পরিবেশ— তার উপর রমার কথা বার্তায় কেমন ভয় ভয় করতে লাগল সুজন বাড়িয়ার।

—“জানো, আজ সারাদিন ধরে নিজের হাতে আমি রান্না করেছি তুমি খাবে বলে।”

সুজন আপত্তি করে— “না না, তা কী করে হয়?”

রমা বলে— “কেন হয় না? জাত যাবে?”

—“না তা নয়—”

—“হ্যাঁ তাই।” রমা আহত স্বরে বলে— “তোমরা লেখকরা কলমের ডাধায় যত উদারই হও না কেন স্বভাবে তোমরা আমাদের ঘৃণা কর।”

বলতে বলতে রমা গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। সুজন বাড়িয়া বিব্রত বোধ করে। ঘরে প্রতিমা খাবার নিয়ে বসে থাকবে— না ফেরা পর্যন্ত। সুজন ব্যাপারটা বোঝার জন্যে রমার দিকে তাকায়। বড় আয়নার রমার প্রতিবিম্ব। দেখে রমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরছে। সুজন বোঝাতে পারছে না— আঘাত করার জন্যে না খাওয়ার কথা বলছে না। সুজন না খেলে প্রতিমারও খাওয়া হবে না।

—“আমার কথাটা লোভার চেষ্টা কখন—”

সুজনকে খামিয়ে রমা বলে— যে নরক দেখতে দেখতে এখানে এসে তারা কেউ কিন্তু পায়ে হেঁটে নরকের ফুলদানী হতে আসেনি। রমার আহত গলার স্বরে সুজন আরও বেশি বিব্রত বোধ করে। তৃতীয় পক্ষের সাহায্যে এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে সুজন বাদিয়া ভব্রলোকের দিকে তাকায়। ভব্রলোক কখন ঘুনিয়ে পড়েছে।

এবার রমার গলায় স্পষ্ট কামার কম্পন— “দিনের আলোয় যখন রাতের নিশিপঙ্খেরা হান করে আয়নার সামনে দাঁড়ায়— তখন আয়নায় ভেসে ওঠে ধান ক্ষেত— আয় জাম বাঁশ বাগান। অণু দুধা— পসুবাণ, অসহায় মা! তখন সুজনদা— তখন নিশিপঙ্খেরা কাদে।”

বলতে বলতে রমা ঘুরে দাঁড়ায়— “কখনও শুনেছ সুজনদা ওই সব বাঁচায় বন্দী মেয়েগুলোর কান্না?”

সুজন বাদিয়া গবেষক নয়। সোনাগাছিনা-সোনাগাজি কোনটা সঠিক নাম, তা নিয়ে গবেষণা করবে গবেষকরা। মাথা ব্যথাও নেই ও ব্যাপারে সুজন বাদিয়ার। রমা সেদিন পরম ভূষিতে শুধু খাওয়াইনি— চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল— সোনাগাজির কবর ছাড়িয়ে ট্রান লাইন পর্যন্ত নরকের ফুল ফোটাচ্ছে মানুষ নামের অনানুসারি। □

With best wishes from :

India's No-1 Pest Control Operator*

**WHITE ANTS, COCKROACHES,
SILVERFISH AND ALL OTHER PESTS**

JARDINE HENDERSON LTD.

**C/1, Hide Road (Sales & Service Office)
Kolkata-700 043, Phone : 2439-5937/6103**

Head Office :

JARDINE HENDERSON LTD.

**4, Dr. Rajendra Prasad Sarani
Kolkata - 700 001, Phone : 2220-4351 (10 Lines)**

বদনচাঁদের মা ইভা খাসনবীশ

এ তল্লাটে তাকে বদনের মা নামেই জানে সবাই। সেই কবে কারো পুরোনো কাজের লোক দেশে যাবার আগে এনেছিল তাকে। গিন্নিয়ার সামনে তেলে দিয়ে বসেছিল, এ দু'টো মাস এই বদনের মাকে দিয়ে চালিয়ে নিও। হেলির ঠিক আগে আগেই ফিরে আসব আমি। সে আর ফেরেনি। হয়তো দেশেই মন টিকে গেছে। কিংবা হয়তো আদৌ সে দেশে যায়নি মোটে, এই দিল্লী শহরেই সবুজতর প্রান্তরে চরে যাচ্ছে।

ততদিনে বদনের মা আশে পাশের আরও ক'টা বাড়িতে কাজ ধরেছে। ঠিকে কাজ হলেও বেশ মন লাগিয়ে খাটে, ফাঁকি-জুকির ফন্দি-ফিকির খেলে না আর পাঁচটা কাজের লোকের মতো। বরং বসলে পরে দু'একটা বাড়তি কাজও করে দেয়। রোগা ফ্যাকাসে ছোট খাটো মানুষটা। শরীরের কোথাও যেন মেদ মাংসের আভাস নেই, হাড়ের উপর চামড়ার আস্তরণ শুধু। ছায়ার মতো এসে করণীয় কাজগুলো করে দিয়ে নিঃশব্দে চলে যায়।

তবে মাঝে মাঝে এক আধ দিন ব্যতিক্রম ঘটে।

সকাল বেলা বদন এসে দুমদাম্ দরজার দিকটা ঘেঁরে গলা হাঁকড়ে বলে, “আমার মা আজ আসতে পারবে না রে মাসি। তেড়ে ভ্রূর এসেছে। আজকে আমি তোদের কাজ করব।”

বদনের কাজের ধরনই আলাদা। মশলাপাতি ফেলে ছেড়ে, বাসনপত্রের খনখন্ডার তুলে, জলের বালতি উলটে সারা বাড়ি তোলপাড় করে দেয়। তাই সাতসকালে বদনচাঁদের চাঁদমুখ দেখে খুশি হবার বদলে পিঙি জ্বলে যায় গিন্নিদের। অল্প দু'চারটে মোটা কাজ করিয়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে বিদায় করার চেষ্টা করে। কিন্তু বদনের ভ্রুক্লেপ নেই। হাত পা ছড়িয়ে বসে গান জুড়ে দেয়, কিংবা বাড়ির বাচ্চা-কাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করে (তখন আবার তাদের চোখে চোখে রাখতে হয় গিন্নিদের), নানা রকম এটা সেটা বায়না করে। বদনচাঁদের বয়স বায়না করার মতো নয়, বেশ হাটাকাটা জেয়ান ছেলে। তবে বুদ্ধিটা বয়স বা শরীরের সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। তাই খোলাখুলি ভাবে তার উপর রাগ দেখায় না কেউ। হাতে এটা সেটা ঠুঁজে দিয়ে পিছু ছাড়ায়।

প্রায় বছর দেড়েক চলল এ ভাবে। আগে এপাড়ায় কয়েক হস্তা যন্ত্রণা কাজের লোক বদলাত লোকে। মনের মতো হত না কেউই। কারো কাজ পরিষ্কার নয়, কারো হাটটান, কারো বা সময় জ্ঞানের দারুণ অভাব। সর্বোপরি যখন-তখন দেশে যাবার হিড়িক। যে কোনও ফিকিরে। বদনের মাকে পেয়ে তাই এ পাড়ার বাসিন্দারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু তাদের কপালে সে সুখ সইল না বেশি দিন।

পুরো এক হস্তা ধরে বদনের মার দেখা নেই। এরকম কখনও হয়নি এর আগে। বদনেরও হদিশ মেলেনি এ ক'দিন। শেষকালে পাড়ার দুই করিখকর্মী মহিলা গিয়ে হাজির হ'ল যমুনা পারের বস্তিতে। ফিরে এসে সোচ্চারে সারা পাড়া সরগরম করে তুলল। সংবাদ শুনে মহিলাারা স্তম্ভিত, হতবাক। বদনের মা নাকি বিয়ে করেছে। মিসেস রাও আর মিসেস কাপুর স্বচক্ষে দেখে এসেছে বদন চাঁদের নতুন বাপকে। কাসো পাতলুন আর চেককাটা বুশ শার্ট

পর্যন্ত লালটু মার্কা একটা ছোকরা। ছুঁচলো গোফ, হাতে হাত ঘড়ি, চোখে সবুজ চশমা। বদনের মা চুলে ট্যাশেল দিয়ে প্রকাণ্ড বড় খোঁপা বেঁধে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরেছে। পায়ে চল্লিশ।

কারওই বিশ্বাস হতে চায় না প্রথমটা। বদনের নার বিয়ের বয়স আর আছে কী না সেটা আসল প্রশ্ন নয়। বদনের না সম্বন্ধে ব্যাপারটা যে কল্পনাই করা যায় না। হাজার মাথা ঘামিয়েও রহস্যের কিনারা করতে পারে না কেউ। গত দেড়টা বছর ভারী আরাম ও নিশ্চিন্ততায় কেটেছে পাড়ার গিন্নিসের। ওর মতো কাল্পের লোক আর হয় না, ও রকম আর কাউকে ছোটানোর স্বপ্ন স্বপ্নই শুধু। তাই মহিলারা দূর থেকে বদনচাঁদের মায়ের গতিবিধির উপর নজর রাখে। প্রাণে ধরে ঝপ্ করে তাকে খরচের খাতায় ফেলতে পারে না। রাস্তাঘাটে বদনচাঁদকে দেখতে গেলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে, সমস্তে বসিয়ে কুশল প্রশ্ন শুধায়, আর তার মায়ের মতিগতি আঁচ করার চেষ্টা করে।

বদনচাঁদ মহিলামহলে তার এই নবলব্ধ স্বাতিরযন্ত্র দক্ষগতাবে উপভোগ করে। স্বাক্ষিয়ে বসে গল্প শোনায়। তার নতুন বাপ নাকি দড়ির খাটায় গুয়ে পড়ে থাকে সারাদিন। কখনো কুঁড়ে ঘরখানার মধ্যে কখনো বা খোলা বাতায়ারি আঁকিনায়। বদন আর তার মা মিলে রোজ তার মলাই মলাই মালিশ করে অনেকক্ষণ করে। রাত বিরেতে প্রায়ই ডিউটিতে যায় বাপ, মাঝে মাঝে দু'তিন দিন কাটিয়ে বাড়ি ফেরে।

এরপর একদিন শোনা গেল বদনের মার অসুখ করেছে। মিসেস মহেন্দ্র ওদিকে গিয়েছিল। দেখেছিল মুখচোখ ফোলা ফোলা।

"ছেলেপুলে হবে হয়তো!" টিটনি কটল কেউ।

কিন্তু কথাটা এমনই অসম্ভাব্য যে মন্তব্যটা যে নিছক ঠাট্টা সেটা সকলেই বুঝতে পারল। ওই হাড়-চামড়ার শরীরে আছেটাই বা কী? ফুডুৎ করে উড়ে যাবে কোন দিন। অত বড় খোঁপা আর কুঁচি দিয়ে পরা শাড়ি সামলায় কি করে সেটাই তাৎক্ষণিক ব্যাপার। বরং ওর সার্বকিক বড়ির মতো খোঁপা এবং ঝাটো শাড়িতেই বেশি মানাতো বদনের মাকে, অনেক বেশি সাক্ষীল মনে হত।

বদনচাঁদকে প্রথম দিকে ডেনে এনে ভিতরের খবর জানানোর চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে কারবার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, খেঁবে কুলায় না। তাই এখন আর তাকে বিশেষ পাখ্য দিতে চায় না পাড়ার গিন্নিরা। তবু বদনচাঁদ নিয়মিত এসে তার নতুন বাপের নিত্য নতুন কার্যকলাপ শুনিতে যায়। ওদের ছাগলটাকে বিদ্যে করে দিয়েছে বদনচাঁদের নতুন বাপ, 'গাইয়াদের কারবার' বলে। বদনের অত সাধের ট্রানজিস্টারটাও সেই আর। বদনকে নাকি ইকুলে ভর্তি করে দেবে। লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হবে সারাদিন ট্রানজিস্টার নিয়ে থাকলে, তাই অভ্যাস শোধরানোর জন্যে আগে ভাগেই সরিয়ে দিয়েছে সেটা।

শেষমেষ শোনা গেল নতুন বাপ বাবুপাড়ায় ঘর বুঁজতে গিয়েছে। বস্তি ছেড়ে বাবুপাড়ায় গিয়ে থাকবে ওরা। বদনের মা আর বাড়ির বাহিরে বেড়াবে না হুঁ হুঁ করে। বাড়িতে বসে গিন্নিদের মতো গ্যাসের চুলায় রান্নাবান্না করবে। এর পরও বদনের সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হয়েছে বার কয়েক। তবে আগের মত অত ঘন ঘন পড়ায় আসে না আর। নতুন বাপ বদনের সহিষ্ণুতা নিয়ে সেই যে ঘর বুঁজতে গেল আর ফিরে আসেনি। এ পাড়া থেকে বড়িটা দূর আছে বেশ। ওর না নেহাৎ পেটের দায়ে কাজে আসত। শুধু শুধু অতখানি পথ হেঁটে পাড়ি দেওয়া বদনের পোষায় না।

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সবওকু মাস তিন চার লেগেছিল। তারপর আবার সেই 'পুনর্নবিক ভাব'। বদনের মা কাজে আসতে শুরু করল আবার। সুবিধের মাথা এখন আর অতদূর রাস্তা পাড়ি দিতে হয় না। ওদের যমুনাপারের কুঁড়েঘরটা কাকে যেন বেঁচে দিয়ে গেছে বদনের নতুন বাপ। বদনের মায়ের অভ্যাসে। সে উধাও হবার ক দিন পরেই কুঁড়েঘরের নতুন মালিক এসে উৎসাহিত করেছে ওদের। আজকাল বদনের মা বদনকে নিয়ে পটপড়গঞ্জে ননদের কুণ্ণগিতে থাকে। রাতে ঘরের এক পাশে মাদুর বিছিয়ে শোয়। শোবার জায়গাটুকুর জন্যে ভাড়া দিতে হয় ননদকে। এ ছাড়া নিজেদের খাবার দাবার যা জোটে তার থেকেও ভাগ দিতে হয়। তবু মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় পেয়েছে সেই ঢের।

মাস দুয়েকের জন্যে কলকাতা গিয়েছিলাম। যেদিন ফিরলাম ট্রেন লেট ছিল। বাড়ি পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল। পরদিন সকালে সবজি কিনে ফিরছি, রাস্তার মোড়ে দেখি বদনচাঁদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা কাঠি দিয়ে নিবিষ্ট মনে দাঁত খুঁটেছে।

আমাকে দেখে মুখ থেকে কাঠি বার করে বলল, "মাসি, কোথায় গেছিলি?"

ঘেসেটার ওই রকম তুই তোকারি করে কথা বলা অভ্যাস, সকলের সঙ্গেই। অনেক বলেও শোধরানো যায়নি। ওর প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে মাথা নাড়লাম। বদন আমার পিছু নিল।

"ও মাসি, খবরের কাগজে আমার বাপের ছবি বেরিয়েছে, দেখেছিস?"

আমি আবার মাথা নেড়ে জোরে পা চালিয়ে দিলাম।

বাড়ি এসে নানান কাজের মধ্যে ভুলেই গেছি কথাটা। দুপুরে আমার আগমনবার্তা পেয়ে পাড়ার মহিলারা দেখা করতে এল।

সমবেত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "একটা সাংঘাতিক খবর শুনেছ?"

ওনল্যাম বদনচাঁদের মা যে ছোকরাটাকে ঘরে এনেছিল সেটা একটা খুন্সী। সম্প্রতি সাউথ দিল্লীতে পরপর কয়েকটা অল্পবয়সী মেয়ে খুন হয়ে গেছে। মজুমদারী ছোকরা বাড়ির অল্পবয়সী কাজের মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে অভিশারের অল্পহাতে বাড়িতে ঢুকে প্রেম পর্বের পর মেয়েটাকে হত্যা করে বাড়ির দামী জিনিসপত্র নিয়ে কেটে পড়েছে। পরপর তিনটে খুন, স্বয়ং একই ছকে সাজানো। একটা কেসে বদনচাঁদের মায়ের সেই ছোকরাটা ধরা পড়েছে। মেয়েটাকে খুন করে জিনিসপত্র নিয়ে পালাবার সময় দেখে ফেলেছিল কেউ। আর পালাতে পারেনি। লোকটা ওই একটা মেয়েকেই খুন করেছে না কী আগের ঘটনাগুলোতেও ওর গাড আছে তা নিয়ে খানাতদন্ত চলছে।

"কব্বেকার খবর এটা?"

"লোকটা ধরা পড়েছে মাসখানেক আগে। পুরনো কাগজ খুঁজলে লোকটার ফটো পাব। হাতে হাতকড়ি লাগানো।"

"আর বদনের মা?"

"ওর সঙ্গে তো কবে সম্বন্ধ চূকে গেছে। গরীব মানুষের পুঁজিপাতি কেড়ে নিয়ে কলা দেখিয়ে গেছে।"

"কিন্তু ওই নিঃস্ব গরীব মানুষের কাছে এসেছিলই বা কিসের লোভে? কোথায় সাউথ দিল্লীর কোটিপতিরা আর কোথায় বদনের মা?"

“হয়তো গা ঢাকা দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিছুদিন আরাম করে গেল। দাসীবাঁদির সেবা শুক্রবা ভোগ করল। দু’বেলা বেঁধে বেড়ে খাওয়ানো, গা-গতর মালিশ করে দেওয়া, এসব পাবে কোথায়? তার উপর ছাগল, ট্রানজিস্টার আর কুঁড়েঘরখানা বেচেও কিছু লাভ হল। সাইকেলটাও বেচেছে নিশ্চয়ই। লোকটার অপরাধপ্রকৃতা বহুমুখী। খুন, জোচ্ছুরি, ছিটকে চুরি কোনো কিছুতেই অকচি নেই।”

জানলা দিয়ে দেখলাম বদনের মা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। এক বাড়ির কাজ সেয়ে অন্য বাড়িতে যাচ্ছে এখন। একটা আবহময়লা ছাপা শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরে ঘাড়ের উপর ট্যাশেল বাঁধা খোঁপা ঝুলিয়ে নিষ্প্রাণ মুখে এগিয়ে চলেছে দম দেওয়া পুতুলের মতো। ☐

উত্তর ২৪ পরগণা নোনাঙ্গল মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা

মীনডবন ● বারাসাত

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চিংড়ি ও নোনা মাছের
চাষ করে স্বনির্ভর হোন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করুন।

- ★ নোনা জলে মাছ চাষের জন্য ‘অ্যাকোয়া কালচার অথরিটি’র কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করুন।
- ★ মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য মৎস্য দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করুন।
- ★ বাগদা মীন সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে জীবিত মাছগুলি নদীতে ছেড়ে দিন।
- ★ চিংড়ি চাষে খাবার পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্যক জ্ঞান অর্জন করুন।
- ★ ব্যাঙ্ক ঋণ ও সরকারী অনুদান গ্রহণের সুযোগ নিন।
- ★ নোনা জলে মাছ ও চিংড়ি চাষে নদী বাঁধের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকুন।

শ্রীমতী অপর্ণা ওগু

সভাপতি,

উত্তর ২৪ পরগণা নোনাঙ্গল মৎস্যচাষী

উন্নয়ন সংস্থা, বারাসাত

ও

সভাধিপতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ। জেলা শাসক, উত্তর ২৪ পরগণা।

শ্রীঅরুণ কুমার কর

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক,

উত্তর ২৪ পরগণা নোনাঙ্গল মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা।

সূর্যাস্ত মনোজ ব্যানার্জী

সকালের খবরের কাগজ পড়তে আমার মন চায় না। কাগজ খুলে প্রতিদিন ব্যান্ড-ডাকতি, ধর্ষণ, রাজনৈতিক খুন ইত্যাদি দেখতে দেখতে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। অথচ কাগজ না পড়লে নয়। তাই রাতে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ি।

কয়েকদিন ধরে বিছানায় পড়ে আছি। মূত্র ব্যাধিতে ভুগছি। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন। কয়েকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে হয়েছে নির্দেশ মতো। সময় আর কাটে না। দিনগুলোকে পাথরের মত ভারী মনে হয়। এক-একটা দিনকে মনে হয় যেন মাস। ইঠাং খবর এল, রাজনৈতিক দমনালিতে শ্যামল নিহত, আপনি একবার এসে ভালো হয়। মৃত্যুতের জন্য আমিও সন্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে কি শ্যামলের কাগজে পড়া নিহত হতভাগ্যের মধ্যে শ্যামলও একজন? কিন্তু আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে বাইরে যাওয়া অসম্ভব। সুস্থ হলে যাওয়ার চেষ্টা করব জানালাম। মনটা বিষয় হয়ে গেল।

মনে পড়ল, অনেকদিন আগের কথা। ভোটের কাজে প্রিজাইডিং অফিসার হয়ে মেদিনীপুরের এক অল্প গ্রামে এসেছি। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থান বাড়িতে মালপত্র রেখে গ্রামের রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়েছি। রাত পোছলেই ভোট।

হাঁটছি তো হাঁটছি। গ্রামের মেঠোপথ। দুধারে ধান ক্ষেত। চাষীরা ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে। চলতে চলতে একটা দীঘির কাছে এসে আমি প্রথমে দাঁড়ালাম। দেখলাম তের-চৌদ্দ বছরের এক কিশোরী ভেজা গায়ে দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে। একটা ছেলে জলে ডুব দিয়ে ওর নির্দেশ মতো কী যেন খুঁজে চলেছে।

মেয়েটির নাম জানলাম মধুমিতা। গ্রামের মেয়ের অমন আধুনিক নামে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। মেয়েটি সুন্দরী নয়। ডাগর ডাগর চোখ, মাথার চুল টেউ খেলানো। খুঁটিয়ে দেখলে হয়ত খুঁত পাওয়া যাবে। কিন্তু এক নজরে খারাপ লাগে না। ওর কানের দুল জলে পড়ে গেছে। ছেলেটি জন তোলপাড় করে সেটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ওর নাম শ্যামল।

শ্যামল একটু পরেই কানের একটা দুল মেয়েটির হাতে দিয়ে হান করতে লাগল। দুলটা নেওয়ার সময় ওর গোলাপী ঠোটে আমি যেন ড্যাফোডিলের হাসি দেখতে পেলাম।

শ্যামলকে নিয়ে কেন জানিনা আমার কৌতুহল হল। দাঁড়িয়ে রইলাম।

বয়স কুড়ির কাছাকাছি। সুঠাম গঠন, মাঝারী রং। নির্বাচন কেন্দ্রে ঢোকানোর আগে ওর বাড়িটা দেখিয়ে ও আমাকে বলল, একটু পরে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

সন্ধ্যাবেলা কিছু রাজনৈতিক দলের লোকেরা এল।

সেখানায় শ্যামলকে এখানে সবাই চেনে। সেও কোনও এক রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সমর্থক। ভীষণ পরোপকারী। মাঝ রাত্রে কারও বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়েছে শুনে দল মত বাছবিচার না করে ছুটে যাবে। যে কোনও প্রয়োজনে শ্যামল পাড়ার লোকের একটা কড় তরসা। এসব শুনে শ্যামলের প্রতি আমার আকর্ষণ আরও দূর্বীর হল। আমি আর অপেক্ষায় না থেকে ওর বাড়ির দিকে এগোলাম।

টালির ছাদ। মাটির পেওয়াল। বাড়ির সামনে বেড়া দিয়ে সবজী গাছ লাগানো।

পরিচয় পেয়ে শ্যামলের মা ভেতরে নিয়ে গেলেন। শ্যামল সেই বিকেলে চান করে আশার পর থেকে ছুরে আক্রান্ত। আমাকে দেখে উঠে বসতে চাইল। আমি না করলাম। শ্যামলের মা আমাকে অনুরোধ করল ওকে একটু বোকাতে। ভোট আসে যায়। কিন্তু চিত্র বদলায় না, সাধারণের অবস্থার উন্নতি হয় না।

ওকে রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় কেউ না কী কথা দিয়েছে যে ভোট হয়ে গেলে ওকে গ্রুপ-ডির চাকরি দেবে সরকারি অফিসে।

আমি ওকে নিজের শরীরের প্রতি অবহেলা করতে নিষেধ করলাম। ভোট কেন্দ্রে হাওয়ার আগে আমার বাড়ির ফোন, মোবাইল নং ঠিকানা দিয়ে এলাম।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। নাগরিক জীবনের নানান ব্যস্ততা ও কাজের মধ্যে শ্যামল আর মধুমিতার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

সেদিনটা ছিল শুক্রবার। অফিসের কাজ সেয়ে ফিরতে বেশ পেরি হয়েছে। ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নিছিলাম। প্রায় মাস। ওড়ি ৬. বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া দিচ্ছে। আকাশে বিদ্যুতের বলকানি, এমন সবর শ্যামল এল।

প্রথমে আমি চিনতে পারিনি। একগাল দাড়ি। আমাকে পারে হাত দিয়ে প্রশ্নাম করল। বললাম, কেমন আছ শ্যামল? চাকরি হয়েছে? শ্যামল উত্তরে মাথা নিচু করল।

সেদিন এই দুর্ভাগের মধ্যে শ্যামলকে আর যেতে দিলাম না। স্নাতে খাবার টেবিলে কথায় কথায় মধুমিতার কথা উঠল। অনেক কথাই বলল, আমি বুঝলাম দুজনে দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসে। বললাম, তোমাদের ভালোবাসার সুমিষ্ট পঙ্খ আমি ভোটের আগের দিন মীথির পাড়ে পেয়েছিলাম। কিন্তু এভাবে কি চলবে? একটা কাজকর্ম কিছু না করলে বিয়ে করবে কী করে? আমি বলি কী একটা ছোটখাটো ব্যবসা-ট্যাবসার চেষ্টা কর। আমি না হয় তোমাকে কিছুটা সাহায্য করব। শ্যামল কিছু বলল না।

এর পরেও শ্যামল বার কয়েক এসেছিল। আমি প্রতিবারই চাকরির প্রশ্ন করছি। প্রতিবারই এক উত্তর— এখনও হয়নি, আশা করছি, শীঘ্র হয়ে যাবে। বললাম, চাকুরি পেয়ে মধুমিতাকে নিয়ে ঘর সংসার কর। সে দিনটির জন্য ও তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। আমাকে নিমন্ত্রণ করো। শ্যামল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে।

অসুখের মধ্যে শ্যামলের মৃত্যু সংবাদ আমাকে বিচলিত করলেও যেতে পারিনি। গিয়েছিলাম তিন চারমাস পরে। আমাকে দেখে শ্যামলের মা কাশ্মার ভেঙে পড়লেনঃ আমার কথা শুনল না, আপনায় সাহায্যের হাতখানাও ধরতে পারল না। আমার কী হবে স্যার, আমি যে একেবারেই নিরথ হয়ে গেলাম।

কোনও সাহায্যের কথাই সেই মুহূর্তে আমার মুখ থেকে বেরলোনা। বিধবার একমাত্র সম্বল চলে গেছে, তার আকাশ থেকে সূর্য বসে গেছে। তার ভগ্ন জীর্ণ হৃদয়ের কল্পনাকায় আমাকে বিধ্বস্ত করতে লাগল।

ফেরার সময় বাড়ির বাইরে বাবলা গাছটির তলায় দেখলাম মধুমিতা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গভীর চোখদুটির মধ্যেও যেন অনেক প্রশ্ন সঞ্চিত হয়ে আছে। সে চোখেও যেন সূর্যহারা জমিট অন্ধকার। কী বলব তাকে? সেও তো অন্তরে আত্ম একা। আলতো করে মাথায় হাত রেখে বললাম, ভালো থেকো।

মধুমিতার জন্য আমার কিছু করার নেই। তার মা-বাবা আছেন। কিন্তু শ্যামলের মার জন্য কিছু করা যায় কীনা ভাবতে ভাবতে গাড়িতে উঠলাম। □

ক্রাচ

বেটো-ট ব্রেখট

অনুবাদ : দিগম্বর দাশগুপ্ত

ক্রাচে ভর ছাড়া হাঁটতে পারি না হবে তা বছর সাত
 দেখাতে গেলান ডাক্তার এক, আছে বেশ নাম ডাক
 আমকে দেখেই প্রশ্ন করেন 'মিছে কেন দুই হাত
 জোড়া করে আছ লাঠি জোড়া নিরে'— তনে আমি হতবাক
 হয়ে বলি তাঁকে 'রেক্ষেছি কি সাথে, মিছে এই লাঠি জোড়া'
 হাঁটতে পারি না স্বাভাবিকভাবে, পা-দুটি আমার খোঁড়া।'
 তনে তিনি কন, 'এ আর এমন নূতন কি কথা হল?
 পায়ে ভর করে হাঁটা শুরু করো, এদের ভরসা ভোলো।'
 —এ কথা বসেই পরম মতনে পা-দুটি আমার দেখে
 জোড় করে কেড়ে লাঠি জোড়াখানি বগলের তলা থেকে,
 দানবের মতো সে কী বীভৎস অটুহাস্য হেসে
 ক্রাচ জোড়াখানি ভাঙলেন তিনি আমার-ই পৃষ্ঠ দেশে।
 তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন, ফলতঃ এখন আমি
 হাঁটি চলি বেশ সুস্থ হয়েই, মলে তাঁর ওই হাসি
 কেবল যখন চোখে পড়ে কাঠ,— তখন-ই একটু খামি'
 কিছুটা সময় ঈষৎ খোঁড়াতে সেই ক্ষণ ভালোবাসি।

॥ বদমায়েশীর মুখোশ ॥

একটা জাপানী মুখোশ রয়েছে আমার ঘরেতে টাঙানো
 গালা দিয়ে গড়া, বার্ষিক করা, সেনাসী রঙেতে রাজানো
 সেটা এক বদ্ নর-পিণ্ডাচের যেই দেখি ওটা চেয়ে
 কি জানি কী এক সমবেদনায় চোখে জঙ্গ আসে বেয়ে
 কপালের ওর ফোলা শিরা ওলো বলো যেন খুব-ই স্পষ্ট
 বদমাশ সেজে থাকটা জীবনে সে কী নিদারুণ কষ্ট!

আবহাওয়া

অনন্ত দাশ

কাল দুপুরে সাড়ে ছত্রিশ ছিল
আজ সকালে সাঁইত্রিশে গেছে বেড়ে
তাপমাত্রা কীভাবে থাকবে ঠিক
প্রতিদিনের আবহাওয়ার হেরফেরে

দুধুতিরা ঘুরছে রাত্রিপথে
হুঁড়ছে ঢিল গিলে মারছে পাথর
আতঙ্কিত রয়েছে সারা পাড়া
খুন-স্বপ্ন হচ্ছে রোজ ববর

রাত পাহারা রয়েছে মোড়ে মোড়ে
দুটো পুলিশ ঠায় থাকছে বসে
দূরাকাশে ফুটছে যেন বৈ
একটা-দুটো ছিটকে পড়ে বসে

জীবন কত মূল্যবান জানো
পুলিশ জিপ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে
একটু দূরে যাবে যখন চলে
চাব্বের নেশায় ঘুরবে মোড়ের বাঁকে

হাসপাতালে তখন উল্লস ঘুবা
মৃত্যু সাথে যায় পাক্সা লড়ে
পুলিশ জিপ দুবার খেল পাক
আকাশ থেকে তারা পড়ল করে

কাল রাতে সাড়ে ছত্রিশ ছিল
আজ সকালে শূন্যে এল নেমে!
প্রতিদিনের আবহাওয়ার হেরফেরে
জীবন বিমার প্রিমিয়াম যায় খেমে

বধির

শিবব্রত দেওয়ানজী

চিৎকার করে বললাম
ওদিকে যেয়োনা
বেড়াটা টপকে যে কেউ ঢুকে যেতে পারে
এমন কী বৃশও
বাবা বলতেন সাবধানের মার নেই
তাই সাবধান ভালো

চিৎকার করে বললাম
ওকথা শুনতে নেই
শুনলে বিপদ
অথচ টনি শুনল না
ও কথা শুনতে শুনতে
টনিটা বধির হয়ে গেল।

চামড়া ফেটে রক্ত পড়ে

কক্ষা বসু

হাত খন খন পা খন খন বাজনা বাজে, শোনো,
পায়ের তলায় কঁকর কঁটা আক্র তো নেই কোনো!

চামড়া ফেটে রক্ত পড়ে রক্তমাখা মাটি,
রক্তারক্তি লড়াই করে রক্ত পথে হাঁটি।

পথ চলা তো নিষেধ ছিল ঘরেই বন্দী নারী,
সুসভ্যতার সঙ্গে ছিল বিবম আড়াআড়ি।

আজকে পথে চলতে এসে কঁটা বিধছে পারে,
হাওয়া উঠছে ঘুলিয়ে খুব ঝড়ো চলার যায়ে।

না, যাবো না, ঘরের মধ্যে রক্ত পড়ে পড়ুক,
রক্ত-আলপনার মধ্যে হৃদয়পিণ্ড নড়ুক।

উঠতে মার বসতে মার মারেরই সভ্যতা,
নারী মেথের যন্ত্র-ঘোঁরা উঠছে যথাতথা।

পায়ের থেকে রক্ত পড়ে পা তো ছিল ঢাকা,
লৌহ জুতোর বর্মে ছিল পা দুখানি রাখা!

আজকে পথে বেরিয়ে পড়ে পা হয়েছেন লাল,
এলোমেলো পা পড়েছেন অসংলগ্ন চাল!

লগ্ন কিসের অসংলগ্ন মিলন লগ্ন কই?
সত্য এবং সম্ভাবনার মিলন মন্ত্র, সেই,

সই গো তোদের সঙ্গে আমার, রক্ত মাখা চলা,
রক্ত দিয়ে অক্ষ দিয়ে নতুন গল্প বলা।

ভাল লাগেনা এসব গল্প, মিষ্টি গল্প চাই?
মিষ্টি মুখে অরুচি হয় বিবম যাচ্ছে তাই।

যাচ্ছে তাই-এর গল্প বল যাচ্ছে তাই এর কবি,
ও মেয়ে তুই রক্ত লিখিস রক্ত-কত ছবি!

সাহচর্য

শংকর চন্দ্রবর্তী

বত্রিশ বছর পর ফের তার সঙ্গে, হাত ধরাধরি হেঁটে যাই অজন্ম মাইল
গোপনে মাথায় ছিল কিছু শব্দ, পাভা-ঝরা একটি শিউলি গাছের দুলে ওঠা...
হাঁটতে হাঁটতে নিম্নাঙ্গীন ওই
গাছটি পেরিয়ে যাই, মুঠোয় তোমার হাত ধরে আছি শক্ত করে— মফে উঠে যাব
প্রবল হাততালি ক্রমে সঙ্কারিত হতে থাকে পেছনের সারি থেকে রান্ধা ফুটপাথে
দীর্ঘ ছায়া সবকিছু ছাড়িয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে, নৃত্যরত
ছায়াগুলি পাশাপাশি হেঁটে যায় বাড়ি থেকে, আমরা চিন্তায় আছি এত বিস্ময়গ
ছিল না কখনও আগে, হাত অবিকল শীতে মুক্ত হয়ে যায়
একটু উষ্ণতার জন্য খুঁজি আলোয়ান, হেঁটে পার হয়ে যাই বন্ধু, অতীতের মুখগুলি আরও
হেঁটে গেলে একটি মাত্র পোশাকেই পুনর্বাস আমরা দু'জন দেখা করি
পরস্পর দুঃখ কিংবা সুখের ইঙ্গিতে আভ
অন্তত পিছনে চলে যায় শীত, উষ্ণতার আধারে গোপন শব্দাবলী।

কলহ

তত্ত্বব্রত চন্দ্রবর্তী

সাতকাহনের পর আমরা সেই নতমেঘ বোধির আকাশ। এবং নিভ্রামুহূর্তের দিকে
রাতকানা সব তারার দল। না মৃত্যু না জন্ম
দুই নেত্রের ভেতর অন্ধের মূর্ছাসূচি ঘিরে ক্রমশ কিছুই দেখি না আর।
এভাবেই কাটে কাল, ব্যাধিকাল, রতিনার সংসারের ছিন্ন থেকে বেরিয়ে
মুখচোরা মোমশিখার তলায় কেবল বেঁচে থাকে প্রেতভূমির শীতল উচ্চারণ। ছায়া
দীর্ঘ কলহের ছায়া, ছড়িয়ে পড়ে যখন গুহাগাত্রের মেধায়, খুলে যায়
আমাদের ছয় বাদুঘর। সজ্ঞাগের ইতিহাস খেয়ে কাঁসার পাত্রের শব্দ
একে রাখে বিষ অসুখের বিরহ গোধূলি; আঁকে ছলনা পোশাক, ছলনা বিবাহ
ছলনা প্রসাধনে বর্ণময় চতুর স্বপ্ন। পংক্তিতে পংক্তিতে তখন
পরিভ্রান্ত ঘটি ও বাটের প্রণয় ঠোঁকঠুকি। কথা বাড়়ে, চতুর্মুখে ফণাসত্রের হিম;
অন্যায়সে ধারালো দাঁত বসিয়ে দেয় বুকে পিঠে অন্ধরের প্রতিটি শরীরে।
আমরা সব বধির হতে থাকি সেই সাতকাহনের পর এবং নিভ্রামুহূর্তের দিকে
রাতকানা। কলহ, দীর্ঘ ছায়ায় কলহ পরিশেষে চৈত্রের স্তব্ধ ধূলিঝড়।
বাতাসের নিঃশব্দে একমাত্র প্রাণকথা ফেরে।

বিরহবৃত্তান্ত

মনোজ নন্দী

কে গিয়েছে ছেড়ে আগে এইসব নদীর কিনার
বৌবন অথবা প্রেম কিংবা প্রত্যয়?

ধু ধু মাঠ শূন্য পড়ে আছে
নিষ্ফলা ক্ষেতের আলো আজও তবু শঙ্খমিলন বাহার
সারাটা সময়...

আমাদের গ্রাস করে বিপন্নতা ভয়
ভেঙে পড়ে সার সার অক্ষরবিহীন রাধাচূড়া
দেবদাক্ষবীথি

নিঃসঙ্গতা ছুঁয়ে যায় অশরীরী আগুনের আঁচ—

বিকেল গড়িয়ে যায় শব্দহীন অন্ধকার স্রোতে।

পৃথিবীকে

অজ্ঞান নায়ক

আমার সবকিছু দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি
পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে
ষড়্ অচেনা লাগে ভাবনার ঘরে জমে থাকা
পরিচিত অবয়ব। চুরমার করার খেয়ালে
ভেঙে ফেলি ফুলদানি। না পাওয়ার বেদনাগুলিকে
নীরবে জ্বালাই।

অপসব চেয়ে থাকি
বারবার দূরত্ব ছুঁয়ে ফিরে আসি
হতাশার ঘুণ কুরে কুরে খায় হৃদয়
মৃত্যুর স্বাদ আমার ভালো লাগে।
মহামান্য পৃথিবী
আমার মৃত্যু হলে
মাতৃস্তনে ফিরাও আবার
কবিতার নিঃশ্বাসে দুলব তালে তাস...

এবং দিনলিপি

পীযুষ ধর

১. কিছু ভালোবাসা নিয়ে, বুকের ভেতর
সব কটি জানালা উদাস করে
যখন বাতাসে
নির্মেলিকা পড়ি...
লোমকূপে সমস্ত শরীর
লবণ সাগরে
পতন প্রণালী লিখে। তীব্র বর্ণ সুখ
জড়গৃহে ডগমগ করে
আশ্চর্য উচ্ছ্বাসে ভাসে ঝপ।
২. ডলারের গোপন চেষ্টনা
সংক্রমিত হয়...
ক্রয় সংক্রান্ত ভাবনার খোলস-সেলাই
প্রেম-পত্রে বিক্রি হয়ে যায়
উদাসীন মানুষের সব অধ্যাপনা।
৩. জলের বিপ্লবে নদী যেমন ভাসায়
খাব্যের তালিকা
তবুও চন্দ্রমুখী নদীকে শাসন করে
সেতু বাঁধে দুই দিক জুড়ে...
৪. অথচ...
৫. শহর জানে না, এই মুহূর্তে অচেনা
কিছু ভালোবাসা
কক্ষ পথে ঘুরে ঘুরে খুব কাছাকাছি
জমেছে গ্রামীণ মেঘ... কেড়ে নিতে
অতঙ্ক সময় লেখ... মগ্ন দিনলিপি।

প্রেমদিনে

সুকুমার চৌধুরী

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।

স্তব্ধতাকে পড়ি। আজ প্রেমদিন।

কত কোলাহল করেছি প্রেম নিয়ে।

চিঠি ও চক্কর কত। কত অভিমান।

কত ডোরবেল, ফুল, সুগন্ধী রুমাল।

হাতচিঠি, দূরভাষ, সিটি ও শাটার।

মনে পড়ে আর আজ তপ্ত প্রেমদিনে

প্রাণ এক হৃবিরতা চেপে রাখে আমার আগুন।

এতদিন উন্মত্ত থেকেছি। বরফকুটির মতো

হতো দিয়ে দিয়ে হয়েছি সজল।

আজ স্তব্ধ বসে থাকি। দেখি কত

ডোরবেল, দূরভাষ, চিঠি ও চক্কর, সারিগান

বাইরে প্রেমদিন। বাইরে উচ্ছ্বাস.

একতরফা আগুন। বসে থাকি, চুপ

প্রস্তরীভূত

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

পাথর কেটে বেরিয়ে এসেছে জন, উত্তর চিংকার
জলের সংলাপে কত কী প্রবহমানতার ছবি...

সেসব বুঝতে বুঝতে সময় পেরিয়ে গেল
এসে দাঁড়াল অনন্ত রাত না-বোঝবার
যন্ত্রণা নিয়ে

তার পতনের ভেতর সঁপে দিলাম নিজেকে
সেই থেকে আর ঘুম ভাঙেনি রাত্রির!

ইরাক যুদ্ধ এক

নমিতা চৌধুরী

যুদ্ধকে বহন করে আনে যে হাওয়া
তাকে কী দিয়ে রুখে দেবে ওই কিশোর বালিকা
যাবতীয় খেলনা ফেলে স্বতনত্বীন মরুপথে কোথায়
কোথায় পৌঁছে দেবে ভবিষ্যত ওরা কী জানে!
ওরা তো যুদ্ধ চায়নি কখনো
ওদের বাবা মা প্রতিবেশি কেউ নয়
তবে কেন বোমারু বিমান সাজোয়া বাহিনী
আকাশ বাতাস দাপিয়ে রাভিরের ঘুম কেড়ে নেয়
আর কত মৃত বিকলাঙ্গ অনাথ শিশুর জন্য
কেনে উঠবে টাইগ্রিস নদীর স্নান স্নানজল।

এই উপত্যকা

বিশ্বজিৎ রায়

এই উপত্যকা থেকে দূরে তাকালে
আমাদের মস্তপাঠ নাকি অশুদ্ধ হয়;
বাতাসে ঢুকে পড়ে বিব, জঙ্গলের সঙ্গে আসেনিক...

তাই আমরা চোখে ঠুলি এটে থাকি,
আমাদের সহিসরা যা যা খেতে দ্যান তাই খেয়ে জাবর কাটি
আর কখনো অসাবধানে ঠুলি খুলে গেলে
সামলে নিয়ে বলি— বাঃ, সবই চমৎকার!

অতএব নির্ভাবনায় আমরা এখানে চারুকলা প্রদর্শন করতে পারি
যে কোনো বিভ্রান্তি দূরে রেখে উপত্যকা চমকিত করতে পারি বিস্তর
আমাদের যা কিছু স্বপ্ন সহিসদের কাছে গচ্ছিত রেখে আমরা
চোখে বুজে বসে থাকি নিশ্চিন্তে...

অভিন্ন জকিরা বলেন—
এই উপত্যকায় রাত নাকি বড় দীর্ঘ—

ভূমি

কাশীনাথ দাশ চাকলাদার

কোনো কোনো দিন রাতি, একান্তই যেতে চাই ভূলে,
হয়তো সহজ হয়না, ঝরে যাওয়া প্রাণের মুকুলে।

বৃষ্ণ ছুঁয়ে তিলে তিলে ফুটে ওঠা, বৃড়ির ভাবনা,
স্পষ্ট ছায়া ফেলে যায়, শুদ্ধ চিত্রে, দুঃস্বপ্ন সাধনা।

কোনো কোনো দিনরাতি একান্তই যেতে চাই ভূলে,
নিভান্তই দগ্ধ করে পাখি ডাকা ডোরের প্রাকাশ।

রুদ্ধ করে ভূলে যায়, অসহায় পীড়িত হৃদয়,
নিবেদিত বৈরাগ্যেও রয়ে গেছে সীমার বিস্ময়।

মুখ

সুমিত্রা দত্তচৌধুরী

আগার লক্ষ্মীর আলপনার ভিতরে তোমার মুখ থাকে
আর লক্ষ্মীর ঝাঁপির ভিতরে রাখা আমার প্রেম

সকাল ডুবে যায় রাতি ডুবে যায় ব্যস্ততায়
অশ্রুর কথা মনে আসেনা তখন
বেদনার কথা মনে আসেনা তখন
ব্যর্থতার কথা মনে আসেনা তখন

আমাদের সব কিছু খেয়ে ফেলে মরীচিকা সময়
আমি তবু একেই দিন হঠাৎ বুটিভেজা ঘাস ফুল
ভূলে এনে ফুলদানিতে রাখি আনমনে।

আর আজ যদি বৃহস্পতি বার হয়— নিশ্চিত
লক্ষ্মীর আলপনার ভিতরে তোমার মুখ, তোমারি মুখ আঁকা হবে।

মা যখন

রঞ্জন গুপ্ত

মা যখন ডাল রাঁধলেন
আমার তখন মাছের খিমে,
মা যখন মাছ রাঁধলেন
আমার তখন পাঁচ তরকারির বায়না।
আসলে কিছুতেই আমার মন ভরে না
কিছুতেই আমার সন্তুষ্টি নেই।
একদিন তোমার বাড়িতে যাব বলে বেরিয়ে
হাঁটতে হাঁটতে কশাইয়ের বাড়ি যেয়ে উঠলাম,
চামড়ার দর দস্তুর করে
হাসতে হাসতেই কিয়ে এলাম।
মৃত চামড়ায় আমার কোনও কাজ নেই
এ কথা জেনেও দর দস্তুর করলাম
অথচ, একদিন সত্য সত্যি
আমি চামড়ার খোঁজে বের হলাম—
অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও
কোনও কশাইয়ের সন্ধান পেলাম না।
হেসতে দুলতে কোথা থেকে, নাদুস নুদুস
একটা ভেড়া এসে দাঁড়াল
এবং দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বলল—
অস্ত্রের ধার কমে গেছে জেনে কশাইরা সব দেশ ছেড়ে গেছে।
ততক্ষণে আমি ভেড়াটির লম্বালোমের মধ্যে
হাত ঢুকিয়ে চামড়া খুঁজে চপেছি অনন্য অভ্যাসে।
পরের দৃশ্যেই স্বপ্নের মতো হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়ালেন মা
গভীর স্বরে বললেন;
সেই ছোট বেসা থেকে জ্বালাজ্বিস
কী চাই ঠিক করে বল,
মাছ ডাল পাঁচ তরকারি সব নিয়ে এসেছি।
এবার আমার হেরে যাবার পালা;
সমস্ত দুইনি ভূপে মাঝে জড়িয়ে ধরে বললাম,
মা, মাগো, কিছুই চাইনা, শুধু তুমি থাক কাছে।

লুঠ

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আঙুলে আঙুল বাঁধন নিয়েছি দাদন নিয়েছি জমি,
জাদুঘরে গিয়ে ঝুঁজেছি পূর্ব-সূরীসের যত মমি।
স্পর্শে সেবেছি কামনা-লালসা-ভোগ যৌনতা হাড়ে,
আমার চরণ ঘোরাল আমাকে নামী-নামী যত ব্যারে।

ধান্দাবাজের বান্দা আমি যে নই, সে তো তুমি জানো,
তবু লালসার ভি. ডি. ও. ক্যাসেটে আজও নারীদের স্নানো
আঙুলে আঙুল বাঁধনে আজকে গড়েছি বঙ্কমুঠি,
এস তো যৌথ উদ্যোগে আজ জাদুঘরটাই লুঠি।

ফাঁসির মঞ্চ

শান্তি বিশ্বাস

রাজার ধন বাঁচাতে গিয়ে রাজদ্রোহী মানুষটি
আসামীর কাঠগড়ায় বাঁড়িয়ে বলল
'মহারাজ ! এ ধন প্রজার, এ ধন শিতর,
মহারাজ বললেন 'আমার রাজকুমার শিত নয়,
এ ধন তাঁর। আমার খাজনা চাই, আরও খাজনা।'
মানুষটি বলল 'মহারাজ ! এ দেশ সবার
প্রজাদের তৃষ্ণার জল নেই, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই,
শিক্ষার টোল নেই, শিশুদের স্বপ্ন নেই।'
মহারাজ বললেন 'তোমাকে চিরদিনের স্বপ্ন সেখাব,
সেনাপতি, রাজদ্রোহীকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাও।'
মানুষটি বলল, 'মহারাজ বিচার মন্ডল নয়—
হাজার শিত যুবক হবে একদিন, আপনি প্রতীক্ষায় থাকুন
আরও মঞ্চ গড়ার দিন সম্মুখে এখন
কিছু বিশেষ মঞ্চ আপনার, রাজকুমার, মহারানি
এবং তেলবাহী অমাত্যদের জন্য নির্মিত রাখুন।'

ইঙ্গিত

মধুচ্ছন্দা মিত্র ঘোষ

এমন নিরুদ্দেশ মুহূর্ত— গিণিবন্ধ সংকেত
আমার গার্হস্থ্য দিন খসে যায় অন্ধের নিয়মে
অন্তরীক্ষ জুড়ে ভ্রাম্যমান নেপথ্যে
কলঙ্কিত গাখার সাথে স্পষ্ট ছিল প্রভাষা।
এত আয়োজন সব— উত্থানের প্রস্তুতি।

বর্ণচোরা হরিৎ পাতায় তাই ভ্রান্ত দুপুর
নির্জনতা সরিয়ে উড়ে এস মেঘ। রোদ্দুরও।
ভেঙে গেল গঠন প্রণালী। বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম।
নর্মসহচরীর ভূমিকায় ব্রাত্য অতীত—
অভিসারী চাঁদ তবু আমার কেঁরাবনে।

ভূমি বদলাবে বলে

মিতা নাগ ভট্টাচার্য

ভূমি বদলাবে বলে অপেক্ষার ওমে সতেরোটা বছর
তুমি একদিন বদলে যাবেই
শিউলি যতনে মনকে সাজাই
সমস্ত রিক্ততা মুছে হৈমন্তী ছাণে
ভুলে যেতে চাই অতীতের সমস্ত অসন্তোষ।
তুমি আত্মতৃপ্ত হবে ভোরের কুয়াশায়—
এ কল্পসূত্রে মনবাগানে কান্না হারায়—
অথচ সতেরোটা বসন্ত কোকিলের গানও একদিন শুক
তুমি, যেমনটি ছিলে তেমনটিই রয়ে গেলে।

একুশ শতাব্দী ৫৮

টেরাকোট্টা

মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়

মোমের নরম আছে চাঁদ পরী
জ্যোৎস্না রহস্য মেখে নেয়।
অতিরিক্ত কৈফিয়ৎ খসে পড়ে
মূর্তির চিবুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
হৃৎপিণ্ড জেগে ওঠে ভাঙ্করের
ময়ূর ময়ূরী বৃষ্টিপাত।
আলোয়ার শিল্পমূর্তি
অচেনা ইশারা ঘিরে
আজকের পরিভাষা খোঁজে।

মেয়েদের ঘর

অলোককুমার হালদার

ঘরের ভেতরে সব আছে।
রূপসজ্জা খাওয়া দাওয়া,
টেলিফোন যোগাযোগ
বুক সেস্‌ফে বই ঢাকা কাচে।
দরকারি সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে
অনাচে কানাচে।

বাইরে যায়না তাই আর
বাইরে পুরুষ আছে;
নষ্ট-হাতের ডাক
বাইরে আছে ব্যভিচার।
ভেতরেই সব আছে যদি, কিবা দরকার
বাইরে যাবার?

মেয়েটি ভেতরে তাই থাকে।
একা একা কথা বলে,
নিজেকে সাজায় আর
একা একা স্বপ্নকে আঁকে।
নারী জন্ম একে বলে; সকলে বোঝায় তাকে
কাজ কর্ম ফাঁকে।

বাইরে বয়স বাড়ে তার।
ভেতরে যদিও শিশু—
এখনো ভোলেনি খেলা তবু
দেহের বয়স হল বিবাহ দেবার।
বব্ব যত্নে খোঁজাখুঁজি, পাত্র জোগাড়।
বিবাহ এবার।

নগদে নেবেনা তারা টাকা
(তুধু) দশভরি সোনা, ফ্রিজ,
আলমারি, সোফা, খাট,
লাঙ্গারি আধুনিক সামান্য চারচাকা।

কপালে সিঁদুর হল, হাতে হল শাঁখা।
লাগেনিতো টাকা।

এখন বদলে গেছে ঘর।
প্রিয়জনও বদলেছে;
একই রয়ে গেছে তুধু
আগেকার বাহির ও ভিতর।
আগেকারই মতো তার বিশ্বচরাচর
ঘরের ভিতর।

আল্লা না বুশ?

মানিকলাল মন্ডল

পাখির পালক দেখে
আকাশে তাকাই
পাখির চেয়ে
আকাশে এখন
বিমানই বেশি...

সীমান্তের ওপর
আকাশে মুখ বাড়িয়ে
বসে আছে এক শিশু;
প্রার্থনা কার—
আল্লা না বুশ?

পুঞ্জিত নক্ষত্রপাত

সাগর বিশ্বাস

২০০৬ সালটি বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশ থেকে অনেকগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র-পতনের বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। বর্তিকার মতো মানুষগুলি একে একে দিগন্তে বিলীন। এ যেন দমকা হাওয়ায় ঘরের প্রদীপ নিভে যাওয়া, প্রবল ঝড়ে বৃক্ষপত্রের শূন্যে পাখা মেলা। স্মরণকালের মধ্যে একটি বর্ষপঞ্জিতে এমন পংক্তিবদ্ধ নক্ষত্রপাত দেখা গেছে বলে মনে পড়ে না।

তবে মৃত্যু সে তো মহান সত্য, তার আধিপত্য স্মরণাভীত কাল থেকে প্রতিষ্ঠিত। যারা পেছনে থাকি তারা প্রতিটি অন্তরতম মরণকে 'স্মরণের আবরণে' সম্বন্ধে ঢেকে রাখতে চাই। তাই চলে শব্দ বন্ধন, চলে সত্য অন্বেষণ। কিন্তু সীমায়িত পরিসর ও সামর্থ্যে তা-ই বা কতটা যথার্থভাবে করা যায়! তবু ছুঁয়ে থাকা, তবু ছুঁতে চাওয়া।

কল্পতরু সেনগুপ্ত (১৯১৬-২০০৩)

জন্মেছিলেন চট্টগ্রাম জেলার বরনা গ্রামে। বাবা সতীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত অসহযোগ আন্দোলনকালে ১৯২১ সালে রেল কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার নামে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এমন একজন স্বাধীনতাকামী ও প্রতিবাদী পিতার সন্তান হিসেবে লালিত কল্পতরুও বড় হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপ দেবেন এতে আর আশ্চর্য কী! কদীতীবনের অভিজ্ঞতা, পড়াশোনা ও ব্যক্তিসংসর্গ একসময় তাঁকে স্বদেশিয়ানা থেকে আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে পার্টির কাজে নিয়োজিত থাকেন। কলকাতায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার সময়ে ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাভিত্তক হয়। কল্পতরু সেনগুপ্ত নতুন দল সি. পি. আই. (এম) এ যোগদান করলে 'স্বাধীনতা'য় তাঁর স্থান থাকে না। কলে যোগ দেন 'বসুমতী' পত্রিকায়। সেখানে সাধারণ সাংবাদিকতা ছাড়াও 'সুজন' ছদ্মনামের আড়ালে থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট সমালোচক হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি চলে নজরুল গবেষণা। ১৯৭০ সালে বসুমতী দলক আউট হলে সকলের সাথে তিনিও কর্মচ্যুত হন। ১৯৭১ সালে বোরোয় সাপ্তাহিক টাবলয়েড 'বাঙলাদেশ' ও 'দৈনিক সত্যযুগ'। বসুমতী সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কল্পতরু সেনগুপ্তও যুক্ত হলে কালজ দুটিতে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে 'বাঙলাদেশ' পত্রিকার ভূমিকা সর্বজনবিদিত। সেখানে কল্পতরু সেনগুপ্তের 'দুটিপাত' কলাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রচারবিমুখ ও আজীবন আপসহীন বামপন্থী লেখক-সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্তের প্রকৃত মূল্যায়ণ তাঁর জীবদ্দশায় হয়নি। তথাপি 'ক্যাসিড্রম কিভাবে আসে', 'দেশপ্রেমিকের রোজনামচা' সহ নজরুলের গানের স্বরপিপি ও নজরুল বিষয়ক গ্রন্থাদির জন্য বাঙলা সংবাদ

সাহিত্যে তিনি 'স্বকীয় হয়ে থাকবেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রীতিমত সনদ, নকশা একডেমি, নাট্য আকাদেমি, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। তাঁর 'সময়ের স্মৃতি ও স্মৃতির সময়' তাঁকে মুজিবুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

সাতাশ বছরের কর্মজীবনের সমাপ্তি টেনে ২০ জুন চলে গেলেন এ সময়ের বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব কল্পতরু সেনগুপ্ত। রেখে গেলেন শ্রী রীনা সেনগুপ্ত ও ছেলে সুমিত সেনগুপ্ত সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ মানুষ।

মসলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩)

জন্ম যশোর জেলার নলডাঙ্গা গ্রামে (১৯২০ সালের ১৭ জুন)। বাবা সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মা প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়। সৎপারিবারি সিডিল ইন্সটিটিউয়ার বাবার বদলির চাকরির জন্য ১৯২৯ সালে নলডাঙ্গার মাতুলালয় ছেড়ে বরিশাল জেলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন মসলাচরণ। পরে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে খেমে ম্যাট্রিক পাশ করেন (১৯৩৭)। এ সময় বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন সূভাষ মুখোপাধ্যায়কে। ১৯৪০ সালে মসলাচরণের মাতৃবিয়োগ হলে তাঁর পিতা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। এ সময় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে মসলাচরণ বি. এস. সি. পাশ করেছেন। ১৯৪২ সালে ঢাকার বিশিষ্ট জমিদার জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা উর্মিলাকে বিয়ে করার পর ১৯৪৪-এ কারমাইকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ার জন্য ভর্তি হয়েও মসলাচরণ ডাক্তার হলেন না। 'পরিচয়' পত্রিকায় 'মেঘ বৃষ্টি ঝড়' (১৯৪৪) নামক কবিতাটি প্রকাশের পর বামপন্থী মহলে সম্ভাবনাময় কবি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায়, অবৈতনিক কর্মী হিসেবে যোগ দিলেন 'পরিচয়' এর সম্পাদকীয় বিভাগে। তখন পরিচয় সম্পাদনা করছেন গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল। মসলাচরণ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'ঘুমতাড়ানি ছড়া' (১৯৪৭), 'তেলেসনান ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪৮), 'মেঘ বৃষ্টি ঝড়' (১৯৫১), 'কটি কবিতা ও একলব্য', (১৯৫৯), 'বৈরী মন' (১৯৭১) 'পাৰলো নেরুদার কবিতা' (অনুবাদ ১৯৭২) ইত্যাদি। ১৯৭৪ সালে মসলাচরণ মক্কায় রাশিয়ান সাহিত্য বাঙলার অনুবাদ করার দায়িত্ব নেন এবং ১৯৮০ তে দেশে ফিরে আসেন। একের পর এক তাঁর আরও গ্রন্থ প্রকাশ হতে থাকে। ১৯৯১ সালে অক্সফোর্ড লেখক মসলাচরণকে দেওয়া হয় রবীন্দ্র পুরস্কার। আগে পেয়েছেন সোভিয়েট ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার।

১৯ এপ্রিল ২০০৩ কলকাতার এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে মসলাচরণের জীবনাবসান ঘটে। রেখে গেলেন শ্রী, দুই পুত্র ও এ কন্যা। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক তরুণ সান্যাল লিখেছেন, "তাঁর কবি জীবন থেকে শিক্ষণীয় ছন্দবোধ সচেতনতা, চিত্রকল্প রচনা, সামাজিকভাবে দায়িত্বপালন, অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান বিশ্ব থেকে চিত্রকল্প রচনার শিকড় সন্ধান, প্রতীকী গঠন বিষয়ে নিষ্ঠা, যে কোন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার অনুধাবন ও অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একটি কেন্দ্র থেকে পর্যবেক্ষণ করার মত সতর্কতা।"

বিমল কর (১৯২১-২০০৩)

২৬ আগস্ট বিরাশি বছর বয়সে বাঙলা কথা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল লেখক বিমল কর চলে গেলেন। জন্মেছিলেন ১৯২১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ২৪ পরগণা জেলার শম্ভুচূড় গ্রামে, মাতুলালয়ে। শৈশব কেটেছিল ব্রজলপুর, গোমো, হাজারিবাগ, ধানবাদ ও আসানসোলে। পরে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'অধিকানাতের মৃত্যু' প্রকাশিত হয় প্রবর্তক পত্রিকায়। ১৯৫৪ সালে বেরোর তাঁর প্রথম ছোটগল্পের সংকলন 'বরফ সাহেবের মেয়ে'। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বালিকাবধূ', 'ঝড়কুটো', 'পূর্ণ অপূর্ণ', 'অসময়', 'মলিকা', 'যদুবংশ' ইত্যাদি। 'অসময়' উপন্যাসের জন্য ১৯৭৬ সালে আকাদেমি পুরস্কার পান। দু'দুবার আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন (১৯৬৭ ও ১৯৯২)। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণচন্দ্র পুরস্কার ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহদাস পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত দেশ পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে বিমল কর অসাধারণ নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শেষের দিকে খুবই অসুস্থ অবস্থায় জীবন যাপন করছিলেন। মৃত্যুকালে রেখে গেলেন স্ত্রী, ছেলে ও তিন মেয়েকে। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্যে একটি যুগাবসান ঘটল বলে অনেকের ধারণা।

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩)

বাঙলা সাহিত্যের অক্লান্ত গবেষক, ইতিহাস প্রণেতা, বিনিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত। ১৫ মে গভীর রাতে হৃৎপিণ্ডের বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল তিরিশি বছর। রেখে গিয়েছেন স্ত্রী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

২৪ পরগণা জেলার নক্ষুন্ডে ১৯২০ সালে জন্ম হলেও ১৯২৫ সাল থেকে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান হাওড়ায়। ম্যাট্রিক, বি. এ. ও এম. এ. সব পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকারী অসিতবাবুর অধ্যাপনা জীবন শুরু হয় নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯৫৭ সালে। তাঁর সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ন'খণ্ডে বাঙলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা। এ ছাড়াও অসংখ্য গবেষণা গ্রন্থের রচয়িতা এবং সম্পাদক। যেমন, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত', 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য', 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর', 'সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ', 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য' ছাড়াও লিখেছেন আত্মকথা 'স্মৃতি-বিস্মৃতির দর্পণে'। সম্পাদনা করেছেন বিদ্যাসাগর, সতীষ, সত্যেন্দ্র রচনাবলি সহ 'জীবনের গল্প গল্পের জীবন', 'শ্রেষ্ঠ গল্প শ্রেষ্ঠ লেখক' ইত্যাদি। তাঁর সুদীর্ঘ অধ্যাপনা ও গবেষণা জীবনে পেয়েছেন অসংখ্য গুণমুদ্র ছাত্রছাত্রী ও গবেষণা কর্মী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্কিম গবেষক ও শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূদেব চৌধুরী (১৯২২-২০০৩)

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকেই বোলপুরে অসুস্থ হয়ে পড়লে ভূদেব চৌধুরীকে কলকাতায় এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাত প্রায় নটায় মৃত্যু হয় তাঁর। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। সেদিক থেকে অসময়ে চলে গেলেন বলা যায় না। রেখে

গেছেন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে। প্রেসিডেন্সি কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। বাঙলা সাহিত্যের এমন ছাত্র কমই ছিলেন যারা একসময় ভূদেব চৌধুরীর বই পড়েননি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রেসিডেন্সিতে তাঁর ছাত্র ছিলেন। 'ছোট গল্প ও গল্পকার' ভূদেব চৌধুরীর একটি বিখ্যাত বই।

ধনঞ্জয় দাশ (১৯২৭-২০০৩)

কবি ও প্রাবন্ধিক ধনঞ্জয় দাশের জন্ম ১৯২৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খুলনা জেলার কালিকাপুর গ্রামে। ছাত্রজীবন খুলনার বি.কে. ইউনিয়ন স্কুল, মৌলতপুর বি. এস. কলেজ ও কলকাতার সিটি কলেজে। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। পরের বছর কবি মদ্যচারণ চট্টোপাধ্যায় ও সুশীল জানার সঙ্গে পরিচয় পত্রিকার কাজে যোগ দেন। ১৯৫০-এ স্বাধীনতা পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শরসন্ধান' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। পরের বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগে যোগ দেন। অবসর নেন ১৯৮৯ সালে।

এক সময় 'অমৃত' পত্রিকার শিল্পকলা সমালোচকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রগতি লেখক সত্ত্ব, ভারত সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি, ভারত সমাজতান্ত্রিক জার্মানী মৈত্রী সমিতি, জাতীয় সংহতি পরিষদ ইত্যাদি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক।

তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পালাতে পারি না' প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ 'ভারতের জাদুঘরে' 'আমার জন্মভূমি, স্মৃতিময় বাংলাদেশ' ইত্যাদি। সম্পাদনা করেছেন অনেক বই যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক।' বইটি সম্পর্কে অমিতাভ দাশও শুনেছেন "নিজের কঠোর আয়াসে ও মেধায় বিশ্বস্ত প্রায় অর্ধশত একান্ত মূল্যবান, এ দেশে প্রগতি চিন্তার মনীষাদীপ্ত রচনাগুলিকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে নীরবে জীবনের দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে চলে যাওয়া ধনঞ্জয় দাশ এই মহাগ্রন্থের ভিতর দিয়েই আমাদের চৈতন্যে ও চেতনায় চিরজীবিত থাকুন।"

৫ এপ্রিল ভোররাতে তাঁর বাওইআটির বাসভবনে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী দৃঢ়চেতা মানুষটি হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। রেখে গেলেন দুই পুত্র ও এক কন্যা।

শিশির কুমার দাস (১৯৩৬-২০০৩)

বিশিষ্ট অধ্যাপক, একাধারে নাট্যকার, অনুবাদক ও সাহিত্য সমালোচক শিশির কুমার দাস ৮ মে দিল্লীর এক নার্সিং হোমে মারা গেলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। ১৯৬৩ সাল থেকে শিশিরবাবু দিল্লীবাসী। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেগোর অধ্যাপক' হিসেবে প্রভূত সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। একসময় সন্তন বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সহ কমবেশি আশিখানা গ্রন্থের রচয়িতা শিশির কুমারের 'ইন্ডিয়ান রাইটিংস অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর' সম্পাদনা, সাহিত্য জীবনের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য পর্যায়। প্রচারের অভাবের কারণে শিশিরবাবু নিজে কোনও বড় সাহিত্য পুরস্কার পাননি। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে একাধিক সর্বভারতীয় সাহিত্য পুরস্কার কমিটিতে বিচারকের আসন অলংকৃত করেছেন। রাজধানীতে তাঁর সুনাম ও পরিচিতি ছিল যেন বাঙালার সাংস্কৃতিক প্রতিভা। এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষের চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে বঙ্গ-সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি।

জগন্ময় মিত্র (১৯১৮-২০০৩)

‘ভূমি আজ কতদূরে’, ‘শাওন রাতে যদি স্বরণে আসে মোরে’ ইত্যাদি হৃদয়স্পর্শী গানের অবিসংবাদী কিংবদন্তী-প্রতিম শিল্পী জগন্ময় মিত্র জীবন-মরণের সীমানা পেরিয়ে এখন অনেক দূরে। ৩ সেপ্টেম্বর ৮৫ বছর বয়সে মুম্বাইয়ে তাঁর হৃদর বাসভবনে হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রেখে গেলেন তিন পুত্র ও দুই কন্যা।

১৯৬৯ সালে এইচ. এম. ভি. তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড বের করে। নজরুল, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙালি প্রেমের গানের পাশাপাশি হিন্দি, গুজরাতি ও মারাঠীতেও প্রচুর গানের রেকর্ড আছে তাঁর। দীর্ঘ পাঁচ দশকব্যাপী তাঁর সঙ্গীতজীবনে রেকর্ডের সংখ্যা চার শতাধিক। শুধুমাত্র হিন্দি গানের রেকর্ড সংখ্যাই একশোর বেশি। সূচিত্রা সেন-দেবানন্দ অভিনীত ‘সরহন’ ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন তিনি। শুধু বাঙালি শ্রোতাই নয়, সর্বভারতীয় শ্রোতারা দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে তাঁর অনবদ্য আবেদনধর্মী কণ্ঠ সম্পদে মুগ্ধ হয়েছেন। গান্ধীজি পর্যন্ত একসময় তাঁর গানের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। জন্মসূত্রে বাঙালার হলেও সঙ্গীতসূত্রে জগন্ময় ছিলেন প্রকৃতই সর্বভারতীয়। পল্লভী সহ বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত শিল্পী যুগেরাষ্ট্র, ইন্ডোভ, পূর্ব-আফ্রিকা সফর করেছেন সঙ্গীত সূত্রেই। জীবনের অল্প স্বৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন ‘শাওন রাতে যদি স্বরণে আসে মোরে’ নামাঙ্কিত আত্মকথায়। দীর্ঘকাল মহারাষ্ট্রে বসবাস করলেও জগন্ময় মিত্রের বাঙালার সঙ্গীত ওথা সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভীষ্ম সাহানি (১৯২১-২০০৩)

হিন্দি সাহিত্য ও মঞ্চজগতের অমিত শক্তির লেখক ভীষ্ম সাহানি। চুরাশি বছর বয়সে দিল্লির এসকটস হাসপাতালে হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ১১ জুলাই ২০০৩। জন্মেছিলেন রাওয়ালপিণ্ডিতে। তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে ‘তমস’ এর নাম শোনেনি এমন শিক্ষিত ভারতীয় খুব কমই আছেন। এই উপন্যাসটির জন্যই তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান (১৯৭৫)। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক গোবিন্দ নিহালনির হাতে ১৯৮৮ সালে ‘তমস’ চলচ্চিত্রায়িত হয়ে সারা দেশের মেকদণ্ড কাঁপিয়ে দেয়। পাণ্ডাব বিভাজন তথা ভারত ভাগের পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উপন্যাসটির পটভূমি। ফলে আয়নায মুখ দেখে শিউরে ওঠার মতো প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। সে প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় জনতা পার্টি, শিবসেনা, হিন্দু সুরক্ষা সমিতি (ভ্রমঙ্কর) ইত্যাদির সাথে সামিল ছিলেন বাল থাকারে, এমনকী সৈয়দ শাহাবুদ্দিন কিংবা জাভেদ সিদ্দিকির মতো রাসনৈতিক মানুষেরা। বোম্বাই হাইকোর্টে নামলা করেও ‘তমস’-এর প্রদর্শন ও প্রচার বন্ধ না হওয়ায় কিন্তু বাল থাকারে মন্তব্য করেছিলেন Government was impotent, the Tamas judgement had shown that even the judiciary had become impotent. সেদিন প্রবল চাপের মুখে দাঁড়িয়েও দৃঢ়কণ্ঠে ভীষ্ম সাহানি বলেছিলেন, I don't care how the fundamentalists view Tamas. The response of ordinary viewers and readers has been positive, wholesome. I don't regret one word, one comma of Tamas.

এমন একজন সাহসী লেখকের চলে যাওয়া এ সময়ে ভারতীয় সাহিত্যের বড় ক্ষতি। (৭

সূভাষ মুখোপাধ্যায়

(১৯১৯-২০০৩)

রাণা চট্টোপাধ্যায়

মানুষ চলে যায়। সূভাষদাও গেলেন (৮ জুলাই)। কোনও কলঙ্কময় মহাপুরুষও চিরকাল তাঁর মনুষ্য শরীর নিয়ে বেঁচে থাকেন না। 'জন্মিলে মরিতে হবে' অবশ্যই। বেশির ভাগ মানুষ যাঁকে নিজের জন্য, বড় জোর তার পরিবার পরিজননের জন্য। কেউ কেউ যাঁকে সকলের জন্য। এই সকলের জন্য বেঁচে থাকা মানুষরা পরিণত বয়সে চলে গেলেও সমাজে শূন্যতা সৃষ্টি করে। মানুষ হায় হায় করে। তিনি যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতেন! কবি সূভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এইরকম বিরল মানুষ। অত্যন্ত স্নেহময় জীবন তাঁর। আমার মতো অতি নগন্য অভিজ্ঞানের সঙ্গেও তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল, যখন ভাবি, গর্ব হয়। বহু বিখ্যাত মানুষের কাছাকাছি পৌঁছোনাই যায় না। মিডিয়া ফেসব বিড়াল শাবকদের ব্যাশ্রাবক বানিয়েছে, তাদের ম্যামার, প্রতিপত্তি, কথা বলার ঢং দেখে অবাক হয়ে ভাবি, এই পোড়া কলকাতা শহরে একদিন তারানাথকর বস্ত্রোপাধ্যায় ছিলেন, যাঁকে দেখে কোনওদিন মূরের মানুষ মনে হয়নি, এমন কী আমার কুড়ি একশ বছরের সদ্য লিখতে আসা জীবনে তিনি প্রথম আলোপেই যে সমগ্র প্রহর দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত বহুর পরও অবাক হয়ে যাই। কিংবা সব্যসাচী সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র যিনি আমার বাবার চেয়েও বয়সে অনেক বড় ছিলেন তাঁর বাড়িতে গেলে কখনও মনে হয়নি তিনি কত বড় লেখক ছিলেন। আর তৃতীয়জন হলেন কবি সূভাষ মুখোপাধ্যায়। তিরিশ বছর তাঁকে দেখেছি। একটা সময় ছিল যখন তিনি বা গীতাঙ্গি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। দুমদাম তাঁর ৫ নম্বর শরৎ ব্যানার্জী রোডের ভাড়া বাড়িতে চলে যেতাম। এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে ঘুরে দেখতাম অসংখ্য পোষা বিড়াল গুরে বসে আছে। খাঁচায় পাখি। খালি গায়ে সূভাষদা তাদের পরিচর্যা করছেন। কোনও শিশু বেড়াল তাঁর কাঁবে বসে রয়েছে। সূভাষদা তার ভেতর কত কথা বলছেন। পুপে (পালিতা কন্যা)-র সঙ্গে গল্প করছি। এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা কত রকমের কথাই ভেসে যাচ্ছি। ভয় ডর করছে না, এত বড় কবি, এত বড় কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পোড় খাওয়া মানুষ। সুকান্ত ভট্টাচার্যকে জনসমক্ষে তুলে এনে বিখ্যাত বানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। যিনি মুখের ভাবকে কবিতার ভেতর নিয়ে এসে যুগান্তকারী বিপ্লব করেছেন। যাঁর অসংখ্য কবিতার লাইন বাঙালির মুখস্থ। কিছু কিছু অমোঘ পংক্তি প্রায় বেদবাক্য হয়ে গেছে। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত' 'পাঁগাল বাবর আলির চোখের মতো আকাশ', 'ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না পোল রবসন, নিগ্রোভাই আমার' (যদিও অনুবাদ, তবুও মনে হয়নি কখনও) কিংবা 'ফুল জমতে জমতে পাহাড় হয়', 'তারপর মুখজো মশায় কেমন আছে', 'আমি যত দূরে যাই... সারি সারি লক্ষীর পা', 'সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে'-র মতো লাইন কোনওদিন ভোলা যাবে? ভুলতে পারবে 'অ্যান্ড্রাস্কের ডায়েরি'র অসাধারণ অনুবাদের কথা? কে বাদ দিতে পারবে নাঞ্জিম হিকমত প্রসঙ্গ বাঙালায় সূভাষ মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে রেখে? সেই মানুষটির কোনও অহংকার নেই। একদা লেখকবাজারে

প্যারাম্বুলেটেরে শাক-সব্জি কিনে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে কবি ঠেলে নিয়ে যেতেন। কথা বলতে বলতে পরাশর রোড, সর্দার শঙ্কর রোড চলে গেছি। 'রানা একটা বাড়ি দেখে দিতে পার? পুণের জন্য। আমার জন্য নয়।'

একদিন, সকালে কোনও ছুটি-টুটির দিন, ভাবলুম, অনেকদিন সুভাষদার সঙ্গে আড্ডা মারিনি; যাই, গীতাদিরা কেমন আছেন দেখে আসি। গলি দিয়ে ঢুকছি, পর্না তোলা, ভেতরে কেউ বসে, সুভাষদার সেই চিরপরিচিত কঠোর শোনা যাচ্ছে। যাব কীনা ভাবছি, জানলা দিয়ে চোখ পড়তেই—এসো এসো। ঢুকে পড়েছি। অভ্যস্ত পরিচিত মুখ, সাদা ফুল হাতা শার্ট, হাতা গোটানো, বৃত্তি পরা, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা,— 'আলাপ আছে?' 'না'। 'হেমন্ত, ওর নাম রানা, কবিতা লেখ'। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। দুই বন্ধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় একান্ত আলাপনে মগ্ন। দুই বিখ্যাততম বাঙালির সীমানে জড়োসড়ো হয়ে বসেছি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কেও মনে হয়নি সেদিন দূরের মানুষ। আমার কন্যা মাত্র দু'বছর বয়স থেকে গীতাদি'র 'সুশিক্ষণ' ফ্রেমে থাকত। প্রায় তিন বছর প্রতিদিন দিয়ে আসতাম বা নিয়ে আসতাম, গীতাদি'র সঙ্গে তো দেখা হতই, কখনো দেখতাম সুভাষনাও আছেন। কুড়ি বছর হয়ে গেল সে-সব দিন ফেলে এসেছি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কত গরীব মানুষকে অর্থ দিয়েছেন, অসুখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, তা ভাবাই যায় না। এ নিয়ে কোনওদিন টু শব্দও করেননি। অকপটে সব কথা বলে দিতেন। লেখার ভেতরও কোনও আবড়াল ছিল না। এমন কি আঠাশ বছরের ছোট আমাকেও তাঁদের বিয়ের গল্প করতে থিধা করতেন না। জানতুম, গীতাদি অন্য একজনকে আগে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু এসব প্রসঙ্গ তুলতে যাওয়া নিতান্তই মূর্খতা। কিন্তু সুভাষদা, গীতাদির সামনেই এসব কথা বলতেন। পরে কোথায় যেন তাঁর লেখায়ও পড়েছি আরো বিশদে। গত বছর (২০০২) তিনি কিছুদিন হাসপাতালে থেকে বাড়ি এসেছেন। তখন কানে একদমই শোনেন না, চোখেও ভালো দৃষ্টি নেই। বাংলাদেশের এক কবি বিমল ওই সন্ধ্যা আমার বাড়িতে অতিথি। তাদের আমার সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে কাছ থেকে দেখবে, তাঁর সঙ্গে ছবি তুলবে। আমি ইতস্তত করছি। অসুখের পর দুপুর বেলা যাওয়া ঠিক হবে না। তবু ওদের অমনা উৎসাহে যেতে হল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সশরীরে সেই ছোট ঘরের ক্ষুদ্র বিছানায় বসে। স্রেফে লিখে দিলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। চার পাঁচখানা ছবি তোলা হল। গীতাদিও কেঁপেছেন। প্রায় চিনতেই পারছেন না। নাম বলতে বললেন— 'বাবা কতদিন আসনা, তুমি যে বুড়ো হয়ে গেছ। চিনতে পারব কী করে?' আসলে ১৯৯১ সালের পর ওঁর কাছে ইচ্ছে করে আর যেতাম না। উনি চিরদিন আমার স্বপ্নের কবি; বিদ্রোহী কম্যুনিস্ট। আদর্শবান মানুষ হলেও তিনি অন্য রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন ওনে মর্মান্ত হয়েছিলাম। পরের দিন গিয়ে স্বগড়া করেছিলাম। উনি হেসে ছিলেন। তাঁর যুক্তি আমি মানতে পারিনি বলে আর বাহিনি। তবে, অসংখ্য সভায়, অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে, তিনি কাঁধে হাতে রেখেছেন। দু'একটা কথা হয়েছে, শরীর নিয়েই। তারপর উনি চলে গেছেন। এই প্রসঙ্গে জানাই, আমরা গড়িয়ায় আসার পর তিনি একটা পোস্টকার্ড দিয়েছিলেন, সেটাই তাঁর কাছ একুশ শতাব্দী ৬৬

থেকে পাওয়া একমাত্র চিঠি। তুলে দিচ্ছি :

“স্নেহের রাণা,

১৯/৬/৯২

ডোনার সঙ্গে অবশ্য দেখাই হয়ে গেছে। তুমি যেখানে থাকো তার কাছেই বোধহয় কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের বাড়ি। আমার একটা উপকার করবে? ওঁর এক ছেলে (টেলিফোনে কাজ করে, সম্ভবত গানও গায়) অনেকদিন আগে বিমলবাবুর ওপর একটা লেখা আনার কাছ থেকে নিয়েছিল ছাপাবার জন্য। বারবার চেষ্টাও সেটা ফেরত পাইনি। আমার কাছে কোনো কপি নেই। ওটা পেলে একটা বইতে দিতাম। লেখাটা উদ্ধার করে দিতে পারো? না পারলে আমাকে একটু জানিয়ে দেবে? ভালবাসা। সুভাষদা”।

বস্তুত, সে লেখা সুভাষদা উদ্ধার করতে পারেননি, আমি পারব কোথা থেকে? তা ছাড়া বিমলচন্দ্র ঘোষের এক ছেলে ওডঙ্কর ঘোষের সঙ্গে আমার ভালোই সখ্যতা ছিল। সে তখন নিরুদ্দেশ। এ ‘এ’ কথা সুভাষদাকে জানিয়ে এসেছিলাম। উনি বললেন— ‘লেখাটা হারিয়েই গেল রাণা।

তার কবিতা নিয়ে, গদ্য নিয়ে আগেও অনেক আলোচনা বেরিয়েছে, পরেও বেরবে। তিনি অমর-শরীরে সব সময় থাকবেন। তার নাম কোনদিনও বাঙালি কবিতা পাঠক ভুলবে না। এ আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের বিনাশ নেই। □

সম্পাদকের সংযোজন : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। বাল্যকাল কেটেছে রাজশাহী জেলার নওগাঁয়ে। ১৯৩০ সালে কলকাতায় আসেন। ভবানীপুর মিত্র স্কুল থেকে বেরিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৪০ সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পদ্যাতিক’ সাহিত্য জগতে সাড়া জাগিয়ে দেয়। জীবনে চাকরি করেননি। কমিউনিস্ট রাজনীতি করার জন্য জেল খেটেছেন (১৯৪৮-৫০)। ১৯৬৪ সালে আকাসেমি পুরস্কার পান (যত দূরেই যাই)। ১৯৭৭ সালে আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের লেটাস পুরস্কার। এছাড়াও পেয়েছেন কবীর, আনন্দ ও সর্বোপরি জ্ঞানপীঠ। পেয়েছেন জাতীয় সম্মান পদ্মভূষণ, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম। তার প্রথম উপন্যাস ‘হাংরাস’ বেরোয় ১৯৭২ সালে। ছোটদের ছড়ার বই ‘মিউয়ের জন্য ছড়ানো ছিটনো’ (১৯৮০)। ‘হাফিজের কবিতা’ (১৯৮৪) ‘বাঘ ডেকেছিল’ (১৯৮৫) ‘চর্যাপদ’ (১৯৮৬) ‘অমর শতক’ (১৯৮৮) এর মধ্যে ‘চর্যাপদ’ ছাড়া বাকি তিনটে অনুবাদ। অবশ্য ‘চর্যাপদ’ ও পুরনো বাঙলা থেকে নতুন বাঙলায় তর্জমা। আত্মকথা ‘ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন’। ‘ঢোল গোবিন্দের মনে ছিল এই’ (১৯৯৪) দ্বিতীয় পর্বের এই আত্মকথাধর্মী বইটি উৎসর্গ করেছেন মমতা মুখোপাধ্যায়কে। তার লেখা অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ছাড়াও অনুবাদের মাধ্যমে যেভাবে নাজিম হিকমত, পাবলো নেরুদা, নিকোলা ভাসপারভ, ওলগা সুস্মেনভ, সলজেনিৎসিন কিংবা ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে বাঙালি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে তাঁর ইতিহাস তাঁকে কোনওদিন ভুলতে পারবে না। শেষ জীবনে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তার জীবনব্যাপী সৃষ্ট সাহিত্য সত্তারকে বিপুলমাত্র ক্ষুণ্ণ করবে না।

ডবেন শাইকিয়া

(১৯৩২-২০০৩)

জগৎপতি সরকার

ডবেশ্বনাথ শাইকিয়া জন্মেছিলেন আসামের নওগাঁ জেলায়। পিতা বি.সি. শাইকিয়া ও মাতার নাম শ্রীতি। ছেলে বেলায় জীবন কাটে আসামের ধূলিধূসর, মাটিতেই। উচ্চশিক্ষার অধিকারী হয়েছিলেন বিদেশের মাটিতে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন এবং তাঁর কর্মজীবনও গড়ে ওঠে বিজ্ঞানের বৃহৎ অভিনায়। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার পদে অবস্থিত ছিলেন অনেককাল। খুব অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চার প্রতি অনুরাগী হন। ক্রমশঃ সেই পথই তাঁকে সঠিক দিশদর্শন দেয় এবং বিশ্বৎ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি একদোঃও বেশি ছোট গল্পের প্রণেতা। অসমীয়া ভাষায় তাঁর প্রকাশনার সংখ্যাও খুব কম নয়। তাঁর সর্বাধিক আলোচিত উপন্যাসটির নাম 'অগ্নি হ্রদ' অসাধারণ এক সামাজিক পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাস, যার আবেদন আত্মও আন্তর্জাতিক। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থ নৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ভঙ্গিমা ও প্রট্যচার, অস্থির ও সংকট জর্জরিত এই দুঃসময়ে ডবেশ্বনাথের সাহিত্যকীর্তি বারবার আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। বিপন্ন অস্তিত্ব, বিধ্বস্ত পরিচয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই সেই উপবৃত্ত সময়, যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস, লক্ষ্য, অভিমুখ এবং তার পারিপার্শ্বিকতাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ উপলব্ধি করা ভীষণ জরুরি। ডবেশ্বনাথ পুরস্কৃত হয়েছিলেন জীবনে বহুবার। যেমন ১৯৭৬ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৭৩ সালে প্রথম পাবলিক বোর্ড অ্যাওয়ার্ড। কিন্তু তাঁর কাছে জেয় ছিল জনগণের পুরস্কার। এবং তা তিনি পেয়েছেন পুরোমাত্রায়। প্রথম জীবনে ডবেশ্বনাথ অনেক সময় অনেক উচ্চাসনে ব্রতী ছিলেন তাঁর দেশের মাটিতে। তিনি সম্পাদক ছিলেন ১৯৬৮ সাল থেকে University Coordination committee for production of Text Books in Regional Languages-এর সদস্য ছিলেন, Board of Directors of Text Book corporation, Assam-এর, Executive committee of public Board of Assam প্রভৃতি নানা সংস্থার। সর্বত্রই তিনি রেখে গেছেন তাঁর অসাধারণ কর্মকুশলতার স্বাক্ষর।

ডবেশ্বনাথ চলে গেছেন কিন্তু সযত্নে রেখে গেছেন তাঁর জীবনের বিভিন্ন অনুভবের ছড়িয়ে থাকা বাক্যরূপ। তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর জীবনের বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র ধারা। আর তাতেই তিনি সম্পূর্ণ। একমুহুর পরিপূর্ণ মানুষ ডবেশ্বনাথ শাইকিয়া। □

সম্পাদকের সংবোজন :

আসামের চলচ্চিত্র জগতেও এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিচরণ করেছেন ডবেন শাইকিয়া। অসমীয়া ভাষায় অন্যতম শিল্পবিশিষ্ট চিত্রপরিচালক বলে তিনি সুখ্যাত। তাঁর আটটি ছবি— 'সম্ভারাগ', 'অনির্বাস', 'অগ্নিহ্রদ', 'কোলাহল', 'সারথি', 'আবর্তন', 'ইতিহাস' ও 'কালসম্ভার' জন্য আঞ্চলিক চলচ্চিত্রবিভাগে রত্নতকমল পেয়েছিলেন ডবেশ্বনাথ। তাঁর সমস্ত ছবির কাহিনীকার তিনি নিজেই। সম্পাদনা করেছেন 'প্রান্তিক' ও 'সফুরা'-র মতো বেশ কিছু সাময়িকপত্র। সমাজের দাবিপূরণাচ্ছিত ও অবহেলিত শিশুদের কল্যানার্থে নির্মিত ডবেশ্বনাথ

পাইকিরা চিলড্রেনস্ এয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' তাঁর অন্যতম সামাজিক অবদান। ১৩ আগস্ট বৌহাটির এক নার্সিং হোমে একাত্তর বছর বয়সে আত্মীয় শিল্প-সাহিত্যে নিবেদিত ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই নিরলস মানুষটির জীবনাবসান ঘটে। [

আমরা গভীর শ্রদ্ধার স্মরণ করি :

প্রতিমা বড়ুয়া, কেতকী দত্ত, তরুণকুমার, নরেন রায় (সুফি), তাঁরাপদ সাতরা

সাহিত্য বিহার-এর কিছু বই

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত • রমেশ চন্দ্র দত্ত, রাজপুত্র জীবন-সঙ্ক্যা • রমেশচন্দ্র দত্ত, কন্দরে কন্দরে • শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জনৈক শয়তানের পত্রগচ্ছ • বিমল কন, বাদীজী বেগম বিবি • বেদুইন, তিন মায়ের কথা • ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রেমাবতার শ্রীমৌর্যাস • গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ, আডভেঞ্চার অমনিবাস • বীরেন্দ্রলাল ধর, নেটোর দল • সীতা মজুমদার, প্রেমস্রু মিত্রের বাঘাই গল্প, নাট্যদেউলের বিনোদিনী • শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্পসল্প • সীতা মজুমদার, একটি লাল লত্বা • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হরেকরকম্বা • কুমারেশ ঘোষ, ডাক্তারকুটির রহস্য • অতেন্দ্র রায়, তন্ত্র পরিচয় • পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাজালি • ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী, তারালঙ্কারের শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প • তারালঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃষ্টির পথ • সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র, (১৯৯৯ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত), মহাবিশ্বের কথা • সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র, প্রাণতি পরিকেশ পরিচায় • সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

শরৎ সাহিত্য : পেপারব্যাক সিরিজ

দেবদাস ১৩.৩০। বড়দিদি ৮.০০। পরিলীতা ৮.০০। চন্দ্রনাথ ৯.০০। পল্লী-সমাজ ১৩.০০। বিরাজ-বৌ ১২.০০। অরক্ষণীয়া ৮.০০। বামুনের মেয়ে ১০.০০। গৃহদাহ ১৮.০০। গল্প সংকলন ২০.০০। নিহতি ৯.০০। স্বামী ৮.০০। পণ্ডিতমশাই ১১.০০। নববিধান ৮.০০। বৈকুণ্ঠের উইল ৯.০০। সেনা-পাওনা ১৫.০০। রামের স্মৃতি ও কিদুর ছেলে ১০.০০। কাশীনাথ ও দর্পচূর্ণ ৮.০০। মেজদিদি ও একাদশী বৈরাগী ৮.০০। দস্ত ১৫.০০। চরিত্রহীন ১৮.০০। পথের দাবী ১৫.০০। কিশোর রচনা সংকলন ১৪.০০। প্রবন্ধ—নারীর মূল্য ৮.০০। নাটক—ষোড়শী ৭.০০। বিজয়া ৮.০০। রমা ৬.০০।

শরৎ সাহিত্য : শোভন সংস্করণ

গৃহদাহ ২০.০০। পথের দাবী ২০.০০। চরিত্রহীন ২২.০০। সেনাপাওনা ১৮.০০। শ্রীকান্ত (অখণ্ড) ৪০.০০।

বর্ত্তমান সাহিত্য : পেপারব্যাক সিরিজ

দুর্গেশনন্দিনী ১১.০০। আনন্দমঠ ১০.০০। কপালকুণ্ডলা ৭.০০। দেবী চৌধুরাণী ১১.০০। কৃষ্ণকান্তের উইল ১২.০০। বিবক ১৪.০০। মুখালিনী ১৪.০০। সীতারাম ১৭.০০। রাধারানী ও ইন্দ্রি ১১.০০।

প্রাপ্তিস্থান :

সাহিত্যবিহার

১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রিট, কলকাতা-৯

ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাঃ লিঃ

৫৬ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯

- মাটির সূরের রাজা আব্বাসউদ্দীন □ শ্যামল চক্রবর্তী □ দে'জ □ ৪০.০০
- আব্বাসউদ্দীন □ তপন রায়প্রধান □ দীপ প্রকাশন □ ১৪০.০০

“বিধি নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখীকে কোন অধিকারে গলা টিপিয়া মারিতে যাইব? সূন্দরের সৃষ্টির শক্তি সেইয়া উন্মগ্নগ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার সৃষ্টিকে হেরিয়া কুফরীর ফতোয়া দিবে?... সঙ্গীত-শিল্পের বিরুদ্ধে বোম্বারদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলসহিত তরুণদের আগ্রাণ চেষ্টা করিতে ইইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে ইইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নেই। সকল বিধি নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।” ১৯৩২-এ বঙ্গা নজরুলের এই কথাগুলোর মূর্ত রূপ যেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ। সুদর্শন, সূত্রসিক, সূত্রচিসম্পন্ন, সূত্রলেখক (উভয়ার্থেই এক নব্য মুসলমান যিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে সমাজের যাবতীয় সঙ্কোচ আড়ষ্টতা বাধা ফতোয়া অতিক্রম করে ক্রমশ নিজের প্রাণের ধর্মকেই বড় করে দেখেছিলেন— বড় করে তুলেছিলেন। যে গান-শোনা ছিল না-জায়েজ কাজ সেই গানকে তিনি আবার ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন। বাস্তবিকই, সঙ্গীতবিরোধী জনতাকে সঙ্গীত-সঙ্গী করেছেন এই গণশিল্পী— নিয়েছেন সংস্কারকের ভূমিকা। শুধু গান শুনেতে শেখাননি তিনি—আগ্রহী করে তুলেছেন শিখতে। কতটা বাধার পাহাড় দু-হাতে সরাতে হয়েছিল আব্বাসউদ্দীনকে তাঁর পরবর্তী কালের শিষ্যা শিল্পী সারলা আর্জুমদ বানুর একটি কথা থেকে তা স্পষ্ট হবে... “আব্বাসউদ্দীনের জন্ম না হলে আমাদের বাড়ীতে হারমোনিয়াম প্রবেশ করত কিনা সন্দেহ।”

মানুষ হিসাবে আব্বাসউদ্দীন ছিলেন মধুর ব্যবহারের এবং একই সঙ্গে আত্মপ্রভারী, স্বাধীনতা, আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন ও লড়াই মনোর। এই সবের পরিচয় মোটে আধুনিক গান দিয়ে শুরু করে ইসলামী গান পট্টীগীতিতে নিজেদের প্রসারিত করায় এবং সবচেয়ে বড় কথা তাঁর স্থানীয় ভাষায় গান গাওয়ায়। এর প্রায় প্রতিটি স্তরে গ্রানোফোন কোম্পানিকে প্রভাবিত করতে হয়েছিল তাঁকে। মহম্মদ কাসেম বা ধীরেন্দ্রনাথ দাসদের মতো কে মল্লিক বা গণি মিঞা সাজতে চাননি তিনি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অমিলে ছেড়ে দিয়েছিলেন চাকরি। ওপার বাঙালয় কর্মক্ষেত্রে উপরওয়ালা জসীমউদ্দীনের সঙ্গে কারণে-অকারণে জনপ্রিয়তায় উপরে যাওয়া রেফিউজী আব্বাসউদ্দীনের যখন বাক্যলাপ বন্ধ হয়ে যেত সেক্ষেত্রে আব্বাসউদ্দীনকে দেখা গেছে অতীত সম্পর্কের উদ্ধারে উদ্যোগ নিতে।

জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে দু-বছরের ব্যবধানে ‘বাংলা লোকগীতির জন্য উৎসর্গীকৃত গ্রাণ’ আব্বাসউদ্দীনের উপর দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। শ্যামল চক্রবর্তীর ‘মাটির সূরের রাজা আব্বাসউদ্দীন’ ও তপন রায় প্রধানের ‘আব্বাসউদ্দীন’। একসা আব্বাসউদ্দীনের আত্মজীবনী পাঠের মুক্ততা থেকেই বই দুটির প্রতি কৌতুহল জাগে।

‘মাটির সূরের রাজা আব্বাসউদ্দীন’ বইটি সহজ সাবসীল গদ্যে রচিত আব্বাসউদ্দীনের জীবনী। কিছুটা সংক্ষিপ্তই বসতে হবে। তবুও মোটামুটি শিল্পীর একটা পরিচিতি মূলক বই হিসেবে এটি সার্থক। আব্বাসের ছোটবেলা থেকে শুরু করে শিক্ষা-দীক্ষা, গানের ভুবনে অভিষেক, আধিপত্য, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি যথাযথ বিন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া, বইটির অনেকগুলো পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন সোকগানের পরিচিতিমূলক রচনা, শিল্পীর রেকর্ডের তালিকা এবং তাঁর গাওয়া কতকগুলি গান। সোকগীতির পরিচিতিমূলক রচনাংশটির ভেতন প্রয়োজন ছিল না। তার জন্যে অনেক কোষগ্রহ্ন রয়েছে। বরং শিল্পীর সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রসঙ্গে এসব যথার্থ হয়। যাইহোক, এই বই রচনায় লেখকের খুব একটা অনুমজ্জানী হওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ল না। তাঁর উদ্ভূত বিভিন্ন গানের বাণী আরও সতর্কভাবে পিপিবদ্ধ করা দরকার ছিল। সাপলন বলে জাতির ফাতনা/ডুবিয়েছে সাধ বাজারে এই পংক্তি দুটির কেএে অম্মদাশঙ্কর বা উপেন্দ্রনাথ জাতের বা জেতের বসিয়েছেন এবং উভয়েই বসিয়েছেন সাত বাজারে। সাপলনের নুত্নার অবাবহিত পরে হিতকরী পত্রিকায় সাধ বাজারে থাকলেও অম্মদাশঙ্কর বসছেন, “ওটা বোধ হয় ‘সাত বাজারে’ হবে। অন্যত্র ‘সাত বাজারে’ দেখেছি।”

তপন রায় প্রধানের বইটিকে একাধারে আব্বাসউদ্দীনের জীবনী এবং তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ বলা যেতে পারে। অনুমজ্জানী দৃষ্টিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করে তিনি লিখেছেন বইটি। যদিও শতবার্ষিকীর দায় পাকার সময়ভাবে প্রাপ্তব্য আরও অনেক তথ্যাদির দিকে তিনি ঠিকমত নজর দিতে পারেননি বলে নিজেই স্বীকার করেছেন এবং এও বলেছেন যে বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরেও তাঁর প্রয়াস অব্যাহত থাকবে পরবর্তী আরও পূর্ণতর সংস্করণের স্বার্থে। বর্তমান আলোচকেরও মনে হয়েছে আব্বাসউদ্দীন-চর্চার অপরিহার্য একান্ত নির্ভরযোগ্য বিশদ গ্রন্থ হিসেবে বইটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে লেখককে আরও অনেক শ্রম দিতে হবে।

বইয়ের শুরুতে পবিত্র সরকারের ‘প্রাক-কথা’ এবং বিশেষত বরুণ চক্রবর্তীর ‘প্রসঙ্গ-কথা’ (শ্রী রায় প্রধানের ‘না-বঙ্গা কথা’তে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে ভুল করে যা ‘পরিচায়িকা’ বলে কথিত) অতীব মূল্যবান। মূল জীবন-কথা শুরুর পূর্বে লেখকের ‘আমার আব্বাস’ অসাধারণ। আব্বাসউদ্দীন জীবনকে তিনি তিনটি পর্বেরেছেন— কোচবিহার পর্ব, কলকাতা পর্ব ও পাকিস্তান পর্ব। এ ছাড়া ‘ব্যক্তিমানস’ পর্যায়ে শিল্পীসত্তা, সাহিত্য প্রীতি, শিক্ষানুরাগ, রঙ্গ রসিকতা, দাম্পত্য প্রেম ইত্যাদি বর্ণিত। ‘শতবর্ষ পরে’ পর্যায়ে রয়েছে শিল্পীপুত্র মোস্তাফা কামাল ও কন্যা ফেরদৌসী রহমানের লেখা, অপর পুত্র মোস্তাফা জামান আব্বাসীর সাক্ষাৎকার এবং জগন্ময় মিত্র, খালেদ চৌধুরী, কুমার নিধিনারায়ণ ও পরিতোষ দত্তর বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ সব লেখা। এছাড়া এই পর্যায়ে আছে সুখবিলাস বর্মার ‘আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি কী ও কেন’ শীর্ষক এক লেখা। পরিশিষ্টটিও প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠেছে জীবনপঞ্জি, বংশতালিকা, রেকর্ড-ক্যাসেট-সিডি, গানের স্বরসিপি, ব্যক্তি নির্মিত ও পরিচিতি প্রভৃতিতে। আব্বাসউদ্দীনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকে শ্রী রায়প্রধান রচনা করেছেন এই বই, কিন্তু কোথাও কোনও বিতর্কের আভাস বা অবকাশ থাকলে সত্যিকারের জীবনী লেখকের মতোই এড়িয়ে না গিয়ে তিনি তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

বইতে বই একটি বিষয় একাধিকবার উঠে এসেছে। নির্দিষ্ট অঞ্চলে জাত এবং সেই অঞ্চলের প্রত্যক্ষ-সংস্পর্শে থাকে শিল্পীর এবং অন্য অঞ্চলে জাত, বিশেষত শহরের শিল্পীদের গানের চলন বা ঢঙের ফারাক। এমনকী, নির্দিষ্ট অঞ্চলে জাত কিন্তু কালে সেই জনগোষ্ঠীর সংগ্রহ ত্যক্ত নগরবাসী হওয়া শিল্পীর গানেও যে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকগানের আদত রূপ ফুটে উঠতে পারে না তাও বিস্ত্রিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে একাধারে শিল্পীও এই জীবনীকার গভীর সত্যতার সঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন নিজেকেই। বলেছেন যে কোচবিহার-জাত কালে বেশ কয়েকজন কলকাতাবাসী তিনি যখন মফে ভাওয়াইয়া গান তখন পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে স্থায়ী বসবাসকারী নৃ-গোষ্ঠীর, ভাষাভাষীর কোন শিল্পীর ভাওয়াইয়া পরিবেশনের কাছে তাকে একশোবার হার মানতে হয়।' প্রসঙ্গত জমীমউদ্দীনের কথাও এসেছে। তিনি বলেছিলেন যে অনেক চেষ্টা করেও তিনি আক্বাসউদ্দীনকে ভাটিয়াঙ্গী গানের ঢঙটি শেখাতে পারেননি। আক্বাসউদ্দীনের পরবর্তী মমতাজ আলী খান বোদারউদ্দীন আব্দুল আসীম প্রমুখ শেরেছিলেন ভাটিয়াঙ্গীর যথার্থ ঢঙটি ফুটিয়ে তুলতে। আক্বাসউদ্দীনের মতো অপরূপ সুরেলা কণ্ঠ ছিল না অবশ্য বলে তাঁরা কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি। আক্বাসউদ্দীনের কথার সূত্র ধরে এসেছে লোকগানে কোন কোন বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত সে প্রসঙ্গ। এসেছে এ গানের সংরক্ষণের প্রসঙ্গও।

নজরুলকে দিয়ে ইসলামী গান লিখিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে আক্বাসউদ্দীন তাঁর আত্মজীবনীতে যা লিখেছেন আমার মতে তা অনেকটাই সঙ্গত। অন্যদিকে, 'নজরুল-জীবনী'তে নেওয়া অঙ্কণ বসুর তথ্যও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ঘটনাটা বোধহয় এইরকম, তখনও পর্বত নজরুল ইসলাম-বিষয়ক যা-কিছু লিখেছেন (শ্রী বসুর সোহাতেও স্পষ্ট— বার বেশিরভাগই কবিতা) তার সন্ধানে না গিয়ে নজরুলকে ইসলামী গান লেখার অনুরোধ করেছিলেন আক্বাসউদ্দীন এবং নজরুল তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। অঙ্কণবাবু বঙ্গার পরও 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'র ইসলামী গান, আমি ও কাজিদা' অংশটি পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে মন চায় না। তখনও গান মুখস্থ হয়নি, রেকর্ডিং-এর সময় গানের কাগজটি নজরুল বাড়িয়ে ধরে আছেন আক্বাসউদ্দীনের সামনে— আক্বাসউদ্দীন এতখানি সব মিথ্যা কল্পনা করেছেন একথা বিশ্বাস করব কেমন করে। 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'-র উদ্ধৃতি শ্রী বসু কেন আজহারউদ্দীন খান-এর বই থেকে সংগ্রহ করলেন বুঝলাম না। শ্রী বসুর উদ্ধৃতি অনুযায়ী আধ ঘণ্টার মধ্যে দুটি গান লেখার কথা আছে অথচ মূল বইয়ে আমরা পাচ্ছি আধ ঘণ্টায় একটি (ও মন রনজানের এ) গান লেখার কথা এবং আক্বাসউদ্দীন স্পষ্টতই বলেছেন পরের দিন লেখা হয়েছিল 'ইসলামের এ সওদা লয়ে'। আক্বাসউদ্দীন বর্ণিত 'লেখার ঠিক চারদিন পরেই রেকর্ড করা'র কথা শ্রী বসুর হাতে 'চারদিনের ভেতরে রেকর্ড' হয়েছে। সাপ-মাস-তারিখ-বিহীন 'একদিন' নিয়ে শ্রী বসুর কটাক্ষ প্রসঙ্গে বলা যায় যে আত্মজীবনী লেখার সময় আক্বাসউদ্দীন ছিলেন রোগশয্যায়। তাঁর পক্ষে তখন এসব মেসানো সম্ভব ছিল না— যে কারণে তার আত্মজীবনীটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

দু-চারটে অসঙ্গতির কথা। বইয়ের শুরুতে হারমোনিয়াম বাদনরত উপবিষ্ট আক্বাসউদ্দীনের ছবির তলায় জন্ম ও মৃত্যুর সাল হিসেবে তুল করে কোচবিহার পর্বের সাল ১৯০১—১৯৩০

ছাপা হয়েছে, যা হবে ১৯০১-১৯৫৯। ১১৯ পৃষ্ঠায় এক জায়গায় লেখা থেকে মনে হতে পারে 'পাগলা মনটারে তুই বাধ' গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা— আসলে যা অতুলপ্রসাদের। 'তোরা যা নদীর ধারে ধারে ওই' গানটির কথা মজরুলের বলে উল্লেখিত (গানের স্বরলিপি অংশে) হয়েছে অনবধানবশত। আসতে তো উত্তরবঙ্গের প্রচলিত এই গানটির সুরে মজরুল লেখেন 'পদ্মদীঘির ধারে ধারে এ' গানটি।

আব্বাসউদ্দীনের 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'র প্রতি যত মুগ্ধতাই থাক শ্রী রায় প্রধানের অত দীর্ঘ দীর্ঘ উদ্ধৃতি জীবনীকারের রচনার স্বতন্ত্রত্ব ও সাবলীলতার পক্ষে অন্তরায়। বিশেষত যখন বইটি দৃষ্টান্ত্য নয় এবং তিনি যখন একাধিবার 'যাঁরা বইটি পড়েছেন' বা 'এ বিষয়ে তাঁরা বইটি পড়ে দেখতে পারেন' জাতীয় উক্তি করছেন। আর উদ্ধৃতিতে এত ভুল— এমন কাটাছোঁড়া! বেশি পরিশ্রমের ছাপা নিতে বলব না, অতীত শুধু ১৭ থেকে ২২ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রেম ও পাগল প্রসঙ্গের উদ্ধৃতি দু'টি খুঁটিয়ে দেখলেই হবে। বইটির বিভিন্ন স্থানে করা লেখকের অনেক উক্তি বা মন্তব্যই তাঁর 'না-কলা কথা' অংশে অনায়াসে বলা যেত বা বন্ধনীর মধ্যে কোনও ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট করে 'বর্তমান লেখক' ইত্যাদি না বলে একান্ত প্রয়োজনে চিহ্নিত করে নিচে বা অধ্যায় শেষে উল্লেখ করা যেত। তেমন হলে পড়তে গিয়ে পাঠককে বারবার বাধা পেতে হত না।

মুকুন্দ দাস যে অন্যান্যদের লেখা গান গেয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে মজরুলের নাম বাদ যাওয়া কোনওভাবেই উচিত হয়নি। গুরুসদয় দত্ত প্রসঙ্গে 'লোকনৃত্য' সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৯২৩ সালে বলা হয়েছে, হবে ১৯২৯। কে মল্লিক নামের একটি উৎস আছে। মহম্মদ কাসেমের 'কে' এবং একদা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসা গোরাচাঁদ মল্লিকের 'মল্লিক' নিয়ে কে মল্লিক। বিমল দাশগুপ্তর আরও পরিচয় তিনি কমল দাশগুপ্তর বড় ভাই— তাঁদের ছোট সুবল দাশগুপ্ত। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার যে আব্বাসউদ্দীনকে মরণোত্তর 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' সম্মানে ভূষিত করেন এ তথ্য আলোচ্য কোনও বইয়েই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আসলে উপন্যাসবুর কাছে অনেক পাওয়া গেছে বলেই আরও বেশি পাওয়ার প্রত্যাশা জাগে। ছবিগুলি পুস্তকের মর্যাদা বাড়িয়েছে। প্রফ রিডিং আরও ভালো হওয়া দরকার ছিল। □

অরবিন্দ পুরকায়স্থ

Space donated by :

A WELL WISHER

- একান্তে অভিমণ্ড্য □ সৌরভ চক্রবর্তী □ সৃষ্টি প্রকাশন □ ৪০.০০
- যেখানে দাঁড়িয়ে □ সেখ হাফিজুদ্দিন হোসেন □ বইঘর, মেহেদা □ ১৫.০০
- পালকের কথা □ দেবানিস চট্টোপাধ্যায় □ কবিতা পাব্লিক □ ১০.০০

‘একান্তে অভিমণ্ড্য’ সৌরভ চক্রবর্তীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময় সৌরভের বয়স মাত্র ১৪ বছর। এই কৈশোর কালেই তার অনেক কবিতা পরিণত মনস্ততায় সমৃদ্ধ। ৫০টি কবিতা নিয়ে তার ‘একান্তে অভিমণ্ড্য’ আমাকে আশাষিত করে। তার কবি সত্তা আরও বর্ধিত গন্ধ নিয়ে শতদলে প্রস্ফুটিত হবে এমন ধারণা অনায়াসেই করে নেওয়া যায়। অভিমণ্ড্য-১ থেকে ১৫ সংখ্যা চিহ্নিত কবিতায় যে সমাজ ও জীবন পরিক্রমণ আছে তা সৌরভের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার অকৃত্রিম কথামালা। বেদনা-বিস্রোহ-ঘৃণা-নৈরাশ্য-আত্মবিশ্বাস-আশাবাসের কথা সৌরভ সত্যতার সঙ্গে সনিষ্ঠায় উচ্চারণ করেছে। কোথাও কোথাও সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভাব সৌরভের কবিতায় পরিলক্ষিত হলেও, সে নিজস্ব ভূমি অবেশে দৃঢ়চেতা। কোনও কোনও কবিতায় কৈশোর তারল্যের যে উজ্জ্বল ঝুঁকি নাই এমন নয়, তবে তা নিভাসই নগন্য। যখন সে বলে, ‘বিষয় বিকল্পে লজ্জাবর্তী পাতার মত’ (অভিমণ্ড্য-১২) তখন তার কবিতার শৈল্পিক নির্মাণ আমাদের মুগ্ধ করে। অভিমণ্ড্য পর্যায়ের বাইরের অনেক কবিতাতেও তার সাক্ষীল বিচরণ, তার কাব্য ভাষা হার্দিক। জীবনের সব যুদ্ধ নেতার স্বন্য নয়। তাই কেউ কেউ জিতে হারে। আবার কেউ হেরেও শেষ বেলা জিতে যায়।’ (হারজিত) এখানে সৌরভ দার্শনিক বোধে সমৃদ্ধ। নিত্যধর্মে আস্থানীল। এই ধরনের অনেক কবিতাতেই সৌরভ ১৪ পেরিয়ে চলে আসে প্রবীণত্বের দলে, মননে এবং ভাবায়। এই সম্ভাবনাময় কবিকে তার চর্চা ভবিষ্যতে এক উজ্জ্বল পাদনীঠে পৌঁছে দেবে একথা বিশ্বাস করতেই মন চায়।

সুশোভন ব্রহ্ম, ছাপা বাঁধাই উন্নত। কিন্তু কিছু কিছু ভুল বানান, মুদ্রণ প্রমাণ ও ছন্দ দুর্বলতা এই কাব্যগ্রন্থে দৃশ্যমান। আশা রাখি ভবিষ্যতে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সৌরভ আরও বেশি সচেতন হবে।

সেখ হাফিজুদ্দিন হোসেন অনেক দিন ধরেই ছড়া, কবিতার চর্চা করে আসছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়। ‘যেখানে দাঁড়িয়ে’ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। একটা হানিক বৈশিষ্ট্য তার ভৌগোলিক সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কাব্য শরীর গঠন করেছে। এই ধরনের কবিতায় একটা উদ্দেশ্য প্রতিফলনের ইচ্ছা কাজ করে। তাই স্বভাববৃত্ত সৃষ্টির বাইরে ধীরে সূঁছে ভেবে চিন্তে লেখার যে উদ্ভাস, এই কবিতাগুলির ক্ষেত্রে সেই প্রয়াসই কার্যকর হয়েছে বলে বর্তমান আলোচকের ধারণা।

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সূচনাপর্ব থেকেই কবি কর্মোপলক্ষে এর সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি গভীর অভিনিবেশে এখানকার ঘটনাপ্রবাহ, মানুষ, যন্ত্র যান্ত্রিকতাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাকেই কাব্য শরীরে রূপায়িত করেছেন। তাই কবিতাগুলির যেমন একটি বিচ্ছিন্ন সত্ত্ব আছে, তেমনই সমষ্টিগত ভাবধারায় কবিতাগুলি সব মিলিয়ে একটি কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। মিল ও ছন্দের সাবশীল নৈপুণ্যে কবিতাগুলি গঠিত হলেও, এর মধ্যে একটি অতি স্পষ্টতার ঝোঁক কাব্যরসকে কিছুটা ব্যাহত করেছে। যখন তিনি ‘ধার’-এর সঙ্গে ‘নাই’,

‘মেঘ’-এর সঙ্গে, ‘বাঘে’ ‘শ্যামলে’-এর সঙ্গে ‘শোনাতে’। ‘মওকা’-এর সঙ্গে ‘মমকা’ প্রভৃতি মিলগুণি দিয়েছেন তখন মনে হয়েছে কবি আরও একটু পরিশ্রমী হলে পারতেন।

কবি যখন বলেন ‘জনিতে যাদের ছিল পদ ছাপ তারাই বয় সে মাটি। ঠিকাদার গড়ে সাতের পাহাড় মজুরে চুবে যে আঁটি’ (অর্থপ্রাপ্তি) তখন কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার অনুবঙ্গ মনে পড়াটা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ‘চুয়াবরের সিকসিক শিও/বৌবন সারা অঙ্গে, প্রবীনে-নবীনে প্রাণচকল/অন্তরে বহিরঙ্গে’ (বিনোদিনী)। আবার এই উদ্ধৃতি বলে যে সেখা হাফিজুদ্দিনের কাব্যিক সরসতা তার অভিজ্ঞতাকে কতখানি বেতব-মণ্ডিত করেছে।

ছন্দের বৈচিত্র্য আনার চেষ্টায় কবি যত্নবান। মিলের ক্ষেত্রেও, কিছু অসঙ্গতি বাদ দিলে তাঁর দক্ষতা অস্বীকার করার উপায় নেই। সবচেয়ে বড় কথা তিনি তার কাব্যের প্রতি আন্তরিক, অভিজ্ঞতার অকৃত্রিম প্রক্ষেপণে অক্ষুণ্ণ।

ননীগোপাল দাসের প্রচ্ছদ ভাববাহী। মুদ্রণ, বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। সব মিলিয়ে ‘বেখানে পাঁড়িয়ে’ কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাব্য দৃশ্য হিসেবে পাঠককে তৃপ্ত করবে।

২৪টি কবিতা নিয়ে ‘পালকের কথা’য় ছিমছাম প্রচ্ছদের আড়ালে কবি দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় অনেক গভীর কথা গুনিয়েছেন। ‘ফুল ফোটায় সম্পর্ক এগিয়ে আসে রোদ্দুরের হাত ধরে’ বা ‘হে পরিজন বান্ধব, তোমাদের হাতে সুদৃশ্য কফিন বাদাম কাঠের/নকশা খচিত/চতুর বাহক, কবে থেকে বইছ?’ (নির্বাসন) কবির অভিজ্ঞতার এই স্বাধিক চৈতন্যে আমরা সমৃদ্ধ হই।

ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুল-দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে পানীয় জলের ধারাবিবরণী/ভীষণ ঘোপদুরন্ত অপরাহ্নে অপাপবিদ্ধ মায়েদের হাত ধরে মিনিবাসে উঠে যাচ্ছে দিল্লি কোম্পানির ওয়াটার বটল’ (একটি বেগুনী রঙের ছবি)। সামাজিক অসঙ্গতির বাস্তব চিত্র রূপায়নের নিপুণ শিল্পী, কবি দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের সপ্রতিভ কাব্যভাষা, তির্যকতার মধ্যে যে দুরন্ত রসগভীরতা তা আমাদের আলোড়িত করে। আসলে আমাদের অতঃসারশূন্য শিকার যে ভয়ঙ্কর পরিণতি, তার আভাসও যেন প্রকাশ পেয়েছে অনুপম লেখাচিত্রে। তিনি যখন বলেন, ‘ভারসাম্যের কথা ভাবলেই কলসাকৃতি কাচ পুতুলের কথা মনে পড়ে।... যতই হেলিয়ে দিতাম ও কিন্তু সোজা হয়ে আবার পঁড়িয়ে পড়ত। অবাক হতাম, বিদেশি পুতুল কখনই হলে পড়ে না ভেবে। অথচ আমাদের পুতুলগুলোকে কত সহজেই শোয়ানো যেত’ (ভারসাম্য) আপাত সরল পংক্তিগুলির মধ্যে চরিত্র বিচারের যে সুকৃৎ ইঙ্গিত, বাঙালি জাতিসত্তার যে অপরিশোধনীয় দুর্বলতা, তা কবির কলমে যন্ত্রণার অনুবঙ্গে উঠে আসে। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই চেনা ছকের বাইরে গিয়ে এক নতুন পথ নির্দেশে মগ্ন হয়েছেন। পাঠক হিসেবে এই প্রাপ্তি কম নয়।

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের অনেক কবিতাতেই আত্মানুসন্ধানের গভীর পরিচর্যা আছে। তবু কোথাও কোথাও মনে হয় সাধারণ পাঠকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে তিনি কেজ্জা নির্বাসনের এক রহস্যময় দ্বিতি খুঁজে নিতে চান, যা তাঁর কবিতা সম্পর্কে আমাদের যেমন কৌতূহলী করে তেমনি একটা ব্যবধানের সীমারেখা টেনে দেয় বলে অতৃপ্ত করে। এই রীতি তাঁর কাব্য আয়োজনে অবগাহনের যেমন ইচ্ছা জাগায় তেমনি ‘আকাশ চিরে বহু মিনার’ দেখতে চাওয়ার পরিশ্রমকে কোথায় যেন নিষ্ফল সাধ করে। □

মৃত্যুঞ্জয় কুতু

● SURVIVAL IN DANGER—A Study of Syampur Block II Villages □ Dr. Subir Bandyopadhyay □ Centro-Cultural Cervanter de Calcutta □ 75.00

● DALITS— DEBATES AND DYNAMICS—A Socio-Economic probe on scavengers of Howrah & Calcutta □ Dr. Subir Bandyopadhyay □ Socio-Economic Research Institute, Calcutta □ 75.00

ভারতবর্ষের সমাজ ও অর্থনীতির ভিত্তি নিহিত রয়েছে লক্ষ লক্ষ গ্রামাঞ্চল ও তার কৃষি উৎপাদনের উপর। ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের উত্থানপতন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্বাধীনতার পর ছায়ায় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নতি আশানুরূপ ঘটেনি। আজও দেশের সর্বত্র গ্রামবাসীরা অবহেলিত ও উচ্চবিত্তদের শোষণের শিকার হয়ে রয়েছে। দুইটি বেসরকারি সমাজসেবী সংস্থা PUDER ও IDEA গ্রামাঞ্চলে একটি আর্থসামাজিক সমীক্ষার প্রকল্প নিয়েছিল। এই প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের বাগনান থানা এলাকাত্তর শ্যামপুর ব্লক-২ অন্তর্ভুক্ত সতেরটি গ্রামের একটি নমুনা সমীক্ষার দায়ভার ডঃ সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া হয়। সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল এই গ্রামগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সঠিক মূল্যায়ণ। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে প্রচুর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে সমীক্ষার কাজটি সমাধা করেন; আলোচ্য বই এই সমীক্ষার ফল। তার উপস্থাপন পদ্ধতি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি তথ্য সংগ্রহের কাজে ওই সব গ্রামগুলিতে বসবাসকারী নানুসংখ্যক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য নিয়েছেন। গ্রামগুলির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসাকেন্দ্র, গ্রামবাসীদের প্রধান উপজীবিকা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উপার্জন শীলতা, জাতিভেদ, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বসবাসের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, মানবহানের সুযোগ সুবিধা ইত্যাকার বিবিধ বিষয়ের বিশদ বিবরণ কয়েকটি সারবিত্তে উপস্থাপিত হয়েছে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য বইটিতে উক্ত গ্রামগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ত্রুটি বিচ্ছাদিত গ্রামেদ্বয়নে কতটা বাধা সৃষ্টি করেছে সেগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি সাল ভিত্তিক বিগত তিনদশকে সংঘটিত শ্রেণিদ্বন্দ্ব, প্রয়োজনীয় আয়ের অভাব, কৃষকসুলের স্বণবৃদ্ধি, সামাজিক অসহযোগিতা ইত্যাদি পরিদ্বার ভাবে তুলে ধরেছেন। তথ্য প্রযুক্তির রীতি অনুযায়ী তিনি গ্রামবাসীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার বিষয়ে যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছেন সেগুলি মোটামুটিভাবে প্রমাণ করে যে গ্রামেদ্বয়নের ব্যাপক অনুকূল প্রচার সত্ত্বেও গ্রামবাঙালার উন্নতি বিশেষ ঘটেনি। গ্রামবাসীদের মধ্যে এখনও নিরক্ষরতা, জাতিবৈষম্য, কুসংস্কার, বিচ্ছিন্নতার মনোভাব গ্রামগুলির উন্নতির অন্তরায় হয়ে রয়েছে। গ্রামগুলিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রয়োগ তেমনভাবে ঘটেনি। মানবহানযোগ্য ভাঙ্গো রাস্তাঘাট, পানীর ভঙ্গ, ভাঙ্গো চিকিৎসাকেন্দ্র, বসবাসযোগ্য গৃহ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদির অভাব এখনও লক্ষণীয়। কয়েক দশক আগে গ্রামগুলির অবস্থা যেমন ছিল আজও তার বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। কৃষিকার্যই এখনও মুখ্য উপজীবিকা, অন্যান্য পেশা বা অর্থোপার্জনের সুযোগ আপেক্ষিকভাবে অনেক কম। অনেক পরিবারেই বেকারত্ব বেড়েছে। মূলতঃ কৃষি উৎপাদনের উপরেই নির্ভরশীল থাকায় পরিবারগুলির অর্থনৈতিক উৎকর্ষ ঘটেনি।

বইটি রাজনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী এবং সাধারণ পাঠকের গ্রামভিত্তিক ভারতের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানসন্ধানের সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বইটি পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া ও কলকাতার শহরগুলো বসবাসকারী দলিত সম্প্রদায় ভূত হেলা, হাঁড়ি, বাম্বিকী, রাউত, ধানুকদের সমাজ জীবনের উপর একটি সমীক্ষার বিবরণ। এই সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা প্রধানতঃ সাকইকর্মী (ঝাড়ুদার) নামে পরিচিত। এরা জীবিকাষয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে এবং পুরুষানুক্রমে কেউ কেউ সাধারণ শ্রমিক, মজুর বা রিক্সাচালক হিসেবে জীবিকার্জন করছে। সাধারণে এটাই প্রচার করা হয়ে থাকে যে এই সম্প্রদায়ের মানুষরা এখন আর অস্পৃশ্য, অবহেলিত বা বিচ্ছিন্ন নয়। এরা মূল সমাজধারার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সে কথা বলে না। বাস্তব অবস্থা নিরূপনের জন্য একটি কেসরকারি সংস্থা— William Carey Study and Research Centre—এর একটি ব্যাপক কর্মসূচির অংশীভূত সমীক্ষা ডঃ সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করেন। দলিত গোষ্ঠীভূত শ্রমিকশ্রেণির পেশাগত বিভিন্নতা, মূল সমাজ থেকে তারা কতটা বিচ্ছিন্ন বা তারা কী ধরনের সমস্যা বিব্রত সেই বিষয়ে সমীক্ষার জন্য হাওড়ার পাঁচটি এবং কলকাতার একটি অঞ্চলকে সমীক্ষা কেন্দ্র (Survey spot) হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। দলিতদের জীবনধারণের মান, তাদের চিন্তাধারা, দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণের জন্য আশ্রয়স্থান প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার চিত্রও এই সমীক্ষায় লক্ষ্যীয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকগুলি বিষয়ে সাক্ষাতকার ও অনাসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য মুক্তিগ্রাহ্য ধারাবাহিকতায় নথিভুক্ত করেছেন বেশ কিছু তথ্যপঞ্জীর মাধ্যমে। যে বিষয়গুলি তিনি সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এই সমাজে পরিবারের আয়তন, জীবিকার্জনের পেশা, আয়ের পরিমাণ, বসতবাটির সংস্থান, শিক্ষা ও পৌরসহায়তা, রাজনৈতিক বা সমাজসেবী সংস্থার সহায়তা, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত বিভেদপ্রসূত বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমীক্ষক এই মতই পোষণ করেছেন যে এই অবহেলিত দলিত সম্প্রদায়ভূত মানুষ মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নই রয়ে গেছে। সেবক এই সব সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রাম ও বিচ্ছিন্নতা বোধের যন্ত্রণার দিকটি তুলে ধরেছেন।

বইটি রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, সমাজসেবী সংস্থা ও অন্যান্য গুভানুধায়ী মানুষের পরবর্তী পর্যায়ের পথের দিশা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। □

আদিত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

চণ্ডী নাাইড়ীর রেখায় ও মৃত্যুঞ্জয় কুড়ুর লেখায়

এক্সপেন্স অ্যাবোন্স ডাবোন্স

অ্যাকিউরেসি / দাম পরিশ্রম টাকা

● যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মৃণাল দত্তের কবিতা ৭ ৩/৮০.
চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলকাতা-৩২ ৭ প্রতিটি ২.০০

সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কবিতার ইতোহারা সিংহেছেন কবি মৃণাল দত্ত। ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই উপমহাদেশের নানা স্থানে নানা সময়ে নানা রূপের মৌলবাদী ধর্ম-নির্ভর হাঙ্গামা আক্রমণ ঘটে চলেছে। মানবতার অবমাননা ঘটেই চলেছে। যারা নিজেদের দেশের চেহারা চরিত্রের সাথে ধর্মকে যুক্ত করে রেখেছেন তাঁদের কাছে ধর্মীয় ক্যাসিস্ট মৌলবাদী নবদত্তের বিবাক্ত প্রকাশ তো একরকমের স্বাভাবিকতার মধ্যে গণ্য করা চলেছে বাস্তব চেহারা দৃষ্টে। আর ভারতের মতো সংবিধান স্বীকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশেও শাসক শ্রেণি খাদ্যবস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসনের মতো নিত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলির প্রতি স্বীকৃতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের অর্ধশতাব্দী কাল পরেও ধর্মের জিগির তুলে হিন্দুত্ব জাগিয়ে তোলার অপচেষ্টা চলেছে। গদি রক্ষার জন্যে ধর্মকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। দুবৃত্তায়ন এখন রাজনীতির অপর নান হতে চলেছে। তাই কখনো রাম মন্দির গড়ার চেষ্টা হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতাদের মদতে ভাসা হচ্ছে ঐতিহাসিক বাবারি মসজিদ, সাধারণ মানুষকে রিপূর তাড়নার শিকার করে তোলা হচ্ছে। গুলরাটে প্রণাসনের প্রত্যক্ষ মদতে সুদীর্ঘ কাল ধরে উন্মত্ত হিংস্রতা লুণ্ঠ গণহত্যা নাস্তি ধর্ষণ এক কথায় এক গুণাহাী চলেছে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রত্যক্ষ প্ররোচনায়।

পৃথিবী জুড়ে নানা প্রান্তে মৌলবাদী হানাহানির পাশাপাশি চলেছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যা অনেক সময়ই যুদ্ধ নয়, আগ্রাসন। হিরোসিমা, নাগাসাকি সুদীর্ঘকাল ধরে পর্যায়ক্রমে ভিয়েতনামের যুদ্ধ এবং তার পরিণাম এবং তারপর থেকে কখনো প্রত্যক্ষ ও কখনো অপ্রত্যক্ষভাবে বিশ্বের ঘূণাতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা এবং তাদের দুচারটে বশব্দ নিয়ে মাঝে মাঝেই অপর দেশে নয় সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ হেনে চলেছে তারই পরিণতি আফগানিস্তান ইরাক এর উপর নিরপেক্ষ আক্রমণ। শিশুঘাতী নারীঘাতী কুংসিং বিভৎসার জন্য দিকার আর ঘূণা প্রকাশ ছাড়া আর কোনো ভাষা নেই। আমেরিকার সারা বিশ্বের উপর অকারণ দাঙ্গারি আর বিশ্ববাজার দখলের ঘূণ্য কৌশল পাশব শক্তির দত্তের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইতিহাসের জাগ্রত মানুষ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ঘোর প্রতিবাদ জানাচ্ছে আমেরিকার সাধারণ মানুষজনও।

এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আর মৌলবাদী সভ্যতা সংস্কৃতি বিরোধী অমানবিক কার্যক্রমের প্রতি তীব্র ঘূণা প্রকাশিত হয়েছে মৃণাল দত্তের দুখানি কবিতা পুস্তিকায়। আর উচ্চারিত হয়েছে চির সময়ের সভ্যতা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মানবিক ধারার অবিনশ্বর বাণী। কবির কথায়:

“ঘূণা কখনও কখনও/ভালোবাসার চেয়েও মহাশয়।

এখন এক সময়/গেক্সা কাপড়ে হিংস্রতা মোড়া আছে

অথোথ্যা থেকে গুলরাটে।”

“নাও বিদ্ধ করে ছুরিকা/জেনো/আকাশ আনবে

পাখি জানবে/প্রেম নয়/ভয়ংকর হিংসেতাই বিশ্বের প্রতিচ্ছবি।”

“ও মেঘ, কত ভুল দিলে/না ভেঁজা গেলো পোশাকে

চাপচাপ রক্ত শুধু করে/এই বর্ষায়/অহিংসে গুলরাটে”

যুদ্ধের বিরুদ্ধে কবির অনুভব উপলব্ধি ছোঁয়া উচ্চারণ—

তুমি বলেছিলে/একটি ফুল নিও/কোকিলের ডাক এলে...

আজও সেওয়া হলো না/শিয়রে যুদ্ধ/পেটে ভাত নেই।

মাথার উপর ছান নেই!”

“হাত শুধু প্রার্থনার জন্য নয়/হাতের আরো কিছু অর্থ আছে

আমি এই অর্থ সজ্ঞানের সন্মোহেরিয়ে

ইরাকের নিরীহ মানুষের উপর/নেনে আশা হাতকে ভেঙ্গে দিতে চাই”

সারী দুনিয়ার নানা প্রত্যন্তে যুদ্ধবাজ সভ্যতার শব্দের বিরুদ্ধে নানারকমের লেখালেখিতে এমন জেহাদের প্রকাশ ঘটছে। কবি মুগাল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরা ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে চিরকালের বিবেকের বাণী তুলে ধরেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ। □

শ্রব চট্টোপাধ্যায়

সাগর বিশ্বাসের তিনখানা সমাদৃত বই

সময়ের শব্দ

(নির্বাচিত নিবন্ধ সংকলন)

নবপত্র প্রকাশন □ দাম ষাট টাকা

সাত আকাশের তারা

(কিশোর গল্প সংকলন)

পরিবেশনা— দে'জ □ দাম পঁচিশ টাকা

ছড়াছড়ি কলকাতা

(২য় সংস্করণ)

(ছোট বড় সকলের ছড়ার বই)

ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি □ দাম চোদ্দ টাকা

অতিরিক্ত প্রাপ্তিস্থান :

লাবণ্য পুস্তকালয় (কলেজ স্ট্রিট) □ কথামালা (বিরিটি)

এবং

একুশ শতাব্দী

আমাদের কথা

জসীমউদ্দীন জন্ম শতবর্ষ : বিশ্বকোষ পরিষদ, জসীমউদ্দীন একাডেমি, একুশ শতাব্দী, ঐক্যতান গবেষণাপত্র সহ ত্রেত্রিশটি সংগঠনের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে কবি জসীমউদ্দীনের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে : জসীমউদ্দীন জন্ম শতবর্ষ উদযাপন সমিতি। কার্যালয় ২০৬, বিবেকানন্দ রোড, মানিকতলা, কলকাতা-৬। সমিতির সভাপতি ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, কার্যকরী সভাপতি— সুভাষ চক্রবর্তী, মুখ্য সম্পাদক জাহিরুল হাসান ও গৌতম সরকার। সম্পাদক মণ্ডলিতে আছেন পার্থ সেনগুপ্ত, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, নীতীশ বিশ্বাস, গৌতম হালদার, সাগর বিশ্বাস, ইমানুল হুক, বিশোর সেনগুপ্ত, তহমিনা খাতুন, তম্ময় ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ সাহা, সুজয় চক্রবর্তী, আশিস সানা, সত্যস্যাচী চক্রবর্তী, অরুণ দাস। স্থির হয়েছে ১ জানুয়ারি ২০০৪ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সহযোগিতায় সমিতি কবির জন্ম শতবর্ষে প্রথম স্মারক অনুষ্ঠান করবে। অতঃপর বর্ষব্যাপী কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জসীমউদ্দীনের কাব্যকৃতি, তাঁর অনুকরণযোগ্য মানবসত্তা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে।

সকলটির ভাষা : দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি জগতে সমকালীন অধিরতার প্রেক্ষিতে গত ডিসেম্বরে একুশ শতাব্দী, সুইনহো স্ট্রিট, সৃষ্টিকোণ ও ড্রামা একাডেমি ইতিহার উদ্যোগে 'একটি আলোচনা সভার আয়োজন হয় জীবনানন্দ সভা ঘরে। 'সকলটির ভাষা' শীর্ষক এই আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন ড. শিল্পীপকুমার বসু। প্রধান অতিথি ছিলেন কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। আলোচনার অংশগ্রহণ করেন জ্যোতির্ময় ঘোষ, আবুল বাশার, হিরণ মিত্র ও সুব্রত সেনগুপ্ত। বাঙলা কবিতা আবৃত্তি করেন এরা চন্দ্র ও মনীষী মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন কবি কুম্ভা বসু ও বিশ্বজিৎ রায়। এই অনুষ্ঠানেই মধুসূদা মিত্র ঘোষের কবিতার বই 'হৃদয়ের ঘর দুয়ার' প্রকাশিত হয়। সব শেষে সাম্প্রতিক কালের প্রায় পঁচিশজন কবি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান।

সময়ের শব্দ : ১৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভা ঘরে একুশ শতাব্দী সম্পাদক সাগর বিশ্বাসের নির্বাচিত নিবন্ধ সকলেন 'সময়ের শব্দ' (প্রথম খণ্ড) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু। অধ্যাপক বসু তাঁর মননসমৃদ্ধ ভাষনে এ ধরনের বইয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খ্যাখ্যা করে লেখকের চার দশকব্যাপী নিরাস কাক্সের প্রশংসা করেন। নবপত্র প্রকাশনের কর্মধার শ্রী প্রসূন বসু এ ধরনের বই প্রকাশের প্রয়োজন ও বর্তমান বইটি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণ কবিতা করেন। আকাদেমি সচিব ও বিশিষ্ট লেখক শ্রী অনুনয় চট্টোপাধ্যায় (প্রধান অতিথি) বলেন, লেখক সাগর বিশ্বাস প্রায় চার দশক ধরে নানান বিষয় নিয়ে অবিরাম লিখে চলেছেন। সমরোপযোগী ও উৎসাহসমৃদ্ধ তাঁর এসব নিবন্ধ সময়ের বিচারেই গ্রহণযোগ্য হবে। নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রী নৃপেন্দ্র সাহা (বিশেষ অতিথি) বলেন, তিনি যে সাগর বিশ্বাসকে জানতেন তিনি নাট্য সমালোচক এবং নাট্য-বিষয়ক প্রবন্ধকার। মারাঠি নাটক ও নাট্যচর্চা বিষয়ে সেই সাক্ষ-আটের দশক থেকে তিনি আমাদের অবহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর কর্মপরিধি যে আরও ব্যাপক সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। এ বই থেকে সে ধারণা উত্তর চক্ৰিশ পরগনা জেলা গমতাত্ত্বিক লেখক ও শিল্পী সময়ের সভাপতি কবি ও চিত্রকর শ্রী নন্দদুলাল ভট্টাচার্য লেখকের সমগ্র সচেতন ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির উদ্বেগ করেন।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিক্ষক শ্রী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। □

Ekush Shatabdi

A Distinctive Bengali Periodical □ R. N. 68099/96

Vol-8 □ No. 3-4 July- December 2003 □ Rs. 15

‘একুশ শতাব্দী’

দীর্ঘজীবী হোক



জনৈক শুভার্থী

ডালিয়া রায় (সম্পাদিকা) কর্তৃক ইউ. এম. প্রিন্টার্স, ১১১, রাজা রামমোহন রায়

সরনি, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত ও এন ২১, নবদর্শ,

কলকাতা-৭০০০৫১ থেকে প্রকাশিত

সম্পাদক □ সাগর বিশ্বাস

VICTORIA MEMORIAL HALL

(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)

1 QUEEN'S WAY, KOLKATA-700 071

PH : 2223-1889-91, FAX : 2223-5142

E-mail victmem@cal12.vsnl.net.in; Website:www.victoriame-morial-cal.org

A. Visit Sound and light shows at Victoria Memorial Ground on Pride and Glory-The Story of Calcutta:

Show Times : October to February

From 6.15 - 7 P. M.

(Bengali Show)

From 7.15 - 8 P. M.

(English Show)

March to June

From 6.45 - 7.30 P. M.

(Bengali Show)

From 7.45 - 8.30 P. M.

(English Show)

Rate of Tickets : Rs. 10/- and Rs. 20/-, Students: Rs. 10/-,

Children Above Three Years - Full Tickets

Ticket Counter opens at 12 Noon/12.30 P. M.

B. Visit VM Galleries : The Calcutta Gallery, Prince Hall, The Durbar Hall, Queen's Hall, Hasting's Room, National Leader's Gallery.

Museum Hours: 10 A. M. to 5 P. M (Except Mondays and National Holidays)

Rate of Tickets : Indian Nationals -Rs. 10/-(Rupees Ten Only)

Foreign Nationals -Rs. 150/- (Rupees One Hundred Fifty Only)

C. Visit the New Gallery, 'HILLSCAPES OF INDIA', in TRIPURA GOVERNMENT MUSEUM AT AGARTALA

D. VISIT VM WEBSITE www.victoriame-morial-cal.org

E. Recent Publications :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Charles D'Oly's Calcutta-Album I and II | Rs. 40.00 each |
| 2. India in the eyes of Daniells | Rs. 40.00 |
| 3. India as seen by Simpson | Rs. 40.00 |
| 4. Select views of India | Rs. 40.00 |
| 5. Picture Post Card Set-D | Rs. 10.00 |
| 6. Picture Folio No. 2 | Rs. 1.00 |
| 7. Picture Folio No. 3 | Rs. 2. 00 |
| 8. Ceramic Tiles (views of St. Andres's Church) | Rs. 32.00 |
| 9. Hiren Chakraborty (ed). <i>An Urban Historical Perspective for The Calcutta Tercentenary</i> | Rs. 35.00 |
| 10. Charles Greig : Landscape Paintings in the Victoria Memorial. | Rs. 150.00 |
| 11. Gopa Choudhuri and Bhaskar Chandra: A Comprehensive catalogue of Water colours, Pencil Sketches and Pen and Ink drawings in the collections of Victoria Memorial | Rs. 15.00 |
| 12. Urdu Guide Book | Rs. 5.00 |
| 13. K. K. Ganguly: Modern Masters | Rs. 35.00 |
| 14. Calcutta Gallery - India's first City Gallery | Rs. 50.00 |
| 15. Contemporary Art of Bengal | Rs. 375.00 |
| 16. Victoria Memorial 2000 Natural History Painting @ Album Series 1-3 | Rs. 90.00 |
| 17. Hillscapes of India | Rs. 70.00 |
| 18. Victoria at Night | Rs. 5.00 |
| 19. National Leaders Portrait Gallery | Rs. 1.25 |